সাহসের মিনার

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

খুলনা মহানগরী

শাহাদাত স্মরণিকা

সাহসের মিনার

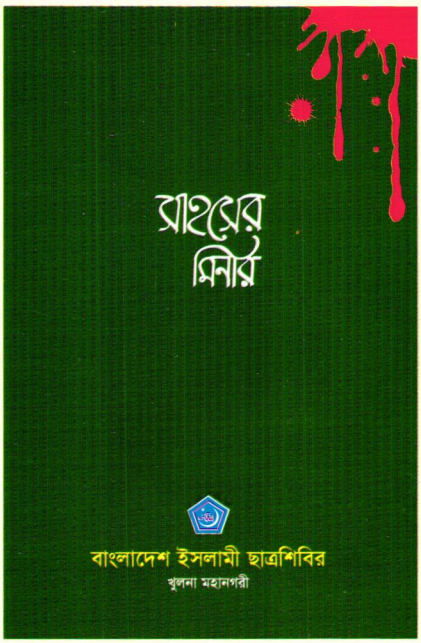

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
খুলনা মহানগরী

সম্পাদনা পরিষদ

কৃতজ্ঞতায়
মোঃ দেলাওয়ার হোসেন
মুহাম্মদ আবদুল জব্বার
মোঃ আতাউর রহমান বাচ্চু

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
মু. সাইদুর রহমান

সম্পাদক
মু. আজিজুল ইসলাম ফারাজী

নির্বাহী সম্পাদক
মিম মিরাজ হোসাইন

সম্পাদনা সহযোগী
স. ম. আব্দুল্যাহ আল মামুন
গাজী মোর্শেদ মামুন
আবু ইউসুফ মোল্যা

সম্পাদনা পরিষদ
মু. নাজমুল হুসাইন নাঈম
মহিউল ইসলাম মাহি
হাফেজ ইমরান খালিদ
আহমেদ সাবিত
হাদিসুর রহমান
তারিকুর রহমান
আব্দুল বারিক
আলী আজগর মোঃ তাসনীম
সাইফুল্লাহ মানসুর
রশিদ কবির
রাজিবুল ইসলাম মুনীর
আব্দুর রাজ্জাক
হুমায়ুন কবির

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
২৯৮ খানজাহান আলী রোড
খুলনা-৯১০০
ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ০৪১-৭২১৪২৫
মোবাইল ঃ ০১৭১৫-৮৫ ৫৯ ৫৯
০১৭১১-৯৬ ৪৯ ৫২
shibirkhulnacity@yahoo.com

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০১২ ইংরেজি
জিলক্বদ ১৪৩৩ হিজরি
আশ্বিন ১৪১৮ বাংলা

মূল্য ঃ ২০০.০০ (দুইশত) টাকা

www.icsbook.info

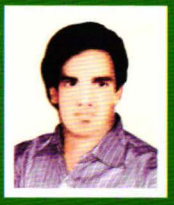

উৎসর্গ

শহীদ শেখ আমিনুল ইসলাম বিমান
শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম
শহীদ শেখ আমান উল্লাহ আমান
শহীদ শেখ রহমত আলী
ও
শহীদ আবুল কাশেম পাঠানসহ
১৩৯ জন শহীদ স্মরণে

www.icsbook.info

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

বাণী

ভারপ্রাপ্ত আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

পৃথিবীতে সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব চলে আসছে সেই প্রাচীনকাল থেকে, বাতিল শক্তিরা সত্যের আলোকে নিভিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালিয়েছে বারবার, তাদের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে সত্য পথের পতাকাবাহীরা, তবু নিভে যায়নি সত্যের আলোক মশাল।

দেশের বিরাজমান অবস্থার পটপরিবর্তনের একটা সময়ে মানুষ মুক্তির প্রহর গুনছিল, ঠিক সেই সময়ে ১৯৭৭ সালে ছাত্রশিবিরের যাত্রার সূচনা ছিল এ দেশ ও জাতির জন্য রহমতস্বরূপ। দীর্ঘ ৩৪ বছরের পথ চলায় ছাত্রশিবিরকে অতিক্রম করতে হয়েছে কঠিন কনণ্টকাকীর্ণ পথ, কালের পরিক্রমায় ১৩৯ জন শহীদ ভাইয়ের দীর্ঘ তালিকায় খুলনার ৫জন ভাইয়ের রক্ত খুলনার ইসলামী আন্দোলনে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ইসলামী ছাত্রশিবির খুলনা মহানগরী শাখা এই সকল সিপাহসলারের জীবনী আর ইতিহাস সঙ্কলনের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা সত্যিই সময়োপযোগী ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রেরণাদায়ক। এ উপলক্ষে খুলনা মহানগরী কর্তৃক "সাহসের মিনার" নামক শহীদ স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগের প্রশংসা ও সফলতা কামনা করছি। আমীন॥

(মকবুল আহমদ)
ভারপ্রাপ্ত আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

www.icsbook.info

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সভাপতির কথা

শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী লক্ষ বনি আদমের রক্ত প্রবাহে শাহাদাতের তামান্না জাগিয়ে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের প্রত্যয় নিয়ে ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইসলামী আদর্শের ধারক ও বাহক বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। এদেশের লক্ষ তরুণের জ্ঞান-মেধা-চরিত্র,শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতার পুরোটাই কাজে লাগিয়ে প্রথম ও সোনালি যুগের মুসলমানদের মত করে গড়ে তোলাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য অর্জনে প্রত্যয়ী এই সংগঠনটি কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে মুক্তির একমাত্র বিশ্বস্ত ঠিকানায় পরিণত হয়েছিল প্রতিষ্ঠার অতি অল্প সময়ের মধ্যে। কিন্তু সত্য-মিথ্যার চিরন্তন দ্বন্দ্ব সত্যের উত্থান কোন দিনই মেনে নিতে পারেনি মিথ্যার তল্পিবাহকেরা। আর তাই প্রতিষ্ঠার উষালগ্নে সত্যের প্রদীপ নিভিয়ে দিতে হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে সকল তাগুতি শক্তি। কিন্তু সকল রক্ত চক্ষুর চাহনিকে উপেক্ষা করে শত বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত রেখেছে ইসলামী আন্দোলনের জানবাজ কর্মীরা। সবচেয়ে বড় সম্পদ জীবন বিসর্জন দিয়ে চির বিদায় নিয়েছে ১৩৯টি তরতাজা প্রাণ। আহত ও পঙ্গুত্ব বরণ করেছে অসংখ্য সত্যের সেনানী, যারা জীবন্ত শহীদ হয়ে আজও বেঁচে আছে আমাদের মাঝে...।

শহীদ আবদুল মালেকের রক্তসিড়ি বেয়ে শহীদি মিছিলের খুলনা মহানগরীর প্রথম শহীদ হিসেবে নিজেকে সৌভাগ্যবান মানুষের কাতারে শামিল করলেন ২৫ মার্চ'৯২ শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান। রক্তের আঁচড়ে ১৯৯৩ সালের "২০ সেপ্টেম্বর" খুলনার ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে রচিত হয় একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা। বি.এল.কলেজ ছাত্র সংসদের জি.এস. মুন্সী আব্দুল হালিমকে বি.এল. কলেজ মসজিদের সামনে নৃশংসভাবে জবাই করে হত্যা করে ছাত্র নামধারী চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা। খুনের নেশাই উন্মত্ত হয়ে সংসদের সাহিত্য সম্পাদক শেখ রহমত আলীকে তিতুমীর হলের বাথরুমের মধ্যে রামদা দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মক ভাবে আহত করে। পরবর্তীতে ২ অক্টোবর তিনি শাহাদাত বরণ করেন ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে। খুনিরা এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। খুলনা আলিয়া মাদ্রাসার মেধাবী ছাত্রশিবিরকর্মী এতিম আমান উল্লাহ আমানকেও গুলি করে হত্যা করে একই দিনে। রক্তের দাগ না শুকাতেই ১৯৯৪ সালের ২৩ অক্টোবর ছাত্রসংসদের এ.জি.এস আবুল কাশেম পাঠানকে সিটি কলেজের সামনে পাখির মত গুলি করে হত্যা করলে ছাত্ররাজনীতির ইতিহাস আরও একবার কলঙ্কিত হয়। এভাবেই আমাদের মাঝ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিক পাঁচজন মুজাহিদ। যাদের রক্তে রচিত হয়েছে খুলনা মহানগরীর ইসলামী আন্দোলনের এক রক্তাক্ত ইতিহাস।

খুলনার এই মহান শহীদদের স্মৃতিকথা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে "সাহসের মিনার" স্মরণিকা প্রকাশে আমাদের এ মহতী উদ্যোগ। শহীদদের একজন গর্বিত উত্তরসূরি হিসেবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস দেশের যুবসমাজ যখন জাহেলিয়াতের অন্ধকারে পথ হারিয়ে ধ্বংসের শেষ সীমায় উপনীত সেই মুহূর্তে এই শহীদ স্মরণিকাটি তাদেরকে দিগন্ত প্রসারী এক আলোকবর্তিকা হিসেবে পথনির্দেশ দানে সক্ষম হবে, খুলনা মহানগরীর রক্তাক্ত ইতিহাসের এক অনবদ্য দলিল হিসাবে টিকে থাকবে যুগ যুগ ধরে। শাহাদাতের তামান্নায় উজ্জীবিত হবে নতুন প্রজন্ম।

পরিশেষে "সাহসের মিনার" স্মৃতি সঙ্কলনটি প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ আঞ্জাম দিতে গিয়ে খুলনার এই ময়দানে যারা জীবন দিয়েছেন তাদের জন্য শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা,আহত ও পঙ্গুত্ব বরণকারীদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। আর যাদেরকে হারিয়ে শোকার্ত পরিবার আজও বাকরুদ্ধ সেই সকল পরিবারের প্রতি রইল অশ্রুসিক্ত সমবেদনা।

স্মরণিকাটি প্রকাশের পেছনে যাদের কঠোর পরিশ্রম ও আন্তরিক পরামর্শ রয়েছে তাদের সকলকে অভিনন্দন ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের এই প্রচেষ্টাকে তার দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আমিন॥

(মু.সাঈদুর রহমান)
সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
খুলনা মহানগরী

www.icsbook.info

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির দেশের ছাত্র আন্দোলনে অবিস্মরণীয় একটি নাম। বাংলার জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৭ সালে যে সংগঠনটির জন্ম হয়েছিল তা আজ মাত্র ৩৪ বছরে ফুলে ফলে বিকশিত হয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি জনপদ আলোকিত করে তুলেছে। ছাত্রশিবিরের প্রতিটি পদক্ষেপেই তাকে পেরিয়ে আসতে হয়েছে হাজারো বাধার পর্বত। শাহাদাত, অসংখ্য ভাইয়ের আহত, পঙ্গুত্ব, কারাবরণ, জুলুম, নির্যাতন এসবই শহীদি কাফেলার নিত্যসঙ্গী। কালের পরিক্রমায় ১৩৯ জন শহীদ ভাইয়ের দীর্ঘ তালিকায় খুলনার ৫জন ভাইয়ের রক্ত খুলনার মাটিকে করেছে উর্বর, ইসলামী আন্দোলনের ধারাকে করেছে আরো বেগবান।

দীর্ঘদিন পর হলেও খুলনার ৫ শহীদ স্মরণে বাংলাদশে ইসলামী ছাত্রশিবির খুলনা মহানগরী শাখা একটি স্মরণিকা "সাহসের মিনার" প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। তাদের এই মহতী উদ্যোগের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। আমি আশা করি এই স্মরণিকাটি ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারক বাহক হিসেবে একটি মাইল ফলক হিসেবে কাজ করবে এবং আগামী প্রজন্মের চেতনাকে আরো শানিত করে তাদেরকে জাগিয়ে তুলবে ত্যাগ-কুরবানীর নতুন প্রেরণায়।

পরিশেষে তাদের এই সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ আমাদের সকলকে তার দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আমিন।

(মাওলানা আবুল কালাম আজাদ)
আমীর, খুলনা মহানগরী ও
কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

www.icsbook.info

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

শুভেচ্ছা বাণী

আলহামদুলিল্লাহ। পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী শহীদেরা মরে না। তারা জীবন্ত। জীবন্ত তাদের আদর্শ-তাদের চেতনা। তাদের সাহস, শক্তি, ত্যাগ ও কুরবানীর মরণজয়ী স্মৃতিগুলো আমাদের অদম্য পথ চলার চিরন্তন প্রেরণা। অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামে আমাদের সাহসের মিনার।

খুলনা অঞ্চলের প্রিয় শহীদদের স্মরণে এই প্রকাশনা সেই সাহস সেই শক্তির একটি জ্যোতির্ময় স্মারকগ্রন্থ। এই উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টাকে আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করুন। অসংখ্য তাজা টুকটুকে গোলাপের সৌরভে আরো সুরভিত হোক-সিক্ত হোক শহীদের রক্তে সজীব খুলনার এই ময়দান।

হে আল্লাহ তুমি সব শহীদের শাহাদাতকে কবুল কর এবং আমাদেরকেও তাদের সাথী হিসেবে সৌভাগ্যবান কর। আমিন॥

(অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার)
সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

www.icsbook.info

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

বাণী

কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

"আমাদের শহীদেরা সবচেয়ে বড় সম্পদ
গড়ে গেছে সাহসের দ্বিধাহীন সোজা রাজপথ।"

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির তরুণ ছাত্রসমাজের নিকট এক মুক্তিকামী কাফেলার নাম। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, মুসলিম-অমুসলিম সকলের কাছে ইসলামী ছাত্রশিবির আশীর্বাদস্বরূপ। জাহেলিয়াতের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের ন্যায় অশ্লীলতা, বেহায়াপনা আর পশ্চিমা সংস্কৃতির কালো থাবায় যখন ছাত্রসমাজ হাবুডুবু খাচ্ছিল, মাদকের ভয়াল ছোবল আর ছাত্ররাজনীতির নামে অস্ত্রবাজি, টেন্ডারবাজি যখন ছাত্ররাজনীতিকে কলুষিত করছিল ঠিক এমনি এক প্রেক্ষাপটে ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির তার যাত্রা শুরু করে। বহু চড়াই-উৎরাই, ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে ৩৫ বছরে ছাত্রশিবির আজ সুধী এবং ছাত্রসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি বিশ্বস্ত ঠিকানায় পরিণত হয়েছে। তাইতো সেদিনের চারাগাছ অল্প সময়ের ব্যবধানে এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ছাত্রশিবিরের এ অর্জনটুকুর পেছনে রয়েছে গৌরবময় বিশাল এক ইতিহাস। রয়েছে গঠনমূলক এবং কল্যাণধর্মী নানান কর্মসূচি। প্রভুর দরবারে দিতে হয়েছে ১৩৯ জন তরতাজা মুমিনের ত্যাগ-কুরবানী আর শাহাদাতের নজরানা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় বলেছেন, "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না।" নিঃসন্দেহে যুগে যুগে শহীদ ভাইদের পবিত্র রক্তই আল্লাহর জমিনকে করেছে উর্বর। আন্দোলনের কর্মীদের করেছে পুনরুজ্জীবিত। দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিকে করেছে সাফল্যমণ্ডিত।

সন্ত্রাসীদের হিংস্রতা, পৈশাচিকতা ও অমানবিকতা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের নিকট পরাজিত হয়েছে বারবার। একটি সুন্দর সোনালি সমাজ বিনির্মাণের জন্য হযরত খানজাহান আলী (রহ)-এর স্মৃতি বিজড়িত রক্তে রঞ্জিত খুলনা মহানগরীকে একটি উর্বর ঘাঁটিতে পরিণত করেছেন ৫ জন বীর সেনানী। খুলনা সরকারি বি.এল. কলেজের নির্বাচিত জি.এস. শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম, এ.জি.এস শহীদ আবুল কাশেম পাঠান, সাহিত্য সম্পাদক শহীদ শেখ রহমত আলী, শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান ও শহীদ আমান উল্লাহ আমান স্মরণে শাহাদাত স্মরণিকা "সাহসের মিনার" প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। স্মরণিকাটি শহীদ ভাইদের আত্মত্যাগ, আহত, পঙ্গুত্ব বরণকারীদের ত্যাগ-কুরবানীকে তুলে ধরবে অনাগত ভবিষ্যতের কাছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই স্মরণিকাটি শহীদদের অসমাপ্ত কাজকে আঞ্জাম দেয়ার জন্য এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে ইনশাআল্লাহ। পাশাপাশি আগামী প্রজন্মকে করবে আরো গতিশীল, যোগাবে অনুপ্রেরণা।

আল্লাহ আমাদের শহীদ ভাইদেরকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং এই শহীদি কাফেলা ও এর সকল পর্যায়ের জনশক্তিকে কবুল করুন। আমিন

(মোঃ দেলাওয়ার হোসেন)
কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.icsbook.info

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সম্পাদকীয়

সপ্লিল মায়ার বন্ধনে গড়া এই বর্ণিল পৃথিবীতে সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায়, সদাচার-অনাচার, মানবতা-দানবতা, শান্তি-অশান্তির এ দ্বন্দ্ব আজ থেকে নয়,মানব সৃষ্টির পর থেকেই এ সংঘাতের সূচনা। নির্মম বাস্তবতা হচ্ছে, সত্যপথে চলতে গেলে বাধা বিপত্তি ও আঘাত আসবেই, খুন রক্ত ঝরবেই। ইসলামী ছাত্রশিবির যেহেতু মানবরচিত সকল মতবাদকে দূর করে আল কুরআন ও আল হাদীসের আলোকে ন্যায় ও সৌধের উপর প্রতিষ্ঠিত এক মহান লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই চমক লাগানো কোন উদ্দেশ্য হাসিল এর লক্ষ্য নয়, এ কাফেলার লক্ষ্য তাই শাশ্বত ও চিরন্তন, কিন্তু মানবতা ও ইসলামের দুশমনরা এটা কোনভাবেই মেনে নিতে পারেনা, তাইতো নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তারা বেছে নেয় হত্যা, নির্যাতন শোষণ আর পাশবিকতা ও পৈশাচিকতার ঘৃণ্য যত পন্থা, ফলশ্রুতিতে দ্বিগুণ হয় সত্য-মিথ্যা ও ন্যায় অন্যায়ের অবিনাশী যুদ্ধংদেহি মনোভাব। আমাদের আজকের আয়োজন তারই বর্ণনার খণ্ডাংশ মাত্র।

দক্ষিণবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ নামে খ্যাত ২৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর প্রাণের স্পন্দন, জ্ঞান আহরণ ও মেধা বিকাশের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র সরকারি বি.এল. কলেজ এবং খুলনার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি প্রতিষ্ঠান খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা যা এক সময় তথা কথিত পশ্চিমা সভ্যতার ধারক বাহক নামীয় মানবতার চিরশত্রু ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী এক শ্রেণীর হায়েনাদের খপ্পরে জিম্মি ছিল, শতাব্দীর পুঞ্জীভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ঐ কন্টকাকীর্ণ পরিবেশে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের পাঁচজন ভাই শাহাদাত বরণ করেছেন, অসংখ্য শিবির কর্মীর রক্তে রঞ্জিত হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের সবুজ আঙিনা, হাত হারা, পা হারা চোখ হারা জীবন্ত শহীদ ভাইদের আর্তনাদ আর ফ্যাঁসিবাদী সরকারের শতাব্দীর ভয়ংকার পুলিশি নির্যাতনের মধ্য দিয়ে দক্ষিণবঙ্গে ফিরে এসেছে ইসলামের সুমিষ্ট সমিরন। হেরার রাজ তোরণ নির্মাণের অশ্বারোহী কাফেলা ইসলামী ছাত্রশিবির মানবতার উৎকর্ষ সাধন করতে গিয়ে যে নৃশংস ও নির্যাতনের অসহনীয় শিকার হয়েছে তা বর্ণনাতীত তবুও কন্টকাকীর্ণ এ পথ চলা থেমে থাকেনি শহীদি কাফেলার, কেননা আমাদের পৌছাতেই হবে হেরার আলোর স্বর্ণ শিখরে। এই ক্ষুদ্র স্মরণিকার মাধ্যমে ঐ সমস্ত মহীরুহের জীবনালেখ্য তুলে ধরা সত্যিই দুরূহ, তারপরেও লিখতে হয় অমর শহীদদের স্মৃতি কথা। আমাদের সম্বল ছিল অপ্রতুল, আর সীমাবদ্ধতা ছিল প্রচুর, তারপরেও শহীদদের পরিবার, আন্দোলনের রাজপথের সাথীরা, লেখক, শুভাকাংখী ও সর্বোপরি স্মরণিকার সাথে জড়িত দায়িত্বশীল ভাইদের আন্তরিক সহযোগিতা মূলত এ দূরূহ কাজকে সহজ করেছে।

মহান আল্লাহ যেন শহীদ, পঙ্গু, আহত নির্যাতিতের ত্যাগকে কবুল করেন এবং শহীদদের শোকাহত পরিবারকে ধৈর্য ধরার তৌফিক দান করেন, শহীদদের উত্তরসূরি, লেখক ও শুভাকাংখী এবং এই মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়নে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের কষ্ট যেন সফল হয়। আমিন॥

(মু. আজিজুল ইসলাম ফারাজী)
সেক্রেটারী, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
খুলনা মহানগরী

www.icsbook.info

সূচিপত্র

- শহীদ পরিচিতি ১২
- শাহাদাত মুমিন জীবনের কাম্য ১৭
  অধ্যাপক গোলাম আযম
- আমার স্মৃতিতে আবুল কাশেম পাঠান ২৬
  মুহাম্মদ কামারুজ্জামান
- এ স্মৃতি অদম্য সাহসের, বেদনার নয় ৩০
  অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার
- আমার চেনা শহীদ আবুল কাশেম পাঠান ৪১
  আবু জাফর মোহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ
- শহীদি জনপদে স্মৃতিময় ক'টি দিন ৪৬
  ব্যারিস্টার মুহাম্মদ হামিদ হোসাইন আজাদ
- সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ইসলামী ছাত্রশিবির ৫৪
  এ.এইচ.এম হামিদুর রহমান আযাদ এম.পি
- অবিনশ্বর এক স্মৃতির মিনার ৬১
  কবি মতিউর রহমান মল্লিক
- সেই হাস্যোজ্জ্বল চেহারা আজও চোখের সামনে ভাসে ৬৭
  এডভোকেট আনসার উদ্দিন
- শহীদের মর্তবা বা মর্যাদা ৭০
  অধ্যাপক আবদুল মতিন
- স্মৃতির পাতায় বিমানের শাহাদাত ৭৯
  মাষ্টার শফিকুল আলম
- জান্নাতের সবুজ পাখি ৮৩
  অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান
- ফুটবার আগেই যে ফুল ঝরিয়ে দেয়া হল ৮৮
  প্রফেসর বজলুল করিম
- স্মৃতির পাতা থেকে ৯৬
  প্রফেসর কে.এম.আওরঙ্গজেব
- এক করুণ স্মৃতি ৯৯
  প্রফেসর মোঃ আব্দুল মান্নান
- বেহেশতী হাতের অমলিন ছোঁয়া ১০৪
  মো: আতাউর রহমান বাচ্চু
- বন্ধু হারা বি.এল.কলেজ ক্যাম্পাস ১০৭
  জি.এম. ইলিয়াস হোসাইন
- এ স্মৃতি ভুলবার নয় ১১০
  এডভোকেট শেখ আব্দুল ওয়াদুদ
- রক্তাক্ত ২০ সেপ্টেম্বর একটি মূল্যায়ন ১১৮
  মিয়া গোলাম কুদ্দুস
- সে ছিল সকলের প্রিয় গোলাপ ১২২
  মু. গোলাম মোস্তফা আল মুজাহিদ
- রক্তাক্ত পায়রাগুলো ক্ষতবিক্ষত ভূলুণ্ঠিত ১২৪
  এ্যাড. শেখ জাহাঙ্গীর হুসাইন হেলাল
- বুকের রুধিরে লেখা সেই ইতিহাস ১২৯
  মাকসুদুর রহমান মিলন
- স্মৃতির পাতায় ২০ সেপ্টেম্বর '৯৩ ১৩৮
  প্রিন্সিপাল শেখ জাহাঙ্গীর আলম

www.icsbook.info

সূচিপত্র

- প্রেরণার উৎস শহীদ শেখ রহমত আলী ১৪১
  অধ্যাপক এ.কে.এম ফজলুল হক
- সেই সরল মিষ্টি হাসি আর দেখতে পাব না কোনদিন ১৪৫
  মুহাম্মদ আব্দুর রহিম
- চিরচেনা, চিরজানা শহীদ হালিম, রহমত ও আবুল কাশেম পাঠান ১৫০
  মোহাম্মদ মাসুদ আলম গোলদার
- অব্যক্ত বেদনা ১৫৬
  মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন
- আজও ভুলিনি ১৬০
  জি.এম.শফিকুল ইসলাম
- শাহাদাত প্রেরণার বাতিঘর ১৬৫
  মুহাম্মদ শামছুর রহমান
- ২০ সেপ্টেম্বর' ৯৩ আমাদের শপথ গ্রহণের দিন ১৭০
  মো: তারিকুল ইসলাম পিকু
- কিছু স্মৃতি ১৭২
  মিয়া মুজাহিদুল ইসলাম
- শহীদ আমানের মা ১৭৬
  মু. মুকাররম বিল্লাহ আনসারী
- শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান ও কিছু কথা ১৮১
  অধ্যাপক আজিজুল ইসলাম টিপু
- শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম যাকে হারিয়ে আজও কাঁদে বি.এল. কলেজ ক্যাম্পাস ১৮৩
  মুন্সী আব্দুল হাফিজ কচি
- ২৫শে মার্চের সেই ভয়াল রাত্রি ১৮৭
  মিসেস নাসিমা খাতুন
- শহীদ পরিবারের বাঙময় স্মৃতি ১৮৮
  আইনুন নাহার আনজু
- বয়সে ছোট হলেও পাঠান ছিল আমাদের সকলের অভিভাবক ১৯০
  নূর জাহান পাঠান
- রক্তে ভেজা জামা ১৯৪
  মুহাম্মদ আব্দুল গফফার
- জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু ১৯৬
  শেখ মিজানুর রহমান মিজান
- একটি বেদনার স্মৃতি ২০১
  শেখ মাহমুদ এ রিয়াদ
- স্মৃতির পাতা থেকে ২০৪
  ব.ম. মনিরুল ইসলাম
- যেমন দেখেছি তাঁকে ২০৭
  মুহাম্মদ ইকবাল আমীন
- কারাগারে শুনি যার নাম ২০৯
  মুহাম্মদ আলমগীর হোসাইন
- স্মৃতির সৈকতে দাঁড়িয়ে ২১১
  কাজী মেহেদী হাসান সুজন
- শহীদের ডায়েরি থেকে ২১৩
- শহীদের পরিবারের প্রতিক্রিয়া ২১৭
- কবিতাগুচ্ছ ২২৫
- যুগে যুগে বেয়ে গেল যারা এই তরী ২৪১
- স্মৃতি এ্যালবাম ২৪৭

www.icsbook.info

শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান

নাম	ঃ	**শেখ আমিনুল ইসলাম বিমান**
পিতা	ঃ	শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী
মাতা	ঃ	জাহানারা বেগম
ভাই বোন	ঃ	৩ ভাই ২ বোন, সবার মধ্যে ২য়, ভাইদের মধ্যে বড়।
জন্ম তারিখ	ঃ	১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ইং
জন্মস্থান	ঃ	কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায়, পিতার কর্মস্থলে।
স্থায়ী ঠিকানা	ঃ	গ্রাম+ডাক+থানা ঃ টুঙ্গীপাড়া, জেলা ঃ গোপালগঞ্জ।
শিক্ষাজীবন	ঃ	এস.এস.সি ১৯৮২ইং (১ম বিভাগ, নূরনগর ওয়াপদা মাধ্যমিক শিক্ষা নিকেতন) এইচ.এস.সি ১৯৮৪ইং (হাজী মো: মহসিন কলেজ) স্নাতক দৌলতপুর দিবা-নৈশ কলেজ, শাহাদাতের সময় তিনি বি.এল. কলেজে বাংলায় মাস্টার্স ১ম পর্ব অধ্যয়নরত ছিলেন।
সাংগঠনিক জীবন	ঃ	শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান ১৯৭৯ সালে সংগঠনে যোগদান করেন। শাহাদাতের সময় তিনি সংগঠনের সাথী ছিলেন এবং বি.এল কলেজ ক্যাম্পাস শাখার সেক্রেটারি ছিলেন।
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	ঃ	১৯৯২ সালের ২৫ মার্চ ২০ রমজান সন্ধ্যা ৭ টায় মহানগরী শিবির অফিস শান্তিধাম মোড়, খুলনা।
শাহাদাতের তারিখ ও স্থান	ঃ	ঐদিন রাত্র- ১২.১০ মিনিট, খুলনা মেডিকেল হাসপাতাল
আঘাতের ধরন	ঃ	বোমা হামলা, লোহার রড ও হকিষ্টিক দিয়ে আঘাত।
কাদের দ্বারা	ঃ	আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, কমিউনিস্টপার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন, ঘাদানিকসহ বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত হামলায়।
শহীদক্রম	ঃ	৪২তম

www.icsbook.info

শহীদ
মুন্সী আব্দুল হালিম

নাম	ঃ	**মুন্সী আব্দুল হালিম**
পিতা	ঃ	মরহুম মুন্সী মোহাম্মদ
মাতা	ঃ	শরীফা খাতুন
ভাই বোন	ঃ	৬ ভাই ৫ বোন, ভাইদের মধ্যে ৪র্থ।
জন্ম তারিখ	ঃ	১৪ই জানুয়ারি ১৯৭০ইং
স্থায়ী ঠিকানা	ঃ	গ্রামঃ মশিয়ালী, ডাকঘরঃ দামোদর, থানা ঃ খানজাহান আলী জেলা ঃ খুলনা। শাহাদাতের পূর্বে তিনি হাজী মহসীন হলের ৩০৬ নং কক্ষে অবস্থান করতেন।
শিক্ষাজীবন	ঃ	এস.এস.সি ১৯৮৫ইং (দামোদর এম.এম উচ্চবিদ্যালয়) এইচ.এস.সি ১৯৮৭ইং (দৌলতপুর কলেজ) শাহাদাতের সময় তিনি বি.এল.কলেজে হিসাব বিজ্ঞান (সম্মান) ২য় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।
সাংগঠনিক জীবন	ঃ	১৯৮৭ সালের ৫ই অক্টোবর সংগঠনের কর্মী, ১৯৮৯ সালে ১৮ই আগস্ট সাথী এবং ১৯৯১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সংগঠনের সদস্য হন। শাহাদাতের সময় তিনি সরকারি বি.এল. কলেজের সভাপতি এবং বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত জি.এস ছিলেন।
বিশেষ গুণাবলী	ঃ	সমুধুর কণ্ঠে ইসলামী সংগীত গাইতেন।
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	ঃ	১৯৯৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর বি.এল. কলেজ কেন্দ্রীয় জামেমসজিদ।
শাহাদাতের তারিখ ও স্থান	ঃ	ঐদিন ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন।
আঘাতের ধরন	ঃ	প্রথমেই গুলি, বোমা হামলা তারপর রামদা ও চাইনিজ কুড়াল দিয়ে আঘাত অতঃপর নৃশংস কায়দায় জবাই করে হত্যা।
কাদের দ্বারা	ঃ	জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল
শহীদক্রম	ঃ	৫৮তম

www.icsbook.info

শহীদ
আমান উল্লাহ আমান

নাম	ঃ **শেখ আমান উল্লাহ আমান**
পিতা	ঃ মরহুম শেখ শহীদুল্লাহ
মাতা	ঃ মোসাম্মৎ মনোয়ারা খাতুন
ভাই বোন	ঃ ২ ভাই ৪ বোন, ভাইদের মধ্যে তিনিই সবার বড় ছিলেন।
জন্ম তারিখ	ঃ ১৯৭৯ইং
স্থায়ী ঠিকানা	ঃ গ্রাম+ডাকঃ দরগাহপুর, থানা ঃ আশাশুনি, জেলা ঃ সাতক্ষীরা।
শিক্ষাজীবন	ঃ শাহাদাতের সময় তিনি খুলনা আলীয়া মাদ্রাসার নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন এবং মাদ্রাসার হোস্টেলে এতিমখানায় অবস্থান করতেন।
সাংগঠনিক জীবন	ঃ শাহাদাতের সময় তিনি সংগঠনের কর্মী ছিলেন।
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	ঃ ১৯৯৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর দুপুরে খুলনা আলীয়া মাদ্রাসার এতিম খানার ডাইনিংয়ে খাবারত অবস্থায়।
শাহাদাতের তারিখ ও স্থান	ঃ ঐদিন দুপুরেই ঘটনাস্থলে শাহাদাত বরণ করেন।
আঘাতের ধরন	ঃ পাখির মত গুলি করে হত্যা।
কাদের দ্বারা	ঃ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।
শহীদক্রম	ঃ ৫৭তম

www.icsbook.info

শহীদ
শেখ রহমত আলী

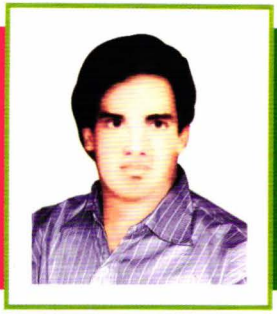

নাম	ঃ	**শেখ রহমত আলী**
পিতা	ঃ	মরহুম শেখ মোফাজ্জেল হোসেন
মাতা	ঃ	রাফিয়া বেগম
ভাই বোন	ঃ	৫ ভাই ৩ বোন, তিনি ছিলেন ভাইদের মধ্যে ৪র্থ।
জন্ম তারিখ	ঃ	১৯৬৮ইং।
স্থায়ী ঠিকানা	ঃ	গ্রাম+ডাকঘরঃ দোহার, থানা ঃ তালা, জেলা ঃ সাতক্ষীরা। শাহাদাতের সময় তিনি শহীদ তিতুমীর হলের ২২৮ নং কক্ষে অবস্থান করতেন।
শিক্ষাজীবন	ঃ	এস.এস.সি ১৯৮৪ইং, এইচ.এস.সি ১৯৮৬ইং স্নাতক সম্মান (রাষ্ট্র-বিজ্ঞান) শাহাদাতের সময় তিনি বি.এল.কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এম.এস.এস শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন।
সাংগঠনিক জীবন	ঃ	১৯৮৫ সালে সংগঠনে কর্মী ১৯৮৮ সালে সংগঠনের সাথী ১৯৯৩ সালে সদস্য প্রার্থী হন। শাহাদাতের সময় তিনি বি.এল কলেজ ক্যাম্পাস শাখার সেক্রেটারি ছিলেন এবং কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন।
বিশেষ কৃতিত্ব	ঃ	ভালো মানের বক্তা এবং সুমধুর কণ্ঠে আযান দিতেন।
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	ঃ	১৯৯৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর বি.এল কলেজের শহীদ তিতুমীর হল।
শাহাদাতের তারিখ ও স্থান	ঃ	০২ অক্টোবর ১৯৯৩ইং ঢাকার পি.জি হাসপাতাল।
আঘাতের ধরন	ঃ	প্রথমে গুলি, পরে উপুড় করে রামদা, চাইনিজ কুড়াল দিয়ে ঘাড়ের স্পাইনাল কর্ড দিয়ে কেটে।
কাদের দ্বারা	ঃ	জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।
শহীদক্রম	ঃ	৫৯তম

www.icsbook.info

শহীদ
আবুল কাশেম পাঠান

নাম	ঃ	**আবুল কাশেম পাঠান**
পিতা	ঃ	মরহুম সৈয়দ আলী পাঠান
মাতা	ঃ	রাশিদা বেগম
ভাই বোন	ঃ	৫ ভাই ৩ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন ৪র্থ।
জন্ম তারিখ	ঃ	১৯৬৯ইং সালের অক্টোবর মাসে।
জন্মস্থান	ঃ	কুমিল্লার কেশরাঙ্গা গ্রামে নানার বাড়িতে।
স্থায়ী ঠিকানা	ঃ	পাঠান ভিলা, বসুপাড়া এতিমখানার মোড়, সোনাডাঙ্গা, খুলনা।
শিক্ষাজীবন	ঃ	এস.এস.সি ১৯৮৭ইং, এইচ.এস.সি ১৯৮৯ইং। শাহাদাতের সময় তিনি বি.এল.কলেজে ব্যবস্থাপনা (সম্মান) ২য় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।
সাংগঠনিক জীবন	ঃ	শহীদ আবুল কাশেম পাঠান ১৯৮৪ সালে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় শিবিরের দাওয়াত পান। ১৯৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে সংগঠনের সাথী হন। শাহাদাতের সময় তিনি সংগঠনের সদস্য এবং বি.এল কলেজ শাখার সভাপতি ছিলেন। এছাড়াও তিনি দুই-দুইবার বি.এল কলেজ ছাত্রসংসদের নির্বাচিত এ.জি.এস এবং শাহাদাতের আগ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত জি.এস এর দায়িত্ব পালন করছিলেন।
সাংবাদিক জীবন	ঃ	দৈনিক জনবার্তা এবং শাহাদাতের সময় দৈনিক প্রবাহের মহানগরী প্রতিনিধি ছিলেন।
বিশেষ কৃতিত্ব	ঃ	ফুটবল, ক্রিকেট এবং ব্যাডমিন্টন খেলায় পারদর্শী ছিলেন।
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	ঃ	১৯৯৪ সালের ২৩ অক্টোবর সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ গেটের সামনে।
শাহাদাতের তারিখ ও স্থান	ঃ	ঐদিন দুপুরে খুলনা গরীব নেওয়াজ ক্লিনিক।
আঘাতের ধরন	ঃ	পাখির মত গুলি করে হত্যা।
কাদের দ্বারা	ঃ	জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।
শহীদক্রম	ঃ	৭০তম

www.icsbook.info

শাহাদাত
মুমিন জীবনের কাম্য

অধ্যাপক গোলাম আযম

শাহাদাত শব্দের অর্থ

শাহাদাত শব্দের অর্থ হলো সাক্ষ্য। এ থেকে শহীদ ও শাহেদ শব্দ এসেছে। শাহেদ মানে যে দেখেছে বা সাক্ষ্য দিয়েছে। সাক্ষ্য সেই দেয় যে নিজে স্বচক্ষে দেখেছে। 'আশ শাহিদ' মানে আমি দেখার জন্য ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলাম, আমি নিজে দেখেছি। এভাবেই দেখা অর্থে শাহাদাত শব্দ ব্যবহার করা হয়। কুরআন মজীদে শাহাদাত শব্দটি দু'ধরনের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। একটি সাক্ষ্য অর্থে অপরটি আল্লাহর দ্বীনের জন্য জান কুরবান করার অর্থে। জীবন কুরবানি দেয়া অর্থে শাহাদাতের ব্যবহারও পরোক্ষভাবে সাক্ষ্য দেয়া অর্থেই বুঝায়। জীবন কুরবানি দেয়া অর্থে শাহাদাতের ব্যবহারও পরোক্ষভাবে সাক্ষ্য দেয়া অর্থেই বুঝায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের জন্য জীবন কুরবানি দিল সে প্রকৃতপক্ষে জীবন দিয়ে সাক্ষ্য দিল যে ইসলামকে সে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে। উল্লিখিত দু'ধরনের অর্থ বুঝাবার জন্য কুরআনের কয়েকটি আয়াত পেশ করছি। কুরআনে বেশ কয়েকটি আয়াত আছে: 'ওয়া কাফা বিল্লাহি শাহিদা' অর্থাৎ যে কথা বলা হয়েছে তার জন্য সাক্ষ্য হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

সাক্ষী অর্থে নিম্ন আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে:

"এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত বানিয়েছি যাতে তোমরা মানবজাতির ওপর সাক্ষী হতে পার।" (সূরা বাকারা-১৪৩)

www.icsbook.info

"যাতে রাসূল (সাঃ) তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারে এবং তোমরা মানবজাতির ওপর সাক্ষী হতে পার।" (সূরা হজ্জ-৭৮)

জীবন দান অর্থে শহীদের ব্যবহার করা হয়েছে সূরা আলে ইমরানের ১৪০ নং আয়াতে। এতে বলা হয়েছে: "ওয়ালা ইয়া'লামাল লাহুল্লাজিনা আমানু ওয়াইয়াত্তাখিজু মিনকুম শুহাদা'। এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান।" সরাসরি জীবন দান অর্থে ব্যবহার খুব বেশি আয়াতে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছে অর্থে "ওয়াকতুলুনা ফাইয়াকতুলুন" "যুদ্ধে গিয়েছে ও নিহত হয়েছে" এভাবে বহু জায়গাতে শহীদদের কথা বলা হয়েছে।

"ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহযানু ওয়ানতুমুল আ'লাওনা ইন কুনতুন মু'মিনীন। ইন ইয়ামছাছকুম কারহুন ফাকাদ মাচ্ছাল কাওমা কারহুন মিছলুহু।"

এটা হলো ওহুদ যুদ্ধের পরের কথা। এখানে বলা হয়েছে বদরের যুদ্ধে তোমরা আঘাত করেছ আর ওহুদ যুদ্ধে কিছু আঘাত পেয়েছ। এতে ঘাবড়াবার কী আছে? তোমরা মুমিন হলে চূড়ান্ত বিজয় তোমাদেরই হবে।

এভাবে মানুষের মধ্যে একবার জয় আবার পরাজয় আসে। চূড়ান্ত বিজয় তোমাদেরই হবে। এটা আল্লাহ কেন করেন। কেন জয় পরাজয় দেয়া হয়, এটা বলতে গিয়ে শাহাদাত শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

"আল্লাহ তোমাদের মাঝে মাঝে পরাজয়ও দেন এই উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে কার কার মজবুত ঈমান তা দেখার জন্যে, আর তোমাদের মধ্যে কিছু লোককে শাহাদাতের মর্যাদা দেওয়ার জন্যে।" এখানে শাহাদাত শব্দটা উল্লেখিত দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বস্তুত শহীদ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার হয়। সাক্ষ্য দিলেও শহীদ, আর জীবন দিলেও শহীদ। মূল অর্থ হলো সাক্ষ্য। আল্লাহর পথে নিহত যে, সে জীবন দিয়ে সাক্ষ্য দিল যে, সত্যিকার অর্থে সে দ্বীনকে গ্রহণ করেছে।

মুমিন জীবনের কাম্য

মুমিন জীবনের কাম্য কী হতে পারে এ প্রশ্নের জবাবে সরাসরি বলা যায় মুমিন জীবনের আসল লক্ষ্য বা কাম্য হলো আখিরাতের সাফল্য। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে দুনিয়ার জীবন হলো আখিরাতের কৃষিভূমি। কৃষক যেমন জমিতে ফসল বুনে বাড়িতে ভোগ করে তেমনি মুমিন দুনিয়াতে ফসল বুনে আমল করে আর আখিরাতে তা ভোগ করে। যে আখিরাতের কামিয়াবি মুমিন জীবনের লক্ষ্য তাকে এক কথায় বলা যায় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বিনা হিসেবে বেহেশত লাভ। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) কে বললেন 'এমনভাবে আমল করো যেন হিসাব ছাড়াই বেহেশতে যেতে পারো। হিসাব দিতে গেলেই মুসিবত। সে জন্য আখিরাতের কামিয়াবি বলতে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হলেই বিনা হিসাবে বেহেশতে যাওয়া যাবে। মুমিন জীবনের আসল কাম্য হলো এটাই।

www.icsbook.info

দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকতে হলে যা কিছু মাতাউল হায়াতিদ দুনিয়া বা জীবিকা আছে তা নিতান্তই বেঁচে থাকার প্রয়োজনে। আর মুমিন বেঁচে থাকবে আখিরাতে মুক্তির প্রয়োজনীয় আমল করার জন্য। ঠিক তেমনি এ দুনিয়ার জীবনটা মর্যাদার দিক দিয়ে খেলা হিসাবে নেয়া দরকার। আমরা যেমন লেখা-পড়া ও অন্যান্য সিরিয়াস কাজ কর্মের ফাঁকে অবকাশ হিসাবে কিছু সময় খেলাধুলা করে থাকি, তেমনি দুনিয়ার জীবনের ভোগ-বিলাসকেও আখিরাতে কামাইয়ের আসল কাজের ফাঁকে খেলার মতো মনে করতে হবে। দুনিয়ার জীবন এমন কিছু নয় যে এটাকে টার্গেট অথবা জীবনের উদ্দেশ্য করে নিতে হবে অথবা এটাকেই একমাত্র দ্বীন বানিয়ে নিতে হবে। মুমিন জীবনে এটাই যদি স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে থাকে, যা হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহলে শাহাদাত তার জীবনের স্বাভাবিক কাম্য বিষয় হবার কথা। কেননা একমাত্র শহীদই দুনিয়া থেকে এ নিশ্চয়তা নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারেন যে, জান্নাত তাঁর জন্য অবধারিত। মাওলানা মওদূদী মরহুমের ফাঁসির হুকুম হবার পর ক্ষমা চেয়ে দয়া ভিক্ষা করার মাধ্যমে মুক্তির জন্য বলা হয়েছিল। তখন তিনি সরাসরি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, জীবন মৃত্যুর মালিক আল্লাহ এবং মউতের ফয়সালা আসমানে হয়, জমিনে নয়। এসময়, এভাবে যদি আল্লাহ মৃত্যু নির্ধারণ করে থাকেন তাহলে কারো সাধ্য নেই মৃত্যুকে ঠেকাবার। আর তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে এমন কোন শক্তি নেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার। আর শাহাদাতের মৃত্যুই শুধু পারে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিতে। আমি কি ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করবো যে আমাকে জান্নাত থেকে বাঁচাও? এভাবে তিনি মৃত্যুকে জয় করে উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের জন্য নজির সৃষ্টি করে গেছেন। ইখওয়ানুল মুসলিমুন এর অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে শাহাদাতবরণ করে ইসলামের সোনালি যুগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে গেছেন এতে এটিই প্রমাণিত হলো ইসলামের প্রতি তাঁর আন্দোলনে নির্যাতন ও শাহাদাত বরণ ইতিহাসের অসম্ভব কোন অতীত কাহিনী নয়। এ যুগেও তা বাস্তব। বস্তুত প্রত্যেক যুগে এমন কিছু ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যাঁরা মানুষকে মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্ত করার জন্য নিজেদেরকে উদাহরণ হিসাবে পেশ করবেন।

শাহাদাতের কামনা ও আল্লাহর পথে সংগ্রাম

শাহাদাতের কামনা যদি কোন মুমিন জীবনে থাকে তাহলে সে আল্লাহর পথে লড়াইয়ে কোন সময় গাফেল হতে পারেনা। কারণ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছাড়া শাহাদাতের দ্বিতীয় কোন পথ নেই। একজন ভাল ছাত্র যেমন ভাল ফলাফলের প্রমাণ দেবার জন্য পরীক্ষা কামনা করে তেমনি একজন মুমিন শাহাদাতের মাধ্যমে বিজয়ী হবার জন্য বাতিলের বিরুদ্ধে হকের সংগ্রামে আপসহীনভাবে লড়াই করে যাবে। বস্তুত একজন ব্যক্তির মধ্যে শাহাদাতের কামনা আছে কিনা নিজের প্রাত্যহিক কর্মচাঞ্চল্যের মাধ্যমে প্রমাণ পেতে পারে। এজন্য কোন বিশেষ পদ্ধতির

www.icsbook.info

আশ্রয় নিতে হয় না। আন্দোলনের কর্মকাণ্ডে, বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যদি সে উৎসাহ পায়, মৃত্যুভয় অথবা অন্যান্য প্রতিকূলতা তাকে গাফেল করে না রাখে তাহলে বুঝতে হবে শাহাদাতের কামনা তাঁর মধ্যে উপস্থিত রয়েছে। আর এর বিপরীত হলে বুঝতে হবে তার মধ্যে শাহাদাতের প্রেরণা বা জযবা নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর পথে লড়াই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

আল্লাহর পথে লড়াই করা কর্তব্য সেই সব লোকেরই যাঁরা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে দেয়। আল্লাহর পথে যে লড়াই করে ও নিহত হয়, কিংবা বিজয়ী হয়, তাঁকে আমরা অবশ্যই বিরাট ফল দান করব। (সূরা আন নিসা-৭৪)

বস্তুত যাঁরা নিজেদের জীবনকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দেয় তাঁরাই আল্লাহর পথে কিতাল (লড়াই) করতে পারে। কিতাল হলো জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায়, যুদ্ধে যারা মারে ও মরে অর্থাৎ পরস্পরকে হত্যা করার কাজই কিতাল। যুদ্ধে যাঁরা শাহাদাতবরণ করে অথবা বিজয় লাভ করে গাজী হয় উভয়ের জন্যই আল্লাহর বিরাট পুরস্কার দেয়ার কথা বলেছেন। কিতাল শুধু মুমিনরাই করে না যাঁরা কাফের বেঈমান তারাও কেতাল করে। মুমিনরা কেতাল করে আল্লাহর পথে আর কাফেররা কেতাল করে তাগুতের পথে।

আল্লাহর নাফরমানীর কয়েকটা স্তর আছে। এর মধ্যে যারা আল্লাহর নির্দেশ পালন করে না তারা ফাসেক। আর যারা আল্লাহর আদেশ নিষেধকে স্বীকারই করে না তারা হলো কাফের। আর তাগুত হলো নাফরমানীরও সীমালংঘনকারী। তাগুত নিজে তো আল্লাহর হুকুম পালন করে না, অন্যদেরকেও নিজের আদেশ নিষেধ মানতে বাধ্য করে। এক কথায় আল্লাহর নাফরমানীর এ সীমালংঘনকে বলা যায় বিদ্রোহ। একটি দেশে কেউ রাষ্ট্রের হুকুম মান্য না করলে তাকে বলে অপরাধী আর কেউ যদি রাষ্ট্রের প্রাধান্যই স্বীকার না করে এবং অন্যান্যদের রাষ্ট্রবিরোধী কাজে ডাকে তাহলে তাকে বলা হয় রাষ্ট্রদ্রোহী। ঠিক তেমনি তাগুত হলো বিদ্রোহী। এজন্য ইবলিসকে যেমন তাগুত বলে তেমনি কায়েমি স্বার্থবাদী শক্তিকেও বলা হয় তাগুত। তাই অন্তর থেকেই তাগুতি শক্তিগুলিকে অস্বীকার করতে হবে। যে কলেমা পড়ে একজন লোককে ঈমান আনতে হয় তাতে আগে তাগুতকে অস্বীকার করার কথা বলা হয়েছে। এর পরই আসে আল্লাহর প্রতি ঈমান। অতএব তাগুত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে সে পূর্ণভাবে ঈমানকে উপলব্ধি করতে পারবে না। জমিতে ভাল ধানের চাষ করতে হলে প্রথমে আগাছাসমূহ উত্তমরূপে পরিস্কার করতে হবে। তা না হলে ফসল পাবার আশা অর্থহীন। অনুরূপভাবে মনে ঈমানের চাষ করতে হলে তাগুতের উৎখাত অবশ্যম্ভাবী। আর তাগুত কী তা না জানলে উৎপাটন করবে কী করে? বস্তুত তাগুত ও ঈমান এ দুয়ের মাঝামাঝি কোন পথ নেই, হয় আল্লাহর পথে জিহাদ করবে না হয় তাগুতের পথে। কেননা, আল্লাহ মানুষকে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, খেলাফত মর্যাদা ছাড়া মানুষের অপর কোন মর্যাদা নেই। হয় আল্লাহর খলিফা হবে, না হয় ইবলিসের খলিফা হবে। খলিফা তাকে হতেই হবে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক মানুষ কেতাল করছে হয় কি সাবিলিল্লাহ না হয় ফি সাবিলিত তাগুত, প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে।

www.icsbook.info

শহীদের কামনা

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ যাঁরা জীবন দান করে তাঁদের মৃত বলা যাবে না, তারা মৃত্যুহীন। সূরা বাকারার ১৫৪ নং আয়াতে বলা হচ্ছে- "আর যাঁরা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাঁদেরকে মৃত বলো না, এসব লোক প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত, কিন্তু তাঁদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোন চেতনা হয় না।" সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ ও ১৭০ নং আয়াতে আর একটু ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে।

যাঁরা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাঁদের মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক পাচ্ছে। আল্লাহ তাঁদের নিজ অনুগ্রহে যা কিছু দান করেছেন তা পেয়ে তাঁরা খুশি ও পরিতৃপ্ত এবং যেসব ঈমানদার লোক তাঁদের পেছনে দুনিয়ায় রয়ে গেছে এখনো সেথায় পৌঁছেনি তাদেরও কোন ভয় ও চিন্তা নেই জেনে তারা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত।"

উল্লেখিত আয়াত থেকে একথা সুস্পষ্ট যে যাঁরা শহীদ হয়েছে তাঁরা শুধু নিজেদের মর্যাদার জন্যই সন্তুষ্ট নয়, অধিকন্তু তাদের যেসব সাথী দুনিয়ায় রয়ে গেছে এবং শাহাদাতের মর্যাদা এখনো পায়নি তারাও এপথে আসবে ও শাহাদাতের মর্যাদা পাবে। এ কামনায় তারা সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত। হাদীস শরীফে আছে যারা দুনিয়ায় শাহাদাতের মর্যাদা পেয়েছে তাঁরা কামনা করে যে, তাঁদের সাথী যারা শাহাদাতের মর্যাদা পায়নি তারাও যেন এ মর্যাদা পায়। এবং তারা এ কামনা করে সন্তুষ্ট হয়। আমরা যে অনুগ্রহ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি আমাদের ভাইয়েরাও সে অনুগ্রহ পেয়ে খুশি হবে। অপর এক হাদীস শরীফে আছে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতে যাঁরা যাবে তাঁদের মধ্যে শহীদগণ ছাড়া একজনও এ কামনা করবে না যে, সে দুনিয়ায় আবার ফিরে আসুক কিন্তু শহীদগণ কামনা করবেন যে আল্লাহ দুনিয়ায় তাঁদেরকে আবার ফেরত পাঠান যাতে আবার শহীদ হয়ে আসতে পারে। এভাবে আরো ১০ বার যেন আল্লাহর পথে নিহত হতে পারে সে কামনা তাঁরা করবে।

শাহাদাতের মর্যাদা

শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে। এখানে আমরা কুরআন থেকে দু'টি আয়াত এবং একটি হাদীস উল্লেখ করছি।

সূরা আল হজ্ব এর ৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "যাঁরা হিজরত করল আল্লাহর পথে তারপর নিহত হল কিংবা এমনিতেই মারা গেল আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে উৎকৃষ্ট রিযিক দান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহই উৎকৃষ্ট রিযিকদাতা।

সূরা মুহাম্মদের ৪-৬ নং আয়াতেও অনুরূপভাবে বলা হয়েছে। "অতএব এই কাফেরদের সাথে যখন তোমাদের সম্মুখ সংঘর্ষ সংঘটিত হবে তখন প্রথম কাজই হল গলা কর্তন করা। এমনকি তোমরা যখন খুব ভালভাবে তাদেরকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে, তখন বন্দী লোকদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলবে। অতএব অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে,

www.icsbook.info

কিংবা রক্ত বিনিময় গ্রহণের চুক্তি করে নেবে, যতক্ষণ না যুদ্ধ-অস্ত্র সংবরণ করে। এই হল তোমাদের করার মত কাজ। আল্লাহ চাইলে তিনি নিজেই সবকিছু বোঝাপড়া করে নিতেন কিন্তু তিনি এ পন্থা এজন্য অবলম্বন করেছেন যেন তোমাদের একজনের দ্বারা অন্যজনের পরীক্ষা ও যাচাই করতে পারেন। আর যেসব লোক আল্লাহর পথে নিহত হবে আল্লাহ তাদের আমলসমূহকে কখনই নষ্ট ও ধ্বংস করবেন না।" তিনি তাঁদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন, তাদের অবস্থা সুসংহত করে দেবেন এবং তাদেরকে সে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার বিষয়ে তিনি তাঁদেরকে অবহিত করিয়াছেন।

এখানে মর্যাদার কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে–

১। আল্লাহর পথে যাঁরা নিহত হয়েছে তাঁদের আমল কোনক্রমেই নষ্ট হবে না।

২। আল্লাহ তাঁদের সোজা জান্নাতের পথ দেখিয়ে দেবেন, মাঝখানে দাঁড়ি-পাল্লার ব্যাপার নেই।

৩। তাঁদের অবস্থা সব দিক থেকেই সুসংহত বা ঠিকঠাক করে দেবেন।

৪। তাঁদেরকে যে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে তাঁর পরিচয় আগে থেকেই দেয়া থাকবে। দুনিয়াতে যে জান্নাতের খোশ-খবর দেয়া হয়েছে সেখানেই প্রবেশ করানো হবে, এমন নয় যে বলা হয়েছে একটায় আর প্রবেশ করানো হবে অন্যটায়।

হাদীসটি হচ্ছে- নবী করীম (সাঃ) বলেন, "জেনে রেখো জান্নাত হল তলোয়ারের ছায়া তলে।"

তলোয়ার যে ধরেনি, বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে আসলো না তাঁর আবার জান্নাত কিসের? ক'ত জোর দিয়ে বলা হচ্ছে জেনে রাখো জান্নাত তো তলোয়ারের ছায়াতলে।

শেষ পর্যায়ে এসে কতগুলো হাদীস উল্লেখ না করলে উপরের কথাগুলো পরিস্কার হয় না। শাহাদাতের প্রেরণা কত প্রবল হতে পারে সাহাবায়ে কেরামের জীবনের কতিপয় উদাহরণ উল্লেখপূর্বক এখানে ৬টি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

১। প্রথম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত রাবিয়াতুল কায়াব (রা.) তিনি বলেছেন আমি নবী করীম (সাঃ) এর খেদমত করতাম দিনের বেলা, রাতে চলে যেতাম। একরাতে আমি রাসূল (সাঃ) এর খেদমতে রয়ে গেলাম। আমি শুনলাম যে রাসূল (সাঃ) কেবল সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, পড়তে থাকলেন এবং বললেন যে দেখ সুবহানাল্লাহ পড়লে 'মিজান' পরিপূর্ণ হয়ে যায়। শুনতে শুনতে আমার ঘুম ঘুম ভাবের সৃষ্টি হল। এ রকম প্রায়ই হতো। একদিন রাসূল (সাঃ) বললেন হে রাবিয়া, আমার কাছে যদি তুমি কিছু চাও তাহলে তা আমি তোমাকে দেব। আমি বলল'ম দুনিয়াটা তো নষ্ট হয়ে যাবে এটি চেয়ে কী লাভ। আমি বললাম আমি একটু চিন্তা করে নিই যে, আমি কী চাইব। আমি ভাবলাম আপনি আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকে দোযখ থেকে বাঁচান এবং জান্নাতে প্রবেশ করান। রাসূল (সাঃ) বললেন- এটাই তুমি চাইলে? বলে চুপ করে গেলেন এবং বললেন কে তোমাকে এ কথাটি

www.icsbook.info

শিখালো? আমি বললাম কেউ আমাকে শিখায়নি। তবে আমি তো জানি যে দুনিয়া ধ্বংসশীল। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে এবং জানি যে আল্লাহর কাছে এমন একটি স্থান আছে যা আপনি চাইলেই আল্লাহর কাছ থেকে আপনি দিতে পারেন। এজন্য এ দোয়া করবেন। রাসূল (সাঃ) বললেন, আমি অবশ্যই তোমার জন্য এ দোয়া করবো। আমাকে তুমি সাহায্য কর বেশি বেশি সিজদা করে অর্থাৎ আমি যে তোমাকে দোয়া করব তোমার জন্য এ দোয়া কবুল হবে বেশি বেশি সিজদা করলে বা নামায আদায় করলে।

আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত একদিন আমি রাসূল (সাঃ) এর কাছে বললাম ইয়া-রাসূলুল্লাহ আপনি আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন যে আমল করলে আমি বেহেশতে যাব। মানে বেহেশতই তাদের ধান্ধা, দুনিয়ার কোন ধান্ধা নেই।

২। জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, ওহুদের দিনে যখন আবদুল্লাহ বিন আমর (জাবিরের পিতা) শহীদ হলেন তখন রাসূল (সাঃ) বললেন হে জাবির, তোমার বাবাকে আল্লাহ কী বললেন তাকি তোমাকে আমি বলবো? আল্লাহ তায়ালা কারো সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন না কিন্তু তোমার বাবার সঙ্গে সরাসরি কথা বললেন। তোমার বাবাকে আল্লাহ বললেন, হে আব্দুল্লাহ তুমি আমার কাছে কী চাও। তিনি বললেন যে আল্লাহ! তুমি আমাকে আবার জীবিত কর, আবার আমি নিহত হতে চাই। তখন আল্লাহ বললেন যে, এ নিয়ম তো নেই, আগেই এর ফয়সালা হয়ে গেছে, কেউ একবার এখানে আসলে আর ফেরত যায় না। তিনি বললেন হে আল্লাহ তাহলে অন্তত এটা কর, আমি এই যে আকাঙ্খাটা করলাম এটি আমার পেছনে যে ভাইয়েরা আছে তাদের কাছে পৌঁছে দাও। এরপর এ আয়াত নাজিল করে আল্লাহ এ কথাটা পৌঁছে দিলেন সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ ও ১৭০ নং আয়াত এ উদ্দেশ্যেই নাজিল হয়েছে।

৩। আনাস (রা.) বলেন, আমার চাচা আনাস বিন নাজার বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি রাসূলকে (সাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রথম যে যুদ্ধ করলেন, সে যুদ্ধে আমি তো হাজির ছিলাম না। কিন্তু এরপর যদি আল্লাহ তায়ালা কোন যুদ্ধের সুযোগ দেন তাহলে আল্লাহ দেখতে পাবে আমি কী করি। যখন ওহুদের দিন এলো তখন মুসলমানদের কিছু লোক ভুল করলো এবং দুরবস্থা দেখে কিছু লোক ভেগে গেল, তখন তিনি আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বললেন- হে আল্লাহ! আমার ভাইয়েরা তোমার সাথে যে আচরণ করলো এজন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাই, আর মুশরিকরা যে আমাদের সাথে এ আচরণ করলো, এ ব্যাপারে আমি দোষী নই। এরপর তিনি আগে বেড়ে গেলেন এবং সাঈদ বিন মায়াজ (রা.) এর সাথে তার দেখা হলো। বললেন হে মায়াজ! জান্নাত, জান্নাত, আমি সাহায্যকারী রবের কসম করে বলছি আমি ওহুদের দিক থেকে জান্নাতের গন্ধ পাচ্ছি।

অতঃপর সাদ বললেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইনি যুদ্ধে যা দেখালেন আমি তা পারতাম না। আনাস বললেন, আমার চাচার গায়ে আমি আশিটি জখম দেখলাম। প্রায় সবই তলোয়ারের, বল্লমের ও তীরের আঘাত। দেখলাম মুশরিকরা তাকে নিহত করেই

www.icsbook.info

ক্ষান্ত হয়নি, একেবারে বিকৃত করে ছেড়েছে। কেউ তাকে চিনতে পারেনি, একমাত্র তার বোন তার আঙুল দেখে চিনতে পেরেছে। আনাস বলেন– আমরা সকলেই ধারণা করি এ আয়াতটি এ জাতীয় ঘটনার পর নাজিল হয়েছে (সূরায়ে আহযাবের ২৩ নং আয়াত) "মুমিনদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছে তা সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কতক জীবন দান করেছে আর কতক অপেক্ষায় আছে। তারা তাদের আচরণ বদলায়নি।

৪। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত কতক লোক রাসূলের (সাঃ) কাছে এসে বললো হে রাসূল, আমাদেরকে কুরআন হাদিস শিখানোর জন্য কিছু লোক দিন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আনসারদের মধ্যে থেকে সত্তর জন লোক তাদের সাথে দিয়ে দিলেন, তাদেরকে কুরআন হাদীস শিখানোর জন্য। তারা সব ক্বারী ছিলেন, এদের মধ্যে আমার মামা হারাম শরীফ ছিলেন। তারা রাতের বেলা কুরআন শিখাতেন, আর দিনের বেলা পানি উঠাতেন। পানি এনে মসজিদে রাখতেন, তারা দিনের বেলা আরো একটি কাজ করতেন। তারা লাকড়ি কুড়াতেন, বাজারে বিক্রি করে তা দ্বারা আহলে ছুফ্‌ফা ও অন্যান্য গরিবদের জন্য খাবার কিনে আনতেন। ঐ লোকেরা ছিল বিশ্বাসঘাতক। তারা তাদেরকে কতল করে ফেললো, সত্তর জনকেই কতল করল। যখন তাদেরকে কতল করা হচ্ছিল তখন তারা দোয়া করলেন হে আল্লাহ আমাদের নবীর কাছে খবরটা তুমি পৌঁছিয়ে দাও, যে আমরা আমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি, আমরা আমাদের রবের উপর খুশি হয়ে গেছি আর রবও আমাদের উপর খুশী হয়ে গেছেন। আমাদের মামা হারামের কাছে একজন লোক এলো এবং পেছন থেকে বর্শা দিয়ে তাকে আঘাত করল। বর্শা শরীরে বিদ্ধ হয়ে এপার ওপার হয়ে গেল। তিনি বললেন- কাবার রবের কসম আমি কামিয়াব হয়েছি। ওহির মাধ্যমে এ খবর রাসূল (সাঃ) জানতে পেরে, লোকদেরকে বললেন- দেখো তোমাদের ভাইয়েরা নিহত হয়ে গেছে কিন্তু তারা আল্লাহর কাছে এ দোয়া করল- "হে আল্লাহ আমাদের নবীকে এ কথা পৌঁছিয়ে দিন যে আমরা আমাদের রবের সাথে মিলিত হয়েছি, আমাদের কুরবানিতে আমাদের রব খুশি হয়েছেন এবং আমরা আমাদের রবের পুরস্কার পেয়ে খুশি হয়েছি।

৫। আবি বকর ইবনে আবী মুসা আশায়ারী (রা.) বললেন, তারা দু'জনেই যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন। রসূল বললেন, নিশ্চয়ই জান্নাতের দরজাগুলো তলোয়ারের ছায়াতলে। একজন লোক দাঁড়িয়ে গেল যার কাপড়-চোপড় তেমন ছিল না, বললো হে আবী মুসা রাসূল (সাঃ) কী বললেন শুনলেন তো। তিনি বললেন, হ্যাঁ শুনলাম। তারপর লোকটি বন্ধুদের কাছে গিয়ে বললেন তোমাদেরকে সালাম দিয়ে যাচ্ছি, আর আসবো না। তারপর তার তলোয়ারের খাপটা ভেঙে ফেলে দিলেন, এরপর তলোয়ার নিয়ে দুশমনদের দিকে চললেন, তাদেরকে মারতে থাকলেন যে পর্যন্ত না তিনি নিহত হলেন।

৬। হযরত শাদ্দাদ বিন হাদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, এক গ্রাম্য আরব রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসে ঈমান আনল এবং তাঁর সঙ্গী হয়ে গেল। সে বলল "আমি বাড়ি-ঘর

www.icsbook.info

ছেড়ে আপনার সাথে মদিনায়ই থাকব।"

এ লোক সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) কতক সাহাবাকে কিছু হেদায়াত দিলেন। যখনই জিহাদ হতো তাতে যে গনিমতের মাল মিলতো তা থেকে তিনি ঐ লোকের জন্যও অংশ দিতেন এবং তা কোন এক সাহাবীর দায়িত্বে জমা রাখতেন যাতে সে লোক এলে তাকে তা দেয়া হয়। ঐ লোক উপস্থিত ছিল না। সে মুজাহিদদের উট চরাবার জন্য গিয়েছিল। ফিরে আসার পর তাঁর হিস্যা তাকে দেয়া হলে সে বলল, 'এটা কী? লোকেরা বলল যে রাসূল (সাঃ) আপনাকে দিয়েছেন। সে তার হিস্যা নিয়ে রাসূল (সাঃ) এর কাছে যেয়ে জিজ্ঞাসা করল যে এসব কী? রাসূল (সাঃ) বললেন যে এটা তোমার হিস্যা যা আমি তোমাকে দিয়েছি। সে বলল, আমি তো এ মালের জন্য আপনার সঙ্গী হইনি। আমি তো এ জন্য আপনার অনুগত হয়েছি যে আমার গলায় দুশমনের কোন তীর এসে লাগবে আর আমি শহীদ হয়ে বেহেশতে চলে যাব।

রাসূল (সাঃ) বললেন, যদি তোমার নিয়ত সঠিক হয় তাহলে আল্লাহ তোমার সাথে এরূপই করবেন।

কিছুদিন পর যখন লোকেরা জিহাদে গেল তখন এ লোকও তাদের সাথে শরিক হলো। যখন তার লাশ রাসূল (সাঃ) এর কাছে আনা হলো তখন দেখা গেল তার গলায় দুশমনের তীর লেগেছে।

রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এ কি সেই লোক যে শাহাদাত কামনা করেছিল? সবাই বলল হ্যাঁ। রাসূল (সাঃ) বললেন, সে আল্লাহর নিকট খাঁটি আশা করেছিল বলে আল্লাহ তা পূরণ করলেন। তারপর রাসূল (সাঃ) নিজের জামা খুলে তা দিয়ে ঐ লোকের কাফন দিলেন, তার জানাযা পড়লেন এবং তার জন্য এ দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ এ লোক আপনার বান্দাহ যে আপনার পথে হিজরত করেছে এবং আপনার পথেই সে শাহাদাত পেল। এ বিষয় আমিই তার সাক্ষী।"

এসব হাদীস থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা খুবই স্পষ্ট। আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া মুমিনের জীবনে কিরূপ কাম্য হওয়া উচিত এর খাঁটি নমুনা এ হাদীসগুলোতে পাওয়া গেল। আল্লাহ পাক কার মউত কিভাবে কোথায় দেবেন একথা কারো জানার উপায় নেই। সাহাবায় কেরামের মধ্যে কত লোক শহীদ হলেন, কিন্তু বদর যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত সকল যুদ্ধে শরিক থাকা সত্বেও প্রথম চারজন সত্যপন্থী খলিফা কোন যুদ্ধে শহীদ হননি। কিন্তু তাঁরা শাহাদাত কামনা করতেন বলে যুদ্ধের ময়দান ছাড়াই তাঁরা শাহাদাত লাভ করেছিলেন?

শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়ার খাঁটি কামনা যারা করবে তাদের জন্য রাসূল (সাঃ) সুসংবাদ দিয়েছেন যে তারা বিছানায় মারা গেলেও আল্লাহ তাদেরকে সে মর্যাদা দান করবেন। তাই আমাদের সবারই ইখলাসের সাথে আকাঙ্ক্ষা করা দরকার যেন আমাদের জীবনে শাহাদাত নসিব হয়। আল্লাহ পাক আমাদের এ আকাঙ্ক্ষা কবুল করুন। আমিন॥

লেখক: সাবেক আমীরে জামায়াত, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

www.icsbook.info

আমার স্মৃতিতে
আবুল কাশেম পাঠান

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

ব্রুনেই রয়্যাল এয়ার লাইনস-এর বিমানে ঢাকার পথে ব্যাংকক রওনা করেছি। ব্রুনেই গেজেটের পৃষ্ঠায় চোখ বুলাচ্ছিলাম। হঠাৎ বাংলাদেশের একটি ছোট খবর নজরে পড়লো। খুলনায় সরকারি দলের গুলিতে একজন ছাত্রনেতা নিহত। ইসলামী ছাত্রশিবির নেতা আবুল কাশেম পাঠান গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই শাহাদাতবরণ করেছে। খবরটি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কয়েকবার সতর্কতার সাথে পড়লাম। বুঝতে পারলাম ক্ষমতাসীন দল খুলনাকে শিবির মুক্ত করার জন্য সরকারি বি.এল. কলেজের জি.এস. ছাত্রশিবির নেতা মুন্সী আব্দুল হালিমকে নৃশংসভাবে হত্যা করার পর এ.জি.এস. আবুল কাশেম পাঠানের উপর আঘাত হেনেছে। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল।

আবুল কাশেম পাঠানের হাস্যোজ্জ্বল চেহারাটা ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে, ব্রুনেই দারুস সালামের রাজধানী বন্দর সেরী বেগুয়ানে। কয়দিন নয়নাভিরাম নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখে বেশ হালকা বোধ করছিলাম। মরহুম মাওলানা আবু বকর শেরকুলী এমপির সুযোগ্য পুত্র ইঞ্জিনিয়ার আফতাবের আন্তরিক আতিথেয়তায় ক'টি চমৎকার দিন কাটিয়ে খুব উৎফুল্ল ও সতেজ মন নিয়ে যখন আকাশ পথে ফিরছি দেশে তখনই আকস্মিকভাবে আবুল কাশেম পাঠানের মর্মান্তিক শাহাদাতের খবর আমার হৃটদয়টাকে ভেঙে যেন টুকরা টুকরা করে দিল। এ সময়ে আমি ছিলাম একা। কেউ আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতও

www.icsbook.info

ছিল না। অনেক কষ্টে আবেগ ও কান্না সংবরণ করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু চোখের পানিকে বাঁধ মানাতে পারলাম না। অনেকক্ষণ নীরবে অশ্রু ঝরছিল। এক সময় আপনা আপনিই শান্ত হলাম।

ব্যাংককে এক সাংবাদিক বন্ধুর সাথে দেখা করার ওয়াদা ছিল। যখনই এ পথে যাওয়ার আমার কোন সুযোগ হয় একদিনের জন্য হলেও যেন ব্যাংককে যাত্রা বিরতি করে তার সাথে দেখা করি। ভদ্রলোক জন্মগতভাবে বাংলাদেশী। কিন্তু অনেক বছর আগে থেকেই ব্যাংককে আছেন। একবার বাংলাদেশে এসে বেশ অসুবিধায় পড়েছিলেন পাসপোর্ট ও টাকা পয়সা হারিয়ে। তখন তার সাথে আমার বেশ হৃদ্যতা হয়েছিল। যা হোক আবুল কাশেম পাঠানের শাহাদাতের খবর জানার পর ব্যাংককে যাত্রা বিরতির চিন্তা বাতিল করলাম। ব্যাংকক বিমানবন্দরে পৌঁছে Transit কাউন্টারে যোগাযোগ করে ফ্লাইট পরিবর্তন করতে হলো। বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে দেশে ফেরার কথা ছিল দু'দিন পর। তৎক্ষনাৎ থাই ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটে ঢাকার পথে রওনা দিলাম।

> মনে পড়লো আরেকবার ভিপি জাকির ও জি.এস. মুন্সী আব্দুল হালিমকে সাথে নিয়ে কাশেমের ঢাকায় আসার কথা। প্রেসিডেন্ট ও শিক্ষামন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে বি.এল. কলেজের ছাত্রদের জন্য একটি বাস জোগাড় করতে এসেছিল। কেন্দ্রীয় জামায়াত অফিসে যাবার পথে আমার সাথে দেখা। বললো নিজামী ভাইয়ের সাথে দেখা করে আপনার অফিসে আসবো। আপনার জন্য সামান্য মধু এনেছি। সংগ্রাম অফিসে রেখে এসেছি।

অনেক ভাবনায় মাথাটা ভারী হয়ে আসছিল। আবুল কাশেম পাঠানের সাথে আমার পরিচয় অনেক ভিড়ের মাঝে কিন্তু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ও মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেবার যে অসাধারণ যোগ্যতা আবুল কাশেম পাঠানের ছিল, তার ফলেই সে আমার প্রিয় পাত্রদের একজনে পরিণত হয়েছিল। যখনই আসত আমার সাথে সোনার বাংলা কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করত। অল্প সময় কথা বলত। সব কাজের কথা। আন্দোলনের সমস্যা ও প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া বলতো না।

ওর সাথে একটু বেশি সময় নিয়ে কথা বলার সুযোগ হয় মেয়র নির্বাচন উপলক্ষে আমার খুলনা সফরের সময়। এমনিতে বাইরের শহরগুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে আমার বেশি যাওয়া হয়। অনেক সময় ছাত্রশিবিরের দায়িত্বশীলদের আবদার বা অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারি না। ফলে জামায়াতের কর্মসূচির চাইতে ওসব জায়গায় শিবিরের অনেক প্রোগ্রামে আমাকে বেশি যেতে হয়।

বি.এল.কলেজ ছাত্রসংসদের সাবেক জি.এস. এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের পরবর্তীকালের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শেখ কামরুল আলমই সম্ভবতঃ আবুল কাশেম

www.icsbook.info

পাঠানকে আমার সাথে একবার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আমার অত সব স্মরণ থাকে না। কিন্তু যখনই খুলনা যেতাম আবুল কাশেম পাঠান কথা বলার সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করতো। আমার সাথে সুযোগ পেলেই আন্দোলনের ও সংগঠনের নানা বিষয়ে পরামর্শ দিতো।

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের আগে নির্বাচনী তৎপরতা ও বিভিন্ন সমস্যাদি নিয়ে কথা বলতে সময় চাইলো আবুল কাশেম পাঠান। নির্বাচনী তৎপরতা সম্পর্কে তার পর্যবেক্ষণ আমাকে এতটা মুগ্ধ করলো যে অনেক রাত জেগে আমি তার কথা শুনলাম। ঐ টগবগে কর্ম চঞ্চলযুবক বৃহত্তর আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীর ভবিষ্যৎ নিয়ে এত গঠনমূলক ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তা দেখে আমি আল্লাহর শুকরিয়া জানালাম। প্রাণভরে তার জন্য দোয়া করলাম। খুলনায় এমন একজন সাহসী ও চিন্তাশীল কর্মী তৈরী হচ্ছে এটা উপলব্ধি করে আমার ধারণা আরও মজবুত হলো যে শহীদের রক্তে রঞ্জিত খুলনার মাটি অদূর ভবিষ্যতে আন্দোলনের মজবুত ঘাঁটিতে পরিণত হবে ইন্‌শাআল্লাহ। শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান, শহীদ শেখ রহমত আলী, শহীদ আমান উল্লাহ আমানের রক্তে রঞ্জিত খুলনায় আবার আবুল কাশেমের রক্ত ঝরলো এবং এ ঘটনা যে দলমত নির্বিশেষে খুলনাবাসীর মনে আবেগ ও আলোড়ন সৃষ্টি করবে এটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম। বিমানে বসেই আমি ভাবছিলাম এমন অনেক কথা। এই তরুণ বয়সে আবুল কাশেম যে চমক সৃষ্টি করেছিল বারবার এসবই মনে পড়ছিল। আমার সাথে ও একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। কার কাছে জানতে পেরেছিল যে আমি মধু পছন্দ করি। আমি ঢাকা ফেরার সময় মধু নিয়ে হাজির। আমার হাতে মধুর পাত্রটি দিয়ে বললো দরকার হলেই আমাকে জানাবেন। আমি খাঁটি মধু সংগ্রহ করে আপনার জন্য পাঠাবো। আমি বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বললাম, ঠিক আছে। এরপর আমার আর ওকে বলা হয়নি। কিন্তু ঢাকা এলে কাশেম পাঠান ঠিকই আমার জন্য মধু নিয়ে আসতো। ওর মধু আনার ঘটনার কথা মনে পড়ায় আমার আরও কষ্ট লাগছিল।

মনে পড়লো আরেকবার ভিপি জাকির ও জি.এস. মুন্সী আব্দুল হালিমকে সাথে নিয়ে কাশেমের ঢাকায় আসার কথা। প্রেসিডেন্ট ও শিক্ষামন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে বি.এল. কলেজের ছাত্রদের জন্য একটি বাস জোগাড় করতে এসেছিল। কেন্দ্রীয় জামায়াত অফিসে যাবার পথে আমার সাথে দেখা। বললো নিজামী ভাইয়ের সাথে দেখা করে আপনার অফিসে আসবো। আপনার জন্য সামান্য মধু এনেছি। সংগ্রাম অফিসে রেখে এসেছি। ওরা এলো আমাকে খুলনায় যাবার জন্য কি একটা প্রোগ্রামের দাওয়াত দিয়ে গেল। মাত্র কয়েক মিনিটে কাজের কথা শেষ করে চলে গেল। এরপর মুন্সী আব্দুল হালিমের শাহাদাতের খবর পেয়েছি টেলিফোনে। আর দেখা হয়নি। শাহাদাতের পর নিজামী ভাইয়ের সাথে ওদের বাড়ি গিয়ে কবর জিয়ারত করেছি। এমন সব স্মৃতির ভিড় করছিল আমার হৃদয় মনকে বারবার

www.icsbook.info

আবেগাপ্লুত করে। কখন যে বিমানটি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করেছিল বুঝতেই পারিনি। বিমানবন্দরে যারা আমাকে রিসিভ করতে এসেছিলে তাদের সাথে দেখা ও সালাম বিনিময়ের পর ওরা এই ঘটনা জানালো। আমি বললাম বিমানেই আমি খবরটি পড়েছি। আমি ইতালী, জার্মানী, বৃটেন, মালয়েশিয়া হয়ে ব্রুনেই গিয়েছিলাম। বেশ দীর্ঘ সফর। কিন্তু ঢাকা ফিরে ক'দিন পরই আমি খুলনা যাই ছাত্র গণজমায়েতে যোগদানের জন্য। আবুল কাশেমের বাড়িতে গেলাম। তার মা, চাচা ও ছোট ভাইদের সাথে কথা বললাম। ওর নিজের পড়ার ঘর দেখলাম। কাশেম ওর মাকে যেমন ভালবাসতো, যত্ন নিত ও সম্মান করতো সেসব কাহিনী শুনে তার জন্য আরও প্রাণভরে দো'আ করলাম। কাশেমের পড়ার ঘরে গেলাম। তার ঘরটির সাজানো গুছানো অবস্থা দেখে মুগ্ধ হলাম। ওর বাসায় ফোনটা তার শয়নকক্ষেই থাকতো। পরিবারের ছোট বড় সকলের কাশেমের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা দেখে অভিভূত হলাম। তার বৃদ্ধ চাচা বলছিলেন, সেই ছিল পরিবারের অভিভাবক। পড়ালেখা, সংগঠন ও আন্দোলনের কাজ ছাড়াও ভাইদের ব্যবসা পরিচালনা ও সংসার সবকিছুর নেতৃত্ব দিত কাশেম পাঠান। আবুল কাশেম পাঠান ছাত্রশিবির ও জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের মাঝেই শুধু জনপ্রিয় ছিল না। দলমত নির্বিশেষে সর্বমহলে ছিল তার পরিচিতি ও সম্পর্ক। তার মধুর ব্যবহার নিষ্ঠা ও পরিশ্রম জনপ্রিয়তার কারণে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিল আবুল কাশেম পাঠান। বিভিন্ন সময়ে শাহাদাতের ঘটনায় লক্ষ্য করা গেছে সম্ভাবনাময় এবং বিশেষ গুনাবলী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদেরকেই যেন আল্লাহ তা'য়ালা শাহাদাতের জন্য বাছাই করেন। এ এক চরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। বাংলাদেশের জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্রনেতা শহীদ আব্দুল মালেকের নেতৃত্বে শহীদদের যে বিরাট কাফেলা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির পথে এগিয়ে গেছে আবুল কাশেম পাঠান সেই মিছিলে যোগদান করলো। আল্লাহ তার এই রক্ত দান ও শাহাদাৎ কবুল করুন এবং ইসলামকে দেশের বুকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য শহীদদের রেখে যাওয়া মহান সংগ্রাম সফল করুন। আমীন॥

লেখক : সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

www.icsbook.info

এ স্মৃতি অদম্য সাহসের

বেদনার নয়

অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

"আজ যদি শহীদ হতে হয় আমিই হব। আপনারা আসুন আমার সাথে, আল্লাহরই জন্য জীবন বিলাবার এ ডাক ছিল সেদিন মুন্সী আব্দুল হালিমের।

প্রখর রৌদ্রতপ্ত ২০ সেপ্টেম্বরের দুপুর। বি.এল. কলেজে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের ছাত্রনামধারী গুণ্ডাদের লোমহর্ষক, রক্তক্ষয়ী হামলা চলছে- নামায ও খাবারের জন্য ব্যস্ত শিবির কর্মীদের উপর। মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত খুনিরা রক্তের নেশায় মত্ত। চতুর্মুখী গুলিবর্ষণ। ধারালো অস্ত্রের নির্মম আক্রমণ। আকস্মিক আক্রমণে ক্যাম্পাসে সকলেই হতবিহ্বল। উপস্থিত স্বল্প সংখ্যক সাথীদের নিয়ে প্রচণ্ড ঈমানী প্রত্যয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুন্সী আব্দুল হালিম খুনিদের রুখতে। দিনভর পরিশ্রম ও ক্ষুধায় ক্লান্ত তাঁর দেহ। শাহাদাতের তামান্নায় যেন তেজোদ্দীপ্ত হয়ে উঠল সে। দীর্ঘ মোকাবিলা। প্রাণান্তকর লড়াই। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিন্দাদিল শিবির কর্মীরা। সত্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে। গুলিবিদ্ধ হচ্ছে। আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত হচ্ছে। রক্তমাখা দেহ নিয়ে এগিয়ে চলছে সম্মুখ পানে। ছাত্রনামধারী সশস্ত্র ক্যাডাররা পরাস্ত ও ভীত হয়ে পিছু হটছে কয়েকবার। ক্যাম্পাস ছাড়ছে। কিন্তু বাহির থেকে আসছে নতুন করে ভাড়াটিয়া খুনি, আর অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের সাপ্লাই। হায়েনারা খুনের নেশায় নব উদ্যমে মেতে উঠছে। আগ্নেয়াস্ত্রের মোকাবিলায় খালি হাত। ঈমানী শক্তির একক অসম যুদ্ধ। ময়দানে তখন শিবিরনেতা আব্দুল হালিম, আব্দুর রহিম, মাহফুজ, রহমত আলী, মাকসুদুর রহমান মিলন ও হাফিজ সহ কয়েকজন। মোকাবিলা হচ্ছে ক্যাম্পাসে বিক্ষিপ্তভাবে। গুলিবিদ্ধ মিলন ভাইকে নিরাপদে রাখার জন্য সাথীরা তাকে নিয়ে চললেন মসজিদে। কিছুক্ষণ পরে হালিম ভাই এসে হাজির হলেন মসজিদে। অমনি রক্ত পিপাসুরা ধেয়ে এল। মসজিদ ঘিরে সশস্ত্র ক্যাডাররা শুরু করল প্রচণ্ড গুলি ও বোমাবর্ষণ। দরজা ভেঙে মসজিদে প্রবেশ করল। এক পর্যায়ে মসজিদের বাইরে

www.icsbook.info

ধারালো অস্ত্রের নির্মম আঘাতে আঘাতে, কুপিয়ে কুপিয়ে ওরা ছিন্ন ভিন্ন করল আব্দুল হালিমের দেহ। কাছ থেকে গুলি করে ঝাঁঝরা করল হাফিজের দেহ। লুটিয়ে পড়ল সে রক্তাক্ত দেহে মসজিদে। রক্তে লাল হয়ে উঠল আল্লাহর ঘর মসজিদ। শেখ রহমত আলীকে তিতুমীর হলের ভেতর ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে তার অবশ নিথর রক্তাক্ত দেহ টেনে হেঁচড়ে নিয়ে এল হল থেকে মাঠের দিকে। হলের সিঁড়ি রাস্তা আর সবুজ মাঠ রহমতের ছোপ ছোপ রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। হালিম ভাইয়ের নিথর দেহ টেনে হেঁচড়ে মসজিদ থেকে বাইরে নিকটস্থ পুকুরে ছুড়ে দিল খুনিরা। সেখান থেকে টেনে তুলে অসার রক্ত লাল দেহখানি ঘাটের উপর তুলল। গলায় ছুরি চালালো ওরা আব্দুল হালিমের বুক আর মাথা চেপে ধরে। পেশাদার কসাইকেও হার মানালো।

সংঘর্ষের দিন দুপুরে খবর পেয়েই আমি ছুটলাম। দেখি গুলিবিদ্ধ। রক্তাক্ত দেহ নিয়ে শিবির কর্মীরা আসছেন শ্রমিক কল্যাণ অফিসে। খবর এল খুলনা আলীয়া মাদ্রাসার এতিম আমানকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। বি.এল. কলেজের ভয়াবহ সংঘর্ষের খবর জানলাম। গুরুতর কয়েকজনের খবর পেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে ছুটে এলেন খুলনা মহানগরী জামায়াতের আমীর অধ্যাপক আবদুল মতিন ভাই। এলেন শিবির সভাপতি আব্দুল ওয়াদুদ। একে একে এলেন অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আহতদের কাউকে কাউকে শ্রমিক কল্যাণ অফিসে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হল। কাউকে পাঠানো হল খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কলেজ থেকে সরাসরি অনেক আহতদের পুলিশের গাড়ি ও বিভিন্ন যানবাহনে নেয়া হল হাসপাতালে। ইমার্জেন্সী থেকে অপারেশন থিয়েটার। যেন লাল রক্তের স্রোত বইছে। আহতদের আহাজারি, সাথীদের বুকফাটা কান্না মর্মস্পর্শী সে দৃশ্য। নিথর হালিম, রহমত, হাফিজকে যখন হাসপাতালে আনা হল তখন লোক মুখে ছড়িয়ে পড়ল বোধ হয় হালিম ভাই নেই। রহমত ভাই নেই।

চতুর্দিকে বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়া সংবাদে পাগলের মত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা একদিকে হাসপাতাল অন্যদিকে শ্রমিক কল্যাণ অফিসে জড়ো হতে লাগলেন। হু হু করে কাঁদছে শিবির কর্মীরা। হালিম ভাই কোথায়? কি অবস্থা তার? বহু কষ্ট করেও হালিমের সাথীদের ধৈর্য ধরাতে পারছিলাম না। উপুড় হতে চিৎ হয়ে শ্রমিক কল্যাণ চত্বরে আর্তচিৎকার করছিলেন।

আব্দুল হালিমের খবরের জন্য বারবার হাসপাতালের ইমার্জেন্সীতে টেলিফোন করছি। একবার দৌলতপুর কলেজের জি.এস. কামরুল ভাই ইমার্জেন্সী থেকে জানালেন "অবস্থা বেশি ভাল না। তবে ডাক্তাররা চেষ্টা করছেন আপ্রাণ। কিছুক্ষণ পর আবার খবর পেলাম-"হালিম ভাই শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছেন।"

www.icsbook.info

শাহাদাতের চির সবুজ লালিত চেতনা ছিল হালিমের। সে তার নিজের ডায়েরিতে লিখেও এ আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছিল- "আমি যেন শহীদ আব্দুল মালেক, সাব্বির, হামিদ ও অসংখ্য শহীদদের মিছিলের সাথী হতে পারি। আমিও আসছি শহীদদের মিছিলে।" মা'বুদের প্রিয়তম সে হালিম চলে গেলেন- তারই জীবনের মালিক, আরশে আজিমের মালিক, দয়াময় সে মা'বুদেরই কাছে। শাহাদাতের অমিয় সুধা পানে ধন্য হল সে। হল অতৃপ্ত আত্মার মহাতৃপ্তি। নীরব বিস্ময়ে দেখল দুনিয়া- এ যুগের কারবালার এক হোসাইনকে। ফিরিশতারা দেখল নির্মল এক পড়ন্ত বিকেলে আল্লাহর সাথে তাঁর এক বান্দাহর অকৃত্রিম মহাপ্রেম। হালিম ভাইকে হারানোর শোক যেন প্রচণ্ড বেদনা হয়ে বিদ্ধ হল বুকে। পাথর হলাম কি বলব এখন ক্রন্দনরত শত শত শিবির কর্মীদের? কি বলে সান্ত্বনা দেব ওদের? শ্রমিক কল্যাণের সামনে অপেক্ষমাণ শত শত কর্মীদের সান্ত্বনা দেবার-বুঝাবার চেষ্টা করলাম মহানগরী আমীরসহ সকলে মিলিত হয়ে।

এহেন শোকাহত পরিবেশ- এমন নির্মম হত্যাকাণ্ড। তবুও খুনিরা ক্ষান্ত না হয়ে হাসপাতালের পথে পথে আহত ও সাধারণ শিবির কর্মীদের উপর উপর্যুপরি হামলা ও আক্রমণ চালাতে লাগলো। চতুর্দিকে যেন ছড়িয়ে পড়ছে-ত্রাস আর সন্ত্রাস। মহানগরী আমীর অধ্যাপক আবদুল মতিন ভাইয়ের ত্বরিত ও পরিকল্পিত নির্দেশে সকল দায়িত্ব নিয়ে আমরা বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত হলাম।

শহীদের লাশের পোস্টমর্টেম, মামলা, আহতদের সেবা, প্রশাসনিক যোগাযোগ, জনশক্তির মোটিভেশন, জানাযা, দাফন ইত্যাদি কাজে দায়িত্বশীলরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। খুলনা সদর হাসপাতাল থেকে পোস্টমর্টেমের জন্য শহীদের লাশের সাথে আমিও মর্গে গেলাম। সেখান থেকেই পুলিশের সন্দেহজনক আচরণ ও চরম বৈরিতায় আমরা বুঝতে পারলাম ক্ষমতাসীন দলের ষড়যন্ত্র। লাশ আমাদের দেয়া হবে না। শেষ পর্যন্ত তাই হল। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সব প্রচেষ্টা চালিয়েও লাশ তো পাওয়া গেলই না। বরং গভীর রাতে শহীদ আব্দুল হালিমের লাশের কাছ থেকে প্রায় ৪০ জন শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করা হল। শহীদ আমানের লাশ গোপনে পাঠিয়ে দেওয়া হল সাতক্ষীরায় তার গ্রামের বাড়িতে। সেখানেও পরে নেতৃবৃন্দ রওয়ানা হলেন এবং দাফনে অংশ নিলেন।

আমাদের দাবি ছিল শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিমের প্রাণের বিদ্যাপীঠ বি.এল. কলেজে তার জানাযা ও দাফন হবে। কিন্তু প্রশাসন তাও দিল না। সকালে পুলিশের দায়িত্বে লাশ শহীদের বাড়ি ফুলতলার মশিয়ালী গ্রামে রওয়ানা হল। আমাকে দ্রুত লাশের সাথে শহীদের বাড়িতে যাওয়ার দায়িত্ব দেয়া হল। মোটরসাইকেলে ছুটলাম। পথের দু'পার্শ্বের গাছপালা, মানুষ, সব যেন শোকাহত। আমি যেন এক নির্জন, বেদনাহত মৃতপুরীর মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছি। খালিশপুর থেকে পথের বাজার। পথটুকু কিভাবে সেদিন গিয়েছিলাম, আজও তা ভাবতে বুকের মধ্যে শূন্যতা বোধ করি।

www.icsbook.info

খুলনা-যশোর মহাসড়কের পূর্বপার্শ্বে আর শান্ত প্রবহমান ভৈরব নদীর পশ্চীম তীরে প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত শহীদের বাড়ি। যখন পৌঁছলাম, দেখি বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত শহীদের শোকাহত সাথীরা আসছে দূর-দূরান্ত থেকে। শহীদ আব্দুল হালিমের সম্মানিত পিতা মুন্সী মোহাম্মদকে বুকে জড়িয়ে প্রাণভরে সান্ত্বনা দিলাম। পিতাকে ধৈর্যের আবেদন জানালাম কিন্তু পিতা পাথর। শহীদের ভাই আবদুল হাই, আবদুল হামিদ, হাকিম ও হাসিব সহ অন্যান্য ভাই-বোন ও মাকে কি বুঝাবো? নিজেকেই তো নিজে সামাল দিতে পারছি না। যা সে অন্তরের আবেগ, তাই বললাম তাঁদের। কিন্তু তাতে তাঁদের আহাজারি থামাতে পারলাম না।

দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তার নির্দেশ "তাড়াতাড়ি দাফন সম্পন্ন করতে হবে।" আমি প্রতিবাদ করলাম। বললাম শহীদের অনেক সাথীরা আসবে দূর-দূরান্ত থেকে। দেখবে শেষ বারের মত শহীদকে। তাই সময়মত আমরা দাফন করব।

শহীদি কাফেলার কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শহীদের প্রিয় কামরুল আলম ভাই, আর এক কাছের নেতা কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক গোলাম কুদ্দুস ভাই এসেছেন ঢাকা থেকে। মহানগরী জামায়াতের সেক্রেটারি আহাদ ভাই, শিবির সেক্রেটারি মন্টু ভাই, সাংবাদিক বেলাল ভাই, সিরাজ ভাই, মিজান ভাই সহ আমরা কয়েকজন পরামর্শ করলাম বিভিন্ন করণীয় বিষয়ে। মারাত্মক আহত শেখ রহমত আলীকে ঢাকায় পাঠাবার ব্যবস্থা হল সকালেই। বৃহত্তর খুলনা ও যশোরের দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার ছাত্র জনতার ঢল নামলো শহীদের বাড়িতে। বাড়ির সামনে সিঁড়ির পার্শ্বে রাখা আছে শহীদের লাশ। তাঁর সারা দেহে হায়েনাদের নির্মমতার করুণ চিহ্ন। সুঠামদেহী তরুণ শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিমের চেহারায় আল্লাহর নূর যেন চমকে উঠছে। মুখে পরিতৃপ্তির হাসি যেন মিশে আছে। সে দৃশ্য চোখ ভরে দেখে দেখে কাঁদছে শহীদের হাজারো সাথী।

শহীদের পিতা আমাকে বললেন, "কবর কোথায় হবে আপনি জায়গাটা দেখিয়ে দিন।" আমি কয়েকজন ভাইকে নিয়ে রাস্তার পাশে কবরের জায়গাটা চিহ্নিত করলাম। বললাম, "শহীদের কবর এ রাস্তার পাশেই হোক। যুগে যুগে শহীদের অসংখ্য সাথীরা আসবে। রাস্তার পাশে হলে সহজেই কবর দেখতে পাবে। আর শাহাদাতের স্মৃতি লালন করবে।" সেখানেই কবরের জায়গা চূড়ান্ত হল।

এদিকে শহীদের গোসল সু-সম্পন্ন হল জেলা আমীর মাওলানা এ.কে.এম. গউসুল আযম হাদীর দায়িত্বে। জানাজার বিশাল জামায়াত অনুষ্ঠিত হল শহীদের শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত দামোদর উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে। শহীদের বাড়ির সন্নিকটেই এ বিশাল ময়দান। কর্দমাক্ত মাঠে হাজার হাজার শোকাহত মানুষের জামায়াতে ইমাম হলেন এতদঞ্চলের ইসলামী আন্দোলনের প্রবীণ ও ত্যাগী ব্যক্তিত্ব জনাব মাষ্টার আব্দুর রাজ্জাক। শোকার্ত মানুষের উদ্দেশ্যে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখলেন।

www.icsbook.info

বি.এল. কলেজের অধ্যক্ষ কাজী রফিকুল হকসহ শহীদের সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলীও এলেন জানাজায়। শেষ দেখা সেরে শহীদের লাশ রাখা হল কবরের শীতল মাটিতে। কান্নার গোংগানি যেন ঝড়ের বেগে বেড়ে উঠল। দাফন শেষে আল্লাহর দরবারে শহীদের জন্য, তার সাথীদের জন্য কান্নাজড়িত কাতর কণ্ঠে মুনাজাত করলেন বি.এল. কলেজের শিবিরের প্রথম সভাপতি ও উত্তর জিলা জামায়াতের তৎকালীন আমীর হাদী ভাই।

পড়ন্ত বেলায় সূর্যের লাল আভা পড়েছে গাছের পাতায় পাতায়। হৃদয়ের শোকার্ত কোনেও জমেছে রক্তিম আভা। এখন শহীদকে রেখে সকলের বিদায়ের পালা। কিন্তু শহীদ পরিবারের বুকফাটা কান্নায় কদম যেন থমকে যায় সকলের।

এ নির্মমতা এ বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা-সমাবেশ, মিছিল নিষিদ্ধ হল ক্ষমতাসীনদলের ষড়যন্ত্রে পুলিশের হুকুমে। শহরে শিবিরের জন্য যেন মহাবিপদ। দৌলতপুর ও খালিশপুরে বিডিআর নামানো হল।

হালিম ভাইয়ের শাহাদাতের ১২দিন পর ২রা অক্টোবর মারাত্মক আহত শেখ রহমত আলী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। এ খবর খুলনায় ছড়িয়ে পড়তেই নগরবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পুলিশের ব্যারিকেড তুলে, মিছিলে মিছিলে খুলনা উত্তাল। শোকে অনেকে মুহ্যমান। পুলিশ কর্মকর্তারা ক্ষমতাসীনদলের মর্জিতে নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব ও হয়রানি শুরু করল। শিবির শহরের যেখানেই সভা ডাকে সেখানেই সভাস্থলে ছাত্রদলের সভা, ১৪৪ ধারা।

সরকারের এহেন জুলুমে বিক্ষুব্ধ হল নগরবাসী। ঘৃণা ধিক্কার দিয়েছে খুনিদের। পুলিশ খুনিদের কাউকে গ্রেফতার করল না সুনির্দিষ্ট মামলা থাকা সত্ত্বেও। প্রতিবাদী মানুষের বিবেক জাগ্রত হল প্রশাসনের বিরুদ্ধে। শহীদ আব্দুল হালিমের রক্ত খুলনার মানুষকে আলোড়িত করেছে। বেদনায় কাতর না করে বিক্ষোভ ও প্রতিশোধের আগুন এক নতুন শক্তিতে পরিণত করেছে শহীদের সাথীদের।

মুন্সী আব্দুল হালীম ভাইয়ের সাথে আমার শেষ কথা হয় শাহাদাতের ৬ দিন পূর্বে ১৩ই সেপ্টেম্বর রাতে খুলনা জামায়াত অফিসে। আমি এবং শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান মংলার সাংগঠনিক প্রোগ্রাম সেরে কেবল খুলনা জামায়াত অফিসে এসেছি। কিছু পরেই খুব ব্যস্ত পেরেশান হয়ে হালিম ভাই আর কয়েকজন এলেন অফিসে। সালাম, মুসাফাহা, হারুন ভাইয়ের সাথে পরিচয়, কলেজের খবর ইত্যাদি। হালিম ভাই টেলিফোনে কলেজের খবর নিচ্ছিলেন- কলেজে নাকি বোমাবাজি হচ্ছে। অল্প সময়ে আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে হালিম ভাই হলে ফিরে গেলেন।

বি.এল. কলেজের খুব কাছে শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশন অফিস। তাই হালিম ভাইসহ নেতারা প্রায়ই অফিসে আসতেন। খবর জানাতেন সহযোগিতা চাইতেন। যেন এক দেহ এক মনে একাকিত্ব বোধ হত। এ যেন শিবিরের অফিস। ছোট খাট সংঘর্ষে আহতরা ছুটে আসে। বিশ্রাম নেয় এখানে।

www.icsbook.info

হালিম ভাইদের গ্রাম আর আমার গ্রাম একেবারে পাশাপাশি। তাতে দ্বীনি সম্পর্ক যেন গভীরতর অনুভব করতাম আমি। অল্প বয়সে এত দ্রুত সাংগঠনিক প্রজ্ঞা অর্জন, নির্ভীক ও গণমুখী নেতৃত্বের অনুপম গুণাবলীতে সে সমৃদ্ধ হয়েছিল যে, আমরা তাকে বিপুল সম্ভাবনাময় মনে করতাম। নীরবে, একাকী হালিম ভাইকে নিয়ে আমার গর্ব হত। হৃদয়ে হালিমের ভাবনা আমাকে আবেগময় করে তুলত। বেশি প্রাণবন্ত ও আশান্বিত হয়ে উঠতাম তখন, যখন দেখতাম হালিমের বহুমুখী প্রতিভার বিচ্ছুরণ। নেতৃত্বের দারুণ যাদুকরী-মোহনীয় ক্ষমতা। হালিম ছিল আমাদের প্রায় দু'যুগের লালিত স্বপ্নের গোলাপ। পরম আকাঙ্খার ধন। দেখা হলেই শহীদের মুখের প্রাণোচ্ছল হাসি- ওর জীবনের সার্বক্ষণিক চঞ্চলতা আমাকে শীতল করে দিত। হালিম ভাইয়ের মুখের কুরআন তিলাওয়াত আমাকে মোহিত করত।

হালিম ভাই ছিল অসম সাহসী তরুণ। বাতিলের হৃদকম্প। সব ঝুঁকি, মোকাবেলায় হালিম সামনের সারিতে। নির্ভীকতা ও বলিষ্ঠতা তার সাথী। দায়ী ইলাল্লাহ'র ভূমিকায় সাধারণ ছাত্রদের কাছে প্রিয় হালিম ভাই। শাহাদাতের দিন শুরু থেকে হুঁশ থাকা পর্যন্ত লড়েছে সে নির্ভীক ভাবে। প্রত্যক্ষদর্শীর সূত্রে এক সাংবাদিক বন্ধু আমাকে বলেছিলেন- "পরওয়ার ভাই, হালিম ভাইকে যখন খুনীরা গলায় ছুরি চালাচ্ছিল বুক এবং মাথা চেপে ধরে, তখন সে মোটেই ছটফট করেনি- বাঁচার চেষ্টা করেনি। বরং স্থির শান্ত হয়ে সে নিথর দেহে আল্লাহর দিকে চেয়েছিল।"

তাই শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম আমাদের মধ্যে জাগিয়েছে আল্লাহর রাহে জীবন দেবার অদম্য প্রেরণা। বক্তব্যে, চিন্তায়, কাজের ফাঁকে শহীদ হালিম এক দারুণ অভিব্যক্তি আজ। তার কথা মনে পড়লে সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে আসে। তাই তো বুঝি শহীদেরা এভাবেই বেঁচে থাকেন মানুষের মাঝে।

যখন যাই শহীদের কবরের পাশে। শহীদের পিতা-মাতা, ভাই-বোনের কাছে। তখন বেদনা চাপা দিয়ে এক রাশ সাহসে বুক বাঁধি শহীদের আমরণ স্বপ্ন বাস্তবায়নের দৃঢ় অঙ্গীকারে সজীব হয়ে উঠি। আবার ঘরে ফিরে যখন আমার কন্যা লামিয়ার কচি কণ্ঠে এ গান শুনতাম-তখন জীবনের এক নতুন স্বাদ পাই। "মন যে আমার টিকে নারে এই দেশেতে হায়রে- শহীদ হালিম নাও গো ডেকে সুখের জান্নাতেরে- বেহেশত পাবে তাই। হালিম ভাইয়ের রক্তে ভেজা ২০শে সেপ্টেম্বরে- ডেকে গেল শত মানুষ- শহীদি কাফেলায় রে- শহীদি কাফেলায়।"

ঠিক তেমনিই খুলনার ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে আরেকটি বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শহীদ আবুল কাশেম পাঠান। হালিম ভাইয়ের শাহাদাতের এক বছর তিন মাস তিন দিন পর শহীদ আবুল কাশেম পাঠানও হালিম ভাইয়ের মত আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। ১৯৯৪ইং সালের ২৩শে অক্টোবর শহীদ আবুল কাশেম পাঠান খুলনার সিটি কলেজ গেটে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের ষড়যন্ত্রের বলী হয়ে গুলিবিদ্ধ হলে ঘটনাস্থলে শাহাদাতবরণ করেন।

www.icsbook.info

সেদিনের স্মৃতি

বাগানে অনেক ফুল ফোটে কিন্তু সব ফুল সুঘ্রাণ ছড়ায় না। আকাশের তারকারাজির আছে স্নিগ্ধ আলো-কিন্তু সব তারকার জ্যোতি সমান নয়। সাগরের অথৈ পানি নদীতে জোয়ার আনে-কিন্তু সব নদীর জোয়ার বাঁধভাঙ্গা হয় না। সব মায়ের সন্তান তাই কাশেম হয় না। কাশেম পাঠান এ যুগের ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব। সব ঘটনা ঘটনা হয়, সব মানুষই মানুষ কিন্তু ইতিহাস হয়না। খান জাহানের দেশে কাশেম এক ইতিহাস।

২২শে অক্টোবর'৯৪ দুপুরে বি.এল. কলেজে হাল্কা টেনশনের খবর শুনলাম। আর ঐ দিনই সন্ধ্যায় আমরা কয়েক জন প্রাক্তন এবং শিবিরের দায়িত্বশীল ভাইয়েরা শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশন অফিসে পরামর্শ বৈঠকে বসলাম। আগামীকাল ২৩ অক্টোবর সিটি কলেজে ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের স্বাগত জানাবে শিবির। তাই বি.এল. কলেজের ঘটনার জের হিসাবে "ছাত্রদল সিটি কলেজে আক্রমণ চালাতে পারে" এ তথ্য পেয়ে ধৈর্যের সাথে সেখানে কাজ করার পরামর্শ হল। ২৩শে অক্টোবর ফজর বাদ আমি বি.এল. কলেজের দিকে গেলাম। পরামর্শ মোতাবেক পরিকল্পনার খোঁজ খবর নিতে। জানলাম যথারীতি পরামর্শ মোতাবেকই কাজ হবে।

সকাল ১১টার দিকে পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম থাকায় সাতক্ষীরা রওনা হলাম। দু'ঘন্টার পথ কোস্টারে মানসিক দুশ্চিন্তায় অস্থির। গাড়ি থেকে সাতক্ষীরা নেমে যোহরের নামাজ পড়লাম। মনটা কেন যেন অস্থির বোধ করছিল সিটি কলেজের খবরটা জানার জন্য। এস.কে.এফ. এর সাতক্ষীরা সভাপতি হুদা ভাইকে বললাম, 'খুলনায় টেলিফোন করার জন্য।' নিকটস্থ একটা টেলিফোন সেটের কাছে গেলাম। কিন্তু চাবি পেলাম না। মনটা আরও খারাপ হল। বিকেলে সুন্দরবন টেক্সটাইল মিল গেটে শ্রমিক জনসভা। সভাস্থলে পৌঁছাতেই পেছন থেকে ছুটে এসে ডাক দিলেন জেলা শিবির সভাপতি আজিজুল ভাই, বললেন খুলনা থেকে টেলিফোনে খবর দিয়েছে, সিটি কলেজে মারাত্মক সংঘর্ষ হয়েছে, কাশেম পাঠান ভাই গুলিতে শহীদ হয়েছেন। আপনাকে এখনই খুলনায় যেতে বলেছে। মুহূর্তেই আমি নির্বাক। খুব ভারী হয়ে গেল দেহ। আমি যেন পাথর। মাথায় একটা চক্কর দিল। কাশেম পাঠানের হাসিমুখ ছবির মত চোখে ভেসে উঠল। কি ভয়ংকর রূপ এ মুহূর্তে খুলনার? কি করছে খুলনার ভাইয়েরা? শহীদ কাশেমের লাশ কোথায়? আর কে কে আহত? এতসব প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে খেতে ভারাক্রান্ত আমি। আজিজুল ভাইকে আর কিছু জিজ্ঞাসার ভাষা আমি হারিয়ে ফেলেছি।

সঙ্গী-সাথীরা আমাকে ধরে জনসভার স্টেজে উঠালেন। উপস্থিত জনতার সামনে কিছু বলেই খুলনায় রওনা হবার সিদ্ধান্ত। পাঁজর ভাঙ্গা বুক নিয়ে অশ্রুসিক্ত অবস্থায় জনতাকে কাশেম ভাইয়ের শাহাদাতের খবর দিলাম। হু-হু করে কেঁদে উঠল শ্রমিক-জনতা। কি বলেছিলাম ভাল করে মনে নেই। তবে এটুকু খুব ভালই মনে আছে যে,

www.icsbook.info

জনসভায় অগ্নিস্ফুলিংগের মত বিমান আমান হালিম রহমত আর কাশেম পাঠানের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলাম।

সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা শেষ করতেই ভাইয়েরা আমাকে গাড়িতে তুলে দিলেন। গাড়ির মধ্যেই মাগরিবের নামাজ। সারাপথ শুধু দেহটাই আমার গাড়িতে ছিল। কিন্তু মনটা আমার কাশেম পাঠানের রক্তলাল খুলনার অলিতে গলিতে-রাজপথে। গাড়ি চলছে- আর কল্পনার রাজ্যে আমি শহীদের লাশের মিছিলে। প্রতিবাদী আমি, বিক্ষুব্ধ আমি, যেন খানজাহানের খুলনার পথে পথে। চুকনগর থেকে ডুমুরিয়ার জামায়াত কর্মী আবুল ভাইকে আমার গাড়িতে উঠতে দেখেই পিপাসার্ত কাকের মত সব কিছু জিজ্ঞাসা করলাম। জানলাম সিদ্ধান্ত হয়েছে আজ রাতেই সব জনশক্তিকে খুলনায় পৌঁছাতে হবে। সে সব খবরই উনি দিয়ে এলেন এলাকায়।

খুলনাভিমুখী দ্রুতগামী গাড়ি। যাত্রীদের মুখে মুখে খুলনার ভয়ংকর পরিস্থিতির নানান বর্ণনা। শুনতে শুনতে অবশেষে ময়লাপোতায় নামলাম। উল্কার মত তারের পুকুর জামায়াত অফিসে ছুটলাম। দেখি শহীদের অসংখ্য সাথীদের ম্লানমুখ! তাদের গোংগানীর আওয়াজে আমি মুহ্যমান। তবুও ভিড় ঠেলে যখন ঢুকলাম জামায়াত অফিসে তখন রাত আটটারও বেশি। তারপর পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক পর্যালোচনা। করণীয় স্থির, ভোরে সদর হাসপাতালের মর্গ থেকে শহীদের লাশ আনা। শহীদের লাশ নিয়ে স্মরণাতীতকালের শোক মিছিল। ৩ বার জানাজা, বসুপাড়া কবরস্থানে শহীদের লাশ দাফন। হরতালের কর্মসূচি বাস্তবায়ন। এমনিভাবে সব কর্মসূচি চলল একের পর এক। শোকের ছায়ায় ঢাকা খুলনা যেন বিদ্রোহে গুমরে থাকা মুখ-মলিন, বিস্ফরণোন্মুখ।

এ হত্যা গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ

এ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড সুপরিকল্পিত। গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ। খুলনায় ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রায় ভীতু ইসলাম বিরোধী খুনীচক্র প্রায় এক যুগ ধরে এ অপচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। দেশের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ ও দক্ষিণবঙ্গের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত সরকারি বি.এল. কলেজ। ১৯৭৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এখানে শিবিরের সাংগঠনিক শক্তি, জনপ্রিয়তা, কর্মী বাহিনীর দৃঢ়তা এবং বারবার ছাত্র সংসদে শিবিরের বিজয় ও প্রাধান্য দেখে ওরা ঈর্ষান্বিত-ক্রুদ্ধ। আদর্শ, যুক্তি ও নৈতিকতার কাছে পরাজিত হয়ে ওরা এ সন্ত্রাস ও হত্যার পথ বেছে নেয়। ক্ষমতাসীন দলের মদদে ঘাদানিক চক্র নির্মমভাবে হত্যা করে বিএল কলেজের ছাত্র নেতা শিবির নেতা আমিনুল ইসলাম বিমানকে। একে একে বিএল কলেজের নির্বাচিত জি.এস. মুন্সী আব্দুল হালিম, সাহিত্য সম্পাদক শেখ রহমত আলী ও খুলনা আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্র ইয়াতিম আমানের নির্মম ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়-প্রকাশ্য দিবালোকে। যা হালাকু- চেঙ্গীসের নৃশংসতাকেও হার মানায়।

www.icsbook.info

কাশেম পাঠানকে কেন হত্যা করা হল?

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিমের সুযোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন শহীদ আবুল কাশেম পাঠান। কলেজ শাখার সভাপতি এবং ভারপ্রাপ্ত জি.এস.এ দুটোই হালিমের রেখে যাওয়া দায়িত্ব। কাশেম পাঠানের ছিল এক অভাবনীয় প্রতিভা ও নেতৃত্বের চৌকস গুণাবলী। নগরীর ঐতিহ্যবাহী ও প্রভাবশালী পাঠান বংশের ছেলে আবুল কাশেম পাঠান ছিল এ যুগের অসম সাহসী সন্তান। স্কুল জীবন থেকেই আল্লাহর সৈনিক হিসাবে তিনি ইসলামী আন্দোলনে যোগ দেন। অত্যন্ত অল্প সময়ে সংগঠনে তার যোগ্যতা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তার মোহনীয় ব্যক্তিত্ব ও বহুমুখী প্রতিভা দ্রুত খুলনার সব মহলে তাকে ব্যাপক প্রভাবসম্পন্ন এক সৎ ও আদর্শ তরুণ হিসাবে পরিচিত করে তোলে। আকর্ষণীয় দেহ ও চেহারা, মধুর ব্যবহার, গরিব দুঃখীদের সাহায্য করার দরদি মন, সংগঠক, বক্তৃতার যোগ্যতা, সাহসিকতা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে, সাংবাদিকতা, সমাজ সেবা এসব কিছু তাকে এক চৌকস সম্ভাবনাময় নেতৃত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিল। ছাত্রদের মাঝে

> সঙ্গী-সাথীরা আমাকে ধরে জনসভার স্টেজে উঠালেন। উপস্থিত জনতার সামনে কিছু বলেই খুলনায় রওনা হবার সিদ্ধান্ত। পাঁজর ভাঙ্গা বুক নিয়ে অশ্রুসিক্ত অবস্থায় জনতাকে কাশেম ভাইয়ের শাহাদাতের খবর দিলাম। হু-হু করে কেঁদে উঠল শ্রমিক-জনতা। কি বলেছিলাম ভাল করে মনে নেই। তবে এটুকু খুব ভালই মনে আছে যে, জনসভায় অগ্নিস্ফুলিংগের মত বিমান আমান হালিম রহমত আর কাশেম পাঠানের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলাম।

ছিল তার যাদুকরী নেতৃত্বের শক্তি এবং শিক্ষকদের তিনি ছিলেন অতি স্নেহভাজন। প্রশাসন, সাংবাদিক, পুলিশ, লেখক, কবি-সাহিত্যিক, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, আলেম, রিক্সাওয়ালা, দিন-মজুর, অমুসলিম, এমনকি প্রতিবেশীদেরকেও যেন সে মোহাবিষ্ট করে ফেলেছিল চরিত্রের আর আদর্শের মাধুর্য দিয়ে।

ক্লাব-পাঠাগার-সমিতি তৈরি করে যুবকদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত প্রসার, রিক্সাওয়ালা-দিনমজুরদের সংগঠিত করে ইসলামী আন্দোলনের সাথী বানানো, সমাজের উঁচু ও বিত্তশালী মহলে দ্বীনের দা'য়ী হিসাবে কাজ করা তার চরিত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল। হালিম রহমতের শাহাদাতের পর বি.এল. কলেজে শিবিরের কাফেলাকে কাশেম পাঠান আরও মজবুত ও সংহত করেছিলেন। জনশক্তির মানোন্নয়ন ও সাধারণ ছাত্রদেরকে ইসলামী আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে তিনি দ্রুত সাফল্য অর্জন করেন। তাই ক্ষমতাসীনদলের সশস্ত্র ছাত্রসংগঠন কাশেম পাঠানের এ অসম নেতৃত্ব, যোগ্যতা

www.icsbook.info

ও সংগঠনের এ অপ্রতিরোধ্য গতি দেখে কেঁপে যায়। সুতরাং খুনের মহাপরিকল্পনা মোতাবেক কাশেম পাঠানকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। ২৩শে অক্টোবর দুপুরে সিটি কলেজের চত্বরে তাকে গুলি করে হত্যা করে রক্তপিপাসু ছাত্রনামধারী জল্লাদরা।

হত্যা করে সত্যের সংগ্রাম ঠেকানো যায় না

কিন্তু একথা সর্বজনবিদিত সত্য যে, মানুষ খুন করে তার আদর্শ খুন করা যায় না বরং শহীদের রক্তলাল উর্বর মাটিতে শহীদের সাথীরা আরও সজীব-প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, হয় বেগবান আত্মনিবেদিত ও অপ্রতিরোধ্য। তাইতো আমরা দেখি ওহুদের ময়দানে হযরত হামজা (রা.) এর কলিজা কেটে চিবিয়ে খেয়ে, মুতা'র ময়দানে হযরত জাফর (রা.)-এর মস্তক ছিন্ন করে, কারবালার প্রথম ইমাম হোসাইন (রা.)এর মাথা দেহ থেকে বিছিন্ন করেও ইসলামী আন্দোলনের দুর্বার অগ্রযাত্রাকে এক নিমেষের জন্যও থমকে দেয়া যায়নি বরং তা শহীদের রক্তের বরকতে দিকপ্লাবী গতি লাভ করেছে। আন্দোলনের বিপ্লবীদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে মৃত্যুভয়হীন চেতনা।

সরকারি দলের জংলী রাজনীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত খুনীদের জন্য তাই কাশেম হালিমের রক্ত এখন ওদের মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে। জাতির ঘৃণা, ছাত্রসমাজের ক্ষোভে ও ধিক্কারে ছাত্রনামধারীরা আজ গণবিচ্ছিন্ন, পরিত্যক্ত ও প্রত্যাখ্যাত। ইতিহাসের চিরন্তন নিয়মেই শহীদের রক্ত আগুনের লেলিহান শিখা হয়ে খুনিদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

সত্যের সৈনিক হযরত খানজাহানের পুণ্যভূমি এ মাটি ইসলামের লড়াকুদের দুর্জয় ঘাঁটি। এক কাশেমকে হারিয়ে আমরা লাখো কাশেমের প্রত্যয়দীপ্ত মুখ দেখেছি মিছিলে মিছিলে। রক্তলাল এ মাটি বিপ্লবের ফসলের জন্য এখন অনেক উর্বর।

কাশেম পাঠানের সাথে আমার শেষ কথা হয় শাহাদাতের দুইদিন আগে। ২০শে অক্টোবর বিকেলে নেছারিয়া মাদ্রাসায় ভর্তিচ্ছুদের কোচিং সমাপনী অনুষ্ঠানে। ঐ দিন আলমনগরে আমার জনসভা থাকা সত্ত্বেও কাশেম পাঠানের জোর দাবি, আমাকে কোচিং সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকতেই হবে। তাই গিয়েছিলাম। তখন বুঝতে পারিনি- 'কাশেম পাঠানের ঐ দাবি ছিল আমার কাছে তার শেষ দাবি।' আজও মনে পড়ে সেদিন তাকে অনেক বেশি ধীর-স্থির ও শান্ত মনে হচ্ছিল। ওকে সেদিন স্বভাবসুলভ চঞ্চল বা ক্ষিপ্র দেখিনি। ওর কথাগুলো সেদিন বেশি মার্জিত ও সুন্দর লাগছিল। কি জানি, আল্লাহর কাছে যাবার চিন্তায় ওর মানসিক প্রস্তুতি চলছিল বোধ হয়। আমার কাছে কাশেম পাঠানের এ শেষ দাবি পূরণ করতে যদি আল্লাহ আমাকে তওফিক না দিতেন, তাহলে জীবন ভর অপূর্ণতার আফসোস ও আহত হৃদয়েই কাটাতে হত আমাকে। বি.এল. কলেজের কাছে শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশন অফিস। তাই হালিম রহমতের মত কাশেম পাঠানও আসতো প্রায়ই। খবর জানতে-পরামর্শ চাইতে। সভা, বৈঠকাদি, মিছিল, কোচিং সব উপলক্ষে তার পদভারে

www.icsbook.info

মুখরিত থাকতো আমাদের অফিস। সে বছর কোচিং এর জন্য ভাল জায়গা না পেয়ে আমাদের অফিসে করার অনুমতি চাইল। অনুমতি দিলাম। রসিকতা করে বলেছিল, 'পরওয়ার ভাই কোচিং এর সুযোগের বিনিময়ে ভাল কিছু চেয়ার কিনে দেব আপনার অফিসে।' এখন ভাবি, কাশেম! চেয়ার নয়, তুমি আল্লাহর রাহে তোমার জীবন দিয়ে শাহাদাতের অমূল্য প্রেরণা আমাদের দিয়েছ। যা কোন দিন ভাংবে না, থাকবে চিরন্তন। মৃত্যুর ভয়হীন চেতনা তুমি দিয়েছ।

কাশেম পাঠানকে নিয়ে আমাদের গর্ব হত। হৃদয়ে কাশেম পাঠানের ভাবনা আমাকে আবেগময় করে তুলত। বেশি প্রাণবন্ত ও আশান্বিত হয়ে উঠতাম তখন, যখন দেখতাম 'কাশেমের বহুমুখী প্রতিভার বিচ্ছুরণ। দেখতাম নেতৃত্বের দারুণ যাদুকরী মোহনীয় ক্ষমতা। কাশেম পাঠান ছিল আমাদের দু'যুগের লালিত স্বপ্নের গোলাপ। পরম আকাঙ্খার ধন। দেখা হলেই শহীদের প্রাণোচ্ছল হাসি, জীবনের চঞ্চলতা আমাকে শীতল করে দিত।

শহীদ কাশেম এক অদম্য সাহস এক ইতিহাস। যখন দেখি শহীদ হালিম, কাশেম, রহমত, বিমানকে হারিয়ে তার আহত সাথী আব্দুর রহিম, মিলন, মুরাদ, মাহ্‌ফুজ, সাখাওয়াত, হাফিজকে অসংখ্য গুলি ও আঘাতের ক্ষত নিয়ে মিছিলের সারিতে, বলিষ্ঠ চিত্তে মুষ্টিবদ্ধ বাহু উঠিয়ে ওদের কণ্ঠ তাকবির ধ্বনিতে উচ্চকিত, তখন আমার এ প্রত্যয় আরও দৃঢ় হয়-শহীদরা মরে না, এ স্মৃতি বেদনার নয়-সাহসের, এ ইতিহাস দুঃখের নয়-গৌরবের।

শহীদ বিমান, আমান, হালিম, রহমত, কাশেম পাঠান আমাদের স্পর্ধিত শক্তির অফুরন্ত আধার।

"হে আল্লাহ! সব শহীদদের তুমি জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান কর। আমাদের রক্তে সঞ্চিত কর অদম্য সাহস-দাও আকুল পিপাসা শাহাদাতের"-এই আমদের মুনাজাত।

লেখক : সাবেক এমপি ও সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

www.icsbook.info

আমার চেনা শহীদ আবুল কাশেম পাঠান

আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ

এক

১৯৮৫-৮৬ সালের কথা। আমি তখন শিশু কল্যাণের দায়িত্বে। ৮৬ সালে আমরা সারা দেশে পাঁচটি আঞ্চলিক ট্রেনিং ক্যাম্প করার পরিকল্পনা করি। খুলনার ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হচ্ছিল মডেল স্কুলে। পার্শ্বেই সার্কিট হাউস ময়দান থাকায় মডেল স্কুলটি ক্যাম্পের জন্য বেশ ভালই হল।

এর আগেও আমাকে খুলনা যেতে হয়েছে। তখন যাওয়া আর আসা। মাঝখানে দু'একটা বক্তব্য রাখা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকতো কর্মসূচি। এবারে এক নাগাড়ে তিন দিন ক্যাম্প। সারাদিন আলোচনা, মাঠের কাজ, রাতের বেলা 'তাঁবু জলসা'। খুব জমতো এসব। ক্যাম্প উপলক্ষে একটা বড় সুযোগ এসে গেল খুলনার সদস্য ও সাথীদের চেনার এবং জানার।

একদিন দুপুর বেলা গেলাম রান্না ঘরের দিকে। সদস্য সিরাজ ভাইয়ের হাসিখুশি নেতৃত্বে একদল সাথী এখানে কাজ করছেন। সেখানে অনেকের সাথেই পরিচয় হয়েছিল। সবার কথা এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। তবে পরিষ্কার মনে পড়ছে একজন

www.icsbook.info

সুঠামদেহী প্রাণবন্ত তরুণের নাম। ওয়াছিয়ার রহমান মন্টু ভাই পরিচয় করিয়ে দিলেন- উনার নাম আবুল কাশেম পাঠান। শিবিরের সাথী। খুলনা শহরেই বাড়ি, বসুপাড়ায় বাসা। আমার কাছেও তাকে বেশ পাঠান পাঠানই মনে হলো।

ঐ তিনদিন দেখলাম কাশেম পাঠান সৈয়দ মুজতবা আলীর আব্দুর রহমানের মতো 'হরফুন মাওলা' ধরনের লোক। সব কাজই পারেন, সব কাজই করেন। ক্যাম্পের সদস্যরা তাঁর খুব ভক্ত হয়ে গেলো। মুখে সব সময় হাসি লেগে আছে। বিরক্তি নেই। যেখানেই সমস্যা সেখানেই হাত বাড়িয়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছেন তিনি।

শেষের দিন খুলনা মহানগরীর উপদেষ্টা কে.এম. আলম ভাই আসার সময় সবার জন্য দই নিয়ে এলেন। কাশেম ভাই দৌড়ে গিয়ে গাড়ি থেকে দইগুলো নিয়ে এলেন। আলম ভাই কথায় কথায় বললেন 'কাশেম পাঠান' বড় ভাল ছেলে, ওকে শিশু কল্যাণে নিয়ে এলে ভাল হতো।"

মন্টু ভাই খুলনায় আর আমি ঢাকায় বসে বহু চেষ্টা করছি। শিশু কল্যাণের সব কাজেই কাশেম ভাইকে পাওয়া যেত কিন্তু জনশক্তি হিসেবে কখনই উনি আসেননি। নেতারা তাকে ছাড়েননি। তার জন্য তো আল্লাহ আরও বড় কাজ, বড় দায়িত্ব বাকি রেখেছেন। বড় কাজের জন্যই তিনি।

আমাকে যখন বলা হলো আবুল কাশেম পাঠান ভাইয়ের স্মরণিকার জন্য একটা লেখা দিতে হবে, তখন আমি ভাবছিলাম কি লিখবো! প্রথমেই আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠলো প্রথম পরিচয়ের এই স্মৃতি, স্মৃতি ভরা সেই ক্যাম্প এবং একজন দীর্ঘদেহী, সবল সুঠাম, প্রাণবন্ত অক্লান্ত মুজাহিদের নাম।

আবুল কাশেম পাঠান ওদেরই একজন হয়ে গেলেন যাকে আল্লাহই বাছাই করে নিয়েছেন, যাদের ব্যাপারে কুরআন বলছে- 'আর এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানের দাবিতে উত্তীর্ণ আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে কবুল করতে চান।

দুই

১৯৮৬ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত দীর্ঘ ৮ বছরে বহুবার বহুভাবে আবুল কাশেম পাঠান-এর সাথে দেখা হয়েছে। কখনো খুলনা সফরে গিয়েছি অথচ কাশেম ভাইয়ের সাথে দেখা হয়নি এমন ঘটনা বিরল। আবার কোন কাজে ঢাকায় এলেই কাশেম পাঠান হয় কেন্দ্রীয় অফিসে কিংবা কলাবাগানের বাসায় এসে দেখা করেছে। তার সাথে আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎ সম্ভবত WAMY অফিসে। আরো দু'জন ভাইকে নিয়ে এসেছিলেন 'শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম স্মৃতি পাঠাগার'-এর জন্য বই এবং একটি স্মরণিকার জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে।

তখন যদি জানতাম আবুল কাশেম পাঠানের শাহাদাৎ বার্ষিকীর জন্যও এক বছর পরই লেখা দিতে হবে তাহলে নয়ন ভরে বারবার তাকে দেখে নিতাম। 'কাশেম তোমাকে বারবার দেখার আজ বড় সাধ জাগে।'

১৯৯০ সালে খুলনা বি.এল. কলেজ নির্বাচনকে সামনে রেখে বেশ কয়েক দফা আমাদের উপর অন্যান্য দল মিলে সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। কেন্দ্রীয় সভাপতি মুকুল

www.icsbook.info

ভাই খুলনা যেতে বললেন। বি.এল. কলেজের নিকটবর্তী একটি বাসায় আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রায় প্রতিদিন মিছিল মিটিং চলছে। ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়া চলছে। এর মধ্যে হয়ে যাচ্ছে নিয়মিত প্রোগ্রাম। 'কামরুল, জাকির, মোস্তফা' পরিষদ শিবিরের। ছাত্র-ছাত্রীদের সমর্থন আমাদের দিকে দেখে ওরা একদিন সশস্ত্র হামলা করলো। আমাদের সাথী ধীরা গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। আমাদের ভাইয়েরা এরপরও ওদেরকে হটিয়ে দিয়ে এসেছে।

কামরুল ভাইয়ের গায়ে রক্ত লেগে গেছে। উনার শার্ট দরকার। আমি আমার একটা শার্ট দিলাম। কাশেম পাঠান বলে ফেললো- 'রক্ত মেখে এলেতো আমিও একটা পেতাম'। সেদিন দেখলাম কাশেম ভাই খুব উত্তেজিত। 'দায়িত্বশীলরা বারবার ফিরিয়ে আনে, কিছুই করতে দেয় না।' আর কামরুল ভাই বলছেন- 'সময় আসবে কাশেম, এসবের বদলা নেয়া হবে।' তবে অন্যভাবে।

আমি শিবির থেকে বিদায় নিয়েছি ১৯৯২-র ডিসেম্বরে। ১৯৯৩ সালে কাশেম পাঠানরা স্ব-দলবলে ঢাকায় হাজির। ভি.পি. জাকির, জি.এস. মুন্সী আব্দুল হালিম, এ.জি.এস. কাশেম পাঠান সবাই এসেছে। প্রেসিডেন্টের সাথে তাদের সাক্ষাৎকার। কাশেম পাঠান সেবারও আমার অফিসে এসেছে। তখন তার কত পরিবর্তন। কাশেম পাঠান সদস্য হয়েছে, ছাত্রদের নির্বাচিত নেতা হয়েছে। সর্বোপরি তার দায়িত্বশীলতা বেড়ে গেছে। কাশেম পাঠানরা সংসদে বিজয়ী হয়ে ওদের হামলার বদলা নিয়েছে। এখনতো বলতে দ্বিধা নেই খুলনা মহানগরীতে শিবির নেতা শেখ কামরুল আলমের পর সকলের কাছে একবাক্যে গ্রহণযোগ্য নেতা ছিল আবুল কাশেম পাঠান। আমাকে খুলনার অনেকেই এই কথা বলেছে। কাশেম যখন বি.এল. কলেজের এ.জি.এস. কিংবা মুন্সী

খবরটা শুনেই যেনো আমি বজ্রাহতের মতো স্থির হয়ে গেলাম। টেলিফোনের রিসিভারটা রেখেই সবাইকে ডেকে বললাম শাহাদাতের খবরটা শুনে সবারই মুখ পাণ্ডুর হয়ে এলো। কাশেমকে সবাই চিনে। আপনা থেকেই চোখে পানির ধারা বয়ে চলল। আমার মনে তখন কাশেম পাঠানের হাজারো স্মৃতি ভাসছে। এইতো আমার বি.এল. কলেজের নবীন বরণে গিয়েছি। বিশাল মিছিল আমাদের এগিয়ে নিতে এসেছে। একগুচ্ছ ফুল ছিটিয়ে সবার আগে আগে শ্লোগান মুখর কাশেম।

www.icsbook.info

আব্দুল হালিমের মর্মান্তিক শাহাদাতের পর যখন সে ভারপ্রাপ্ত জি.এস. তখন ছাত্র-ছাত্রীরা দলমত নির্বিশেষে তার কাছে যেত নিজেদের হাজারো সমস্যা নিয়ে। আর কাশেম হাসিমুখে ছুটে যেত কখনো প্রিন্সিপাল স্যারের কাছে। কখনো হিসাব বিভাগে, কখনো হোস্টেল সুপারের কাছে কিংবা অন্য কোথাও। এখন ওরা কার কাছে যায়? নিশ্চয়ই কাশেমের কোন এক উত্তরসূরি, মুন্সী আব্দুল হালিমের কোন এক ভাই ছাত্র-ছাত্রীদের ডাকে তেমনি ছুটে যায় যেমন করে তারা যেতেন।

তিন

২৩শে অক্টোবর ১৯৯৪। মাত্র তেত্রিশ দিন আগে খুলনায় চার শহীদের শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ছাত্র গণজমায়েত হয়ে গেছে। আমি WAMY অফিসে। একটা আন্তর্জাতিক সেমিনারের কাজে আমরা খুবই ব্যস্ত ছিলাম। তখন দুপুর ১টা। প্রথম সময় শিবিরের অফিস থেকে ফোন এলো খুলনাতে আবার শাহাদাতের ঘটনা ঘটেছে। বি.এল. কলেজের ভারপ্রাপ্ত জি.এস. শিবিরের বি.এল. কলেজ শাখা সভাপতি আবুল কাশেম পাঠানকে সিটি কলেজের ভেতর গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সিটি কলেজে নবীনদের উদ্দেশ্যে স্বাগত মিছিল ছিল। কাশেম পাঠান জানতে পেরেছেন ওখানে গণ্ডগোল হতে পারে। বি.এল. কলেজ থেকে উনি ছুটে গেলেন সিটি কলেজের উত্তপ্ত ময়দানে। শহরের ছেলে হিসেবে পাঠানের আস্থা ছিল উনি গেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কিন্তু না, ওরাতো এই সুযোগের সন্ধানেই ছিল। খুলনা মহানগরীর ইসলামী আন্দোলনকে নেতৃত্বের সঙ্কটে ফেলে দিয়ে নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে হলে যাদেরকে দুনিয়া থেকে বিদায় করতে হবে বলে ওরা মনে করে আবুল কাশেম পাঠান তাদেরই অন্যতম। সুতরাং সেভাবে ওরা গুলি করে হত্যা করলো নগরীর অবিসংবাদিত ছাত্রনেতা আবুল কাশেম পাঠানকে।

খবরটা শুনেই যেনো আমি বজ্রাহতের মতো স্থির হয়ে গেলাম। টেলিফোনের রিসিভারটা রেখেই সবাইকে ডেকে বললাম শাহাদাতের খবরটা শুনে সবারই মুখ পাণ্ডুর হয়ে এলো। কাশেমকে সবাই চিনে। আপনা থেকেই চোখে পানির ধারা বয়ে চলল।

আমার মনে তখন কাশেম পাঠানের হাজারো স্মৃতি ভাসছে। এইতো আমার বি.এল. কলেজের নবীন বরণে গিয়েছি। বিশাল মিছিল আমাদের এগিয়ে নিতে এসেছে। একগুচ্ছ ফুল ছিটিয়ে সবার আগে আগে শ্লোগান মুখর কাশেম। সবাই তাকে অনুসরণ করে চলছে। দুপুরে কলাবাগানের বাসায়। সারাদিন ঢাকা শহর ঘুরে এসে খেতে বসেছে কাশেম। আর বলছে 'বাব্বা! ঢাকায় ঘুরতি ঘুরতি শেষ অয়ে গেলাম।' আমাকে পেয়ে একটু খুলনার ভাষায় কথা বলে নিলো সে।

নেছারিয়া মাদ্রাসায়, মডেল স্কুলে, ফররুখ একাডেমীতে, কিংবা সোনাডাঙ্গায় কত জায়গায় যে ওকে টিসিতে দেখেছি। কোথাও ডেলিগেট, কোথাও স্বেচ্ছাসেবক।

www.icsbook.info

তবে মিস্ নেই। আর সবখানেই সে আলাদা, একটু অন্যরকম সবার চাইতে ব্যতিক্রম। সক্রিয় এবং প্রাণবন্ত। ঢাকায় বহু টিসিতে কাশেম ডেলিগেট ছিল। সেসব টিসির সদস্যরা নিশ্চয়ই কেউ তাকে ভুলতে পারেনি।

ঝাঁপসা চোখে আমার একটা জিজ্ঞাসা বারবার জেগে উঠছে। ওরা কেন হত্যা করলো কাশেম পাঠানকে? কি অপরাধ করেছিল সে? নাহ! কোন অপরাধ কাশেম করেনি। যেমন মুন্সী আব্দুল হালিমের কোন অপরাধ ছিল না, যেমন নিরপরাধ ছিল আমার ভাই রহমত আলী, বিধবা মায়ের এতিম সন্তান আমান উল্লাহ কিংবা যেমন বিনা কারণে জীবন দিয়েছে খুলনার শহীদদের নেতা আমিনুল ইসলাম বিমান তেমনি অকারণে, অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে কাশেম পাঠানকে। কাশেম পাঠানের দোষতো একটাই সে যে ইসলামের কথা বলতো। ঈমানের দাওয়াত দিতো। সে যে আব্দুল হালিমের যোগ্য উত্তরসূরি হয়ে গড়ে উঠেছিল। কুরআনের ভাষায়- 'ওদের কোন অপরাধই ছিলনা, অপরাধ ছিল একটাই-ওরা মহাপরাক্রমশালী স্বপ্রশংসিত আল্লাহর উপর ঈমান এনেছিল'।

চার

কাশেম পাঠানের মায়ের আর্তনাদ। তার ভাইয়ের ফরিয়াদ আর সংগঠনের কর্মীদের বুকফাটা কান্না ও হৃদয়ভরা ভালবাসা কিছুই ওকে ধরে রাখতে পারেনি। কাশেম পাঠান এক অনন্ত জীবনের সন্ধান পেয়ে দুনিয়ার এই সংক্ষিপ্ত জীবনের সমাপ্তি টেনে চলে গেছেন।

'যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না, বরং ওরা জীবিত। যদিও তোমরা তা বুঝ না।' (বাকারা- ১৫৪)

আমরা কি বুঝতে পারছি? কাশেম আমাদেরই আশপাশে আছে। মুন্সী আব্দুল হালিম প্রতিনিয়ত আমাদের ডাক দিয়ে যায়, রহমত আলী শুনিয়ে যায় জীবনের জয়গান।

বাংলার সবুজ জমিনে ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছেন কাশেম পাঠান। বুকের তাজা খুনে তিনি এঁকে গেলেন খুন রাঙা পথের আল্পনা।

খানজাহান আলীর খুলনায় শহীদদের এ রক্ত কোনদিন বৃথা যাবে না।

হে আলোর পাখিরা! বেহেশ্‌তের সবুজ পাখিরা! তোমরা আমাদের জন্য দোয়া করো-আমরাও যেনো তোমাদের মতো জীবনের চেয়ে শাহাদাতকে বেশি ভালবাসি।

লেখক : সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.icsbook.info

শহীদি জনপদে স্মৃতিময় ক'টি দিন

ব্যারিস্টার মুহাম্মদ হামিদ হোসাইন আজাদ

গত কয়দিন ধরে তথাকথিত ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির লম্ফঝম্ফ আর কতিপয় সন্ত্রাসবাদী সেবাদাস পত্রিকার কাগুজে সন্ত্রাস সারাদেশে চরম নৈরাজ্যকর অবস্থার জন্ম দিয়েছে। ধর-মার-খতম কর ইত্যাদিই ঘাতক দলের নিত্য চিন্তা আর ভাষায় পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় প্রতিটি বিবেকবান মানুষ উদ্বিগ্ন অথচ সরকার রহস্যজনক ভূমিকায় অবতীর্ণ যা কখনো একটি দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকারের নিকট আশা করা যায় না। ফলে সচেতন বিবেকমাত্রই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছে। দিন যতই যাচ্ছে নৈরাজ্য বাড়ছে- বাড়ছে অস্থিরতাও। ২৫শে মার্চ '৯২ রাত সাড়ে এগারটা। এক অজানা আশংকায় মনটা হঠাৎ যেন পেরেশান হয়ে উঠল। মুহূর্তেই স্মরণ হলো রাত সাড়ে সাতটায় খুলনায় টেলিফোন করা সময় ইলিয়াস ভাই কথা শুরু করতে না করতেই বলছিলেন- "হামিদ ভাই, এখন রাখি পরে রিং করবো। তথাকথিত ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সশস্ত্র মিছিল আমাদের অফিসের দিকে।" এ কথা স্মরণ হতেই মনটা আনচান করে উঠল। সাথে সাথেই খুলনা মহানগরী শিবির অফিসে টেলিফোন করলাম। ওপ্রান্ত থেকে ওয়াছিয়ার রহমান মন্টু ভাই জানালেন ইফতারের পর সভাপতিসহ আমরা কয়েকজন ভাই অফিসে নিত্যদিনের মত অবস্থান করছিলাম। রাত সাড়ে সাতটার সময় হঠাৎ করেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত তথাকথিত ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির একটি সশস্ত্র মিছিল আমাদের অফিসে হামলা করে। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাদের উপর পরিচালিত এ পৈশাচিক হামলায় বেশ কয়েকজন ভাই আহত হন। ৪ জনের অবস্থা আশংকাজনক। ডাক্তার বলেছেন, ২৪ ঘন্টা পার হওয়ার আগে তাঁদের ব্যাপারে কিছুই বলা যাবে না।"

www.icsbook.info

এ দুঃসংবাদ শুনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে টেলিফোন রাখলাম। কিছু ভাবার আগেই ২ মিনিটের মধ্যে আবার রিং বেজে উঠল। টেলিফোন তুলতেই ওয়াছিয়ার রহমান মন্টু ভাইয়ের কান্নাভেজা কণ্ঠ ভেসে আসল "হামিদ ভাই, এইমাত্র হাসপাতাল থেকে বেলাল ভাই টেলিফোনে জানালেন, আমিনুল ইসলাম বিমান ভাই শাহাদাত বরণ করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) আমরা এখন কি করব"- তখন রাত ১২টা ১০ মিনিট।

আলাপ শেষে সাথে সাথে বিষয়টি কেন্দ্রীয় সভাপতিকে জানানো হলো, পরক্ষণেই উপস্থিত পরিষদ সদস্য ভাইদের বৈঠকে শাহাদাত পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হলো। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারেই পরদিন ২৬-৩-৯২ইং ফাস্ট ফ্লাইটে আমি এবং কামরুল ভাই খুলনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

শোকাহত খুলনা

খুলনা পৌঁছে দেখি সমগ্র শহর নীরব নিস্তব্ধ। দিনটি স্বাধীনতা দিবস হলেও এখন শহরে কোথাও কোন আনন্দের রোল নেই, আওয়াজ নেই- শিশুপার্ক পার হয়ে জামায়াত অফিসের সামনে দেখলাম অসংখ্য শিবির কর্মী এবং নেতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে, অনেকে অধিক শোকে পাথর হয়ে নিস্তব্ধ নিথর হয়ে পড়েছে। বহু জায়গায় সন্তানহারা মাকেও এরূপ ভেঙে পড়তে দেখিনি। ভেতরে ঢুকে দেখি নেতৃবৃন্দ বসে আছেন- সকলের চোখে মুখে বেদনার ছাপ। সমগ্র পরিবেশটাই এক অভাবিতপূর্ব করুণ দৃশ্যে ভরা। নেতৃবৃন্দের সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ সেরে বাসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। যাওয়ার পথে অনেকগুলো রাস্তা অলিগলি অতিক্রম করলাম। বহু মানুষের সাথে দেখা হলো। কারো মুখে হাসি দেখলাম না। কোথাও আনন্দের সামান্যটুকু রেশ নেই। চারদিকে শোকের ছায়া, মনে হলো আমিনুল ইসলাম বিমানকে হারিয়ে সমগ্র খুলনাই শোকাহত। আমিনুল ইসলাম বিমান যেন খুলনার প্রাণ ছিল। তাঁর বিদায়ে আজ সমগ্র খুলনা যেন প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। কলরবে মুখরিত প্রাণবন্ত খুলনা আজ স্বাধীনতা দিবসেও নীরব, নিথর, নিস্তব্ধ। যেটুকু আওয়াজ কানে আসে, হয় কুরআন তেলাওয়াতের নতুবা কান্নার।

লাশের মিছিলে আমাকে খুঁজবেন

জোহর নামায শেষে শহীদের বাড়িতে গেলাম। ইতোমধ্যে লাশের গোসল সম্পন্ন করে নামাযে জানাযার জন্যে কফিন Ready করা হয়েছে। আমরা যখন বাড়ি পৌঁছি তখন কফিন বাসা থেকে বের করে মাঠে আনা হয়েছে। কফিন ঘিরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন শহীদের আব্বা-আম্মা, আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবরা। সে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। ওখান থেকে আসলাম ওয়াপদা কলোনীতে। এ কলোনীতেই শহীদ বিমান বড় হয়েছে। তাঁর আব্বা ওয়াপদার চাকুরে হিসেবে নিজস্ব বাসায় যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ কিছুদিন পরেও তাঁদের বাসা ছিল ওয়াপদা কলোনীতে। কফিন কলোনী মাঠে পৌঁছার পূর্বেই আমরা কলোনী মাঠে এসে পৌঁছলাম। গাড়ি

www.icsbook.info

থেকে নামতেই উৎসুক জনতা এবং শহীদের ভাইয়েরা আমাদের ঘিরে জড়ো হয়ে গেলো। এক গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে শহীদের জীবনের বিভিন্ন স্মৃতি নিয়ে আলাপ করছিলাম। আলাপচারিতায় এক ভাই জানালেন- "কাল এ সময়ে (২৫ তারিখ বাদ যোহর) বিমান ভাই এ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আমাদের সাথে কথা বলছিলেন। বলতে বলতে হঠাৎ সুলতান ভাইকে লক্ষ্য করে বললেন- "আপনারা আমাকে খুঁজবেন না। আমার লাশ নিয়ে যখন মিছিল হবে ঐ মিছিলেই আমাকে খুঁজবেন। আর আমার লাশটি একটু ওয়াপদা কলোনীতে ঘুরিয়ে নেবেন।"

ভাইদের এ কথা বলেই তিনি শিবির অফিসে গিয়েছেন এবং এ যাওয়াই শেষ যাওয়া। সেদিন সন্ধ্যায়ই ঘাতকদের হামলায় আহত হয়ে বিমান ভাই শাহাদাত বরণ করেন। বিমান ভাই আর ওয়াপদা কলোনীতে ফিরে আসেননি। এসেছে অন্তিম ইচ্ছানুসারে তাঁর লাশ। কথাগুলো বলতে বলতে সব বন্ধু-বান্ধবরাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। ইতোমধ্যে শহীদের কফিনবাহী ট্রাক ওয়াপদা কলোনী মাঠে এসে পৌঁছালে কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ নির্বিশেষে উপস্থিত সকলেই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে।

অতঃপর প্রথম নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হলো। জানাযার পূর্বে শাহাদাতের মর্যাদা ও শহীদের উত্তরসূরিদের করণীয় সম্পর্কে যখন বক্তব্য রাখছিলাম তখন অশ্রুসজল প্রতিটি মানুষ যেন নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে এ প্রত্যয় ঘোষণা করলেন- শহীদের অসমাপ্ত দায়িত্ব পালনে আমরা বদ্ধপরিকর।

বিকেল ৪টায় শিশুপার্কে প্রতিবাদ সমাবেশে মিলিত হয়েছে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা, নামাযে জানাযার পূর্বে অনুষ্ঠিত এ বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশ মুহূর্তেই জনসমুদ্রে পরিণত হয়ে যায়। হাজার হাজার ছাত্র-জনতার গগনবিদারি শ্লোগানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। শুধু প্রতিবাদ নয়, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত এ সমাবেশ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘোষণা উচ্চারিত হয়। "শহীদ শেখ আমিনুল ইসলামের শাহাদাতের মাধ্যমে খুলনার মাটি থেকে ইসলামবিরোধী বাতিল শক্তির অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হলো- আর ইসলামের বিজয় হলো সুনিশ্চিত।" নামাযে জানাযা শেষে হাজার হাজার তৌহিদী জনতা কফিন নিয়ে কালেমা শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে কবর পানে। স্রোতস্বিনী নদীর বাঁধ ভাঙ্গা স্রোত যেমন অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যায় সাগর অভিমুখে এ মিছিল দেখেও মনে হচ্ছিল এক অপ্রতিরোধ্য জনস্রোত এগিয়ে চলেছে কোন এক মহা আকর্ষণে- সামনের দিকে। নদীর কল কল রবের মত হাজার কণ্ঠে কালেমা শাহাদাতের বাণী এক অপূর্ব মধুর পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করে।

কি অপরাধ আমার ভাইয়ের

২৭শে মার্চ, ৯২ ছিল দোয়া ও শোক দিবস। এদিন ৭৫ থেকে ৮০ খতম খতমে কোরআন অনুষ্ঠিত হয় খুলনা শহরে। শুধু ওয়াপদা মসজিদে (যেখানে বিমান ভাই প্রায়ই নামায পড়তেন) ৫ বার খতমে কুরআন অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন সকাল বেলা গিয়েছিলাম শহীদের পরিবারবর্গের সাথে দেখা করতে। বাসায় ঢুকতেই এগিয়ে

www.icsbook.info

আসলেন শহীদের বড় বোন নাসিমা খানম দিলু। এখনো স্বাভাবিক হতে পারেননি। সামনে এগিয়েই জিজ্ঞেস করলেন, "আমার ভাই বিমান কই? ওর কি অপরাধ ছিল? ওকে কেন হত্যা করা হলো? "টপ টপ কয়েক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন ছাড়া আমরা আর কোন জবাব দিতে পারিনি। অতঃপর তিনি বললেন, "আমার ইচ্ছে হয় ঘাতকদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে- আমার ভাইয়ের কি অপরাধ ছিল? কি অপরাধে তারা বিমানকে হত্যা করেছে? জানি ওরা কোন জবাব দিতে পারবে না।" বিমানের অপরাধ ছিল একটাই- ও অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতো না, ওদের সন্ত্রাস ও চুরি-ডাকাতিকে ঘৃণা করতো।" বিস্ফারিত নেত্রে আবার জিজ্ঞাসা করলো "আপনারা কি বিমানের মত আমাকে দেখতে আমার বাসায় যাবেন?"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবেগাপ্লুত হয়ে বড় বোন আবার মুখ খুললেন, "আমি কখনও জামায়াত-শিবিরকে পছন্দ করতাম না, ঘৃণা করতাম। আমার ভাই কেন শিবির করতে পাগলপারা হয়ে গিয়েছিল আমি বুঝতাম না। এখন আমি বুঝেছি। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি এখন বি.এল. কলেজে ভর্তি হবো-সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করবো, বিমান যে আদর্শের জন্যে জীবন দিয়েছে আমি সে আদর্শের বাণী প্রত্যেকের কাছে পৌঁছাবো। প্রয়োজনে সে আদর্শের জন্যে আমিও জীবন দেবো" অতঃপর আবার তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এদিকে ঘরের ভেতর শহীদের মা (আপন মা জীবিত নেই) বিমান- বলে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন।

উল্লেখ্য শহীদ শেখ আমিনুল ইসলাম বিমান ভাই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বংশোদ্ভূত। এদিক থেকে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া। পারিবারিক সূত্রে আব্বা-আম্মাসহ সকলেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। শুধুমাত্র বিমান ভাই ছিলেন ব্যতিক্রম। এ কারণে ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে পারিবারিকভাবে তাকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তার পিতার কথার পরে তা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

বিমান ছিল অতুলনীয়

সেদিন শহীদ-এর বাড়ি থেকে বেরিয়েই জানতে পারলাম শহীদ বিমান ভাইয়ের দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু মোশতাক ভাই এবং রাশেদ ভাই শোকে প্রায় পাগল হয়ে গেছেন। তাদের একটু সান্ত্বনা দেয়া দরকার। তাই তাদের সাথে দেখা করার জন্যে এবং ওয়াপদা কলোনী জামে মসজিদে জুম্মার নামায শেষে দোয়ার মাহফিলে শরিক হওয়ার উদ্দেশ্যে ওয়াপদা কলোনীতে গেলাম। মোশতাক ভাইয়ের সাথে আলাপ শেষে মসজিদে গেলাম। দেখলাম সমগ্র মসজিদে শোকের ছায়া। ইমাম সাহেব খুতবার সময় অশ্রুসজল নয়নে বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লেন- "আজ আমাদের মাঝে আমাদের একজন নিয়মিত মুসল্লি নেই। হয়ত শুক্রবারেও বিমান এ মসজিদের ঐ উত্তর-পূর্ব কোনায় বসে নামায আদায় করেছিলেন। সাধারণের মাঝে বিমান ছিলো এক অসাধারণ ছেলে। তিনি নামায পড়তেন ধীরস্থিরভাবে। আমরা অনেকে লম্বা

www.icsbook.info

জুব্বা পরি, তিনি হয়তো জুব্বা আলখেল্লা পরতেন না, কিন্তু তার কাপড় চোপড় ছিল মার্জিত এবং পরিমিত, নামাযে বিনয়ের চরম পরাকাষ্ঠা প্রতিফলিত হতো। ভদ্রতায় নম্রতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

তাঁর হাসি কান্না সবই ছিল পরিমিত। কখনো উচ্চস্বরে বা চেঁচিয়ে কথা বলতে তাকে দেখিনি। তার চারিত্রিক মাধুর্য সকলের মন জয় করতো। তাই কলোনির সকলেই তাকে ভালবাসতো। একথাগুলো বলেই তিনি সকলকে নামায শেষে দোয়ার মাহফিলে শরিক হতে আহবান জানালেন। ইমাম সাহেব যখন একথাগুলো বলছিলেন তখন মসজিদের উপস্থিত সকল মুসল্লিই কাঁদছিলেন। এ করুণ দৃশ্য স্পষ্টতই প্রমাণ করলো শহীদ শেখ আমিনুল ইসলাম বিমানের স্থান ছিলো সকল মানুষের অন্তরে। নামায শেষে প্রায় সকল মুসল্লিই বসে পড়লেন দোয়ার জন্যে। ইতোমধ্যে উপস্থিত প্রায় সকলেই আমাদের দেখেছেন। উৎসুখ দৃষ্টিতে প্রায় সকলেই আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন। এক বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ঐ কলোনির সম্মানিত একজন অফিসার আমাকে বলেই বসলেন "আপনাকে একটু বক্তব্য রাখতে হবে।"

আমি বিনয়ের সহিত বললাম, "দোয়ার মাহফিলে বক্তব্য রাখার দরকার নেই। তাছাড়া গতকাল এখানে আমি বক্তব্য রেখেছি এবং মানসিকভাবে এখন আমি প্রস্তুতও না।" কিন্তু না, তিনি নাছোড়বান্দা। সাথে আরো কয়েকজন তার সাথে একযোগে বললেন, "আমরা আজ আপনার বক্তব্য শুনতে চাই।" ইতোমধ্যে ইমাম সাহেবকে আমাদের উপস্থিতির কথা জানিয়ে দিলেন। ইমাম সাহেব ডেকে তার পাশে বসতে বাধ্য করলেন। তিনি দাঁড়িয়েই শহীদ বিমান ভাইয়ের জীবনের ২/১টি তাৎপর্যপূর্ণ দিক তুলে ধরে হঠাৎ করে বক্তব্য রাখার জন্যে আমার নাম ঘোষণা করলেন, বাধ্য হয়েই বক্তব্য রাখতে হলো।

আমি যখন শাহাদাত ও মু'মিন জীবনের করণীয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখছিলাম তখন আবার এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। এ দৃশ্য ভালবাসার, এ দৃশ্য ভ্রাতৃত্বের, এ দৃশ্য দৃঢ়তার, এ দৃশ্য ছিল গভীর আন্তরিকতার। একজন প্রতিবেশীর প্রতি এমন গভীর আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ আমি আর কখনো দেখিনি। সবাই মুহূর্তেই শোককে শক্তিতে পরিণত করলেন। বক্তব্য শেষে শহীদি কাফেলার দায়িত্বশীল হিসেবে সকলের একান্ত অনুরোধের কারণে আমাকেই মুনাজাত পরিচালনা করতে হলো।

নামায শেষে মসজিদ থেকে বেরিয়ে মাঠের কোনায় আসতেই উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দসহ উপস্থিত সকলেই আমাদের ঘিরে ধরলেন। তথাকথিত ঘাতক দালাল কমিটির জাহানারা ইমাম ও তাদের সৃষ্ট নৈরাজ্যকে সকলেই ঘৃণা করে আলাপ করছিলেন। আলাপ প্রসঙ্গে এক অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "কি দরকার ছিলো এ নৈরাজ্যের? কি দরকার ছিলো এভাবে একটি ভাল ছেলেকে হত্যা করার? আপনারা দেখবেন কিছু দিনের মধ্যেই আল্লাহর তরফ থেকে জাহানারা ইমামের

www.icsbook.info

বিচার হবে।" ইতোমধ্যে নূরু ভাই (কলোনীর একজন দারোয়ান) এসে বেলাল ভাইকে জড়িয়ে ধরে আর্তচিৎকারে ভেঙ্গে পড়লো বিমান ভাই কই এ কথা বলেই তিনি বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন অনেক চেষ্টা করেও দীর্ঘক্ষণ তাকে হুঁশ করা গেল না। বুঝলাম সত্যিই সর্বস্তরের মানুষের সাথে বিমান ভাইয়ের ছিল হৃদ্যতার সম্পর্ক। ওখানে আলাপ প্রসঙ্গে জানলাম, শিবির করার কারণে দীর্ঘদিন ধরে বিমান ভাই বাড়ি থেকে টাকা পেতেন না। তাই তিনি দু'টা টিউশনি করতেন।

এর মধ্যে একটা টিউশনির টাকা নিজে খরচ করতেন আরেকটা টিউশনির টাকা দিয়ে আরেকজন দরিদ্র কর্মী ভাইয়ের পড়ালেখার খরচ বহন করতেন। আহত হয়ে বা অসুস্থ হয়ে তার পরিচিত যে কেউ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন- খবর পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি ছুটে গিয়েছেন আর রোগীর পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আরও জানলাম, কেউ তার সামনে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কোন সমস্যার কথা বললে সাথে সাথে সে সমস্যা সমাধানের জন্য পেরেশান হয়ে যেতেন। সেদিন বিকেল ৪টায় ছিল শোক মিছিল। হাজার হাজার ছাত্রজনতা শোক মিছিলে যোগ দিয়ে কালেমা শাহাদাতের বলিষ্ঠ আওয়াজে সমগ্র শহর প্রকম্পিত করে তোলে। শহীদের সাথীদের এ সুশৃঙ্খল অথচ দীর্ঘ এ মিছিল প্রমাণ করেছে আমরা শোকাহত নই- শহীদি প্রেরণায় উজ্জীবিত।

শোক মিছিল পরদিন ২৮শে মার্চ-এর হরতালের সমর্থনে এক খণ্ড মিছিল বের হলে পুলিশ অতর্কিতে হামলা চালিয়ে ঐ মিছিলের উপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। এমনকি তারা ইফতারের সময় জামায়াত অফিসে পর্যন্ত হামলা চালায়। গ্রেফতার করে ৩জন জামায়াত ও শিবির কর্মীকে। কিন্তু এসব নির্যাতন আর জুলুম শহীদের ভাইদের দমাতে পারেনি। সকল ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে রাত দশটায় শিবির কর্মীরা হরতালের সমর্থনে অসংখ্য মিছিল করে রাজপথকে প্রকম্পিত করে তোলে।

হরতাল ও পেশাজীবীদের বক্তব্য

২৮ মার্চ '৯২। শিবির শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান হত্যার প্রতিবাদে খুলনায় সর্বাত্মক হরতালের ডাক দিয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবির। এ হরতালের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে খুলনার সর্বস্তরের পেশাজীবী শ্রমিক ও বণিক সম্প্রদায়। হরতালের সমর্থন দিতে গিয়ে শ্রমিক নেতা নূরু ভাই বলেন- বিমানকে হত্যা করে হত্যাকারীরা আমাদের ঈমান-আকীদার উপর হামলা করেছে। আমরা এর সমুচিত জবাব দিতে প্রস্তুত। জীবনের বিনিময়ে হলেও আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবো। নিউমার্কেট বণিক সমিতির সভাপতি বলেন "আমি অনেক ভাল মানুষ দেখেছি, ভাল-এর Defination ও দেখেছি। ভাল মানুষ এবং ভাল-এর যে Defination আমি দেখেছি তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি ভাল ছিল বিমান। এমন এক অসাধারণ ছেলের হত্যার প্রতিবাদে আমরা হরতাল করবো। কাল ১২টা পর্যন্ত কোন দোকান খুলবে না।

www.icsbook.info

সর্বাত্মক হরতাল পুলিশের পৈশাচিকতা

সকল হুমকি ও প্রতিরোধকে উপেক্ষা করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা ঐদিন সেহেরি খাওয়ার পর পরই হরতাল সফল করার জন্য রাজপথে নেমে পড়েন। না কোন পিকেটিং এর প্রয়োজন নেই। সকাল দশটা পর্যন্ত খুলনার ইতিহাসে নজিরবিহীন শান্তিপূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। রিক্সা, ট্রাক, বাস কিছু চলেনি রাস্তায়। অফিস-আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সবই ছিল বন্ধ। সকাল দশটার পর থেকে কোন কালো হাতের ইশারায় পুলিশ বর্বর রূপ পরিগ্রহ করে। যেখানেই শিবির বা জামায়াত কর্মী পাচ্ছে অন্যায়ভাবে তাদের মারধর করছে, গ্রেপ্তার করছে, সিভিল পোশাকে পুলিশ রাজপথে রিক্সা নিয়ে নামছে আর কেউ বাধা দিলেই তাকে বেধড়ক মারধর এবং গ্রেপ্তার করেছে। অন্যায়ভাবে আমাদের ১৪ জন ভাইকে গ্রেফতার করে তাদের ওপর পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়েছে। সেদিন পুলিশের নারকীয় বর্বরতা এবং নির্লজ্জ পক্ষপাতমূলক রাজনৈতিক মহড়া স্বৈরাচারী শাসনামলকেও হার মানিয়েছে। এতদসত্ত্বেও হরতাল হয়েছে সফলভাবে।

শহীদ পরিবারে কিছুক্ষণ; নিশ্চয়ই মিছিলে ফেরেশতা ছিল

২৯ তারিখ সকাল বেলা ঢাকা ফিরবো। তাই ২৮ তারিখ রাতে শহীদ পরিবারের সাথে শেষ বারের মত দেখা করতে গেলাম শহীদ বিমান ভাইয়ের বাড়িতে। শহীদের আব্বা আম্মা ভাই বোন ছাড়াও নানা-নানী, মামা-মামীসহ অনেক আত্মীয় স্বজনে ভরপুর তার বাড়ি। আমরা যাওয়ার পর সকলে আমাদের ঘিরে বসলেন। আজ পরিবেশ কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। শহীদের পিতা শেখ ইদ্রীস সাহেব কথা শুরু করলেন- "সেদিন জানাজার পর যে অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখেছি তা ভুলবার নয়। জানাজায় যা লোক হয়েছে জানাজার পর লাশ নিয়ে কলেমার মিছিল কবরের দিকে গিয়েছে তার লোকসংখ্যা ছিল কয়েকগুণ বেশি। আমি কবরগাহে গিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখি মিছিলের শেষ নেই। অসংখ্য সাদা পোশাকধারী সাদা শ্মশ্রুমণ্ডিত মিছিলকারী দেখলাম পেছনে, যাদের হাঁটার ধরন একই রকম। নিশ্চয়ই মিছিলে ফেরেশতা ছিল।"

শহীদের মামা মুক্তিযোদ্ধা ও গোপালগঞ্জ জাসদের সেক্রেটারিও একই কথা বললেন। শহীদের পিতা তার প্রিয় পুত্রের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বললেন, "আমার ছেলেকে আমি একদিন বললাম, তুই ছাত্রলীগে চলে আয়। আমি তোকে জেলা সভাপতি বানিয়ে দেব।" তখন ছেলে বলল, "বুঝেছি আপনি আমাকে দিয়ে লাইসেন্স পারমিটের সুবিধা ভোগ করতে চান। আমাকে দিয়ে এটা হবে না। আমি আল্লাহর দ্বীনের জন্যই কাজ করবো।"

তিনি আরও বলেন, "ছেলে ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর এক ইঞ্জিনিয়ারের সামনে আমি তাকে বললাম- তুই পলিটেকনিকে ভর্তি হ, তাহলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবি।" জবাবে সে বললো, "পলিটেকনিকে কেন পড়বো, ডিপ্লোমা

www.icsbook.info

ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ঘুষ খাওয়ার জন্য?" শিবির করার কারণে আমার ছেলেকে আমি বহুদিন বকুনি দিয়েছি। নীরবে সে আমার বকুনি শুনেছে। কোনদিন সে আমার মুখের উপর কথা বলেনি। আমার সাথে বেয়াদবি করেনি। আমি বহুবার তাকে রাগ করেছি- কোনদিন সে আমার সঙ্গে রাগ করেনি।

শহীদের গর্বিত পিতা আরও বলেন, "গত কিছুদিন আগে আমি যখন মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন রাত তিনটার সময় তাকে খুঁজে পাচ্ছি না- আমি হতাশ হয়ে বললাম, ছেলেটি আমাকে দেখবে না। পরে জানলাম আমার চিকিৎসার ব্যাপারে পরামর্শ করতেই সে ছুটে গিয়েছে। আমি যেদিন থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছি সেদিন থেকে আমার ছেলে আমার জন্য রোজা রাখা শুরু করেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে বাড়িতে কাউকে জানতে দেয়নি।" একথা বলেই শহীদের পিতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং বললেন- "জীবিত থাকতে আমি আমার ছেলেকে চিনিনি, শহীদ হওয়ার পরে চিনলাম।" আমরা সকলে তন্ময় হয়ে তাঁর স্মৃতি কথাগুলো শুনছিলাম।

এরপর বিদায় নিতে গেলে আবার সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। শহীদের নানা জনাব সরওয়ার জাহান মোল্লা আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমুতে চুমুতে বুক ভরিয়ে দিলেন। এভাবে কামরুল ভাই আর বেলাল ভাইকেও শহীদের দুলাভাই বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললেন আমাদের ভুলবেন না।"

সবশেষে গাড়িতে উঠার প্রাক্কালে শহীদের ছোট ভাই মামুন আমার বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে বললো- "আমি খুলনার দ্বিতীয় শহীদ হবো।" সত্যিই এ দৃশ্য প্রেরণার উৎস।

শেখ আমিনুল ইসলাম বিমান খুলনার প্রথম শহীদ। ভদ্র, নম্র, বন্ধুবৎসল সেবক বিমানের শাহাদাত নিঃসন্দেহে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। তাই তাঁর শাহাদাতে খুলনায় সৃষ্টি হয়েছে বুকফাটা বেদনার এক বিশাল সাগর। কিন্তু এ সাগরে রয়েছে প্রাণের জোয়ার, প্রেরণা আর চেতনার অপ্রতিরোধ্য স্রোত। এ স্রোত ভাসিয়ে নেবে খোদাদ্রোহিতার শেষ চিহ্নটুকুকে। আর বয়ে আনবে শহীদি জজবায় মহীয়ান কুরআনের রাজমুকুট। খুলনার জমিনে ৪ দিনের সংক্ষিপ্ত অবস্থান আমার হৃদয়ে এ দৃঢ় বিশ্বাসেরই জন্ম দিয়েছে। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। আমীন॥

লেখক : সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.icsbook.info

সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন ও ইসলামী ছাত্রশিবির

এ.এইচ.এম হামিদুর রহমান আযাদ এমপি

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। শিক্ষা মানুষকে সুন্দর উন্নত জীবন গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতি দেয়। শিক্ষা একটি জাতিকে বাঁচার মত বাঁচতে শিখায়। আর তাকে সভ্যতার দিকে এগিয়ে নেয়। শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে পারে না। এ উদ্দেশ্য সাধনে যে প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তার নাম শিক্ষাঙ্গন তথা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়।

জাতি তার শিক্ষাঙ্গনের কাছে তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে সুশিক্ষা আশা করে। অর্থাৎ অভিভাবক মহল সন্তানদের শিক্ষাঙ্গনে পাঠিয়ে তাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি, প্রতিভার উন্মেষ, স্ফুরণ, ক্রমবিকাশ ও মানবীয় ভাবধারার সুষ্ঠুতা বিধানের মাধ্যমে তাদেরকে মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। জাতির প্রত্যাশা শিক্ষাঙ্গন থেকে বেরিয়ে আসবে জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার এবং তৈরী হয়ে আসবে আগামী দিনের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। সার্থক হয়ে উঠবে 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে'-এ অমরবাণী। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের শিক্ষাঙ্গন জাতির সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি এবং পারছেনা। ফলে শিক্ষাঙ্গনের কথা আলোচনা করতে গেলেই আঁতকে ওঠে মানুষের মন। ভেসে আসে অসংখ্য মুন্সী আব্দুল হালিমের মায়ের বুক ফাটা কান্না। এতিম আমান উল্লাহ এর বোনের ভাই হারানোর বিলাপগাথা আর্তনাদের হৃদয় বিদারক দৃশ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ধর্ষিতা ভর্তিচ্ছু ছাত্রীর অভিভাবকের বিষন্নতার চিত্র, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিচ্ছু ছাত্র কামরুল ইসলামের গুঙ্গানো কান্নার বিভীষিকাময় ঘটনা। তাই প্রশ্ন উঠেছে মানুষ গড়ার আঙ্গিনা শিক্ষাঙ্গনগুলো কি বসনিয়া-কাশ্মীরের' অনুরূপ একেকটি রণাঙ্গন? অভিভাবকগণ চরম দুশ্চিন্তায়

www.icsbook.info

ভোগেন কখন কলিজার টুকরা লাশ হয়ে ঘরে ফেরে। শিক্ষকরা পাঠ দান করতে গিয়ে ভয়ে ভয়ে থাকেন কখন গোলাগুলি শুরু হয়। পথ চলতে গিয়ে থমকে দাঁড়ান কখনও আবার ছাত্রদের বেধড়ক আক্রমণের শিকার হয়ে পড়েন। তাই আজ আমাদের ভেবে দেখতে হবে এর কারণ। বিশ্লেষণ করতে হবে এর পরিণতি। উদ্ভাবন করতে হবে এর প্রতিকার। গতানুগতিক ছাত্ররাজনীতির ধারাকে পাল্টিয়ে এর সামনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। পেশিনির্ভর ছাত্ররাজনীতির পরিবর্তে মেধানির্ভর এবং আদর্শভিত্তিক গঠনমূলক রাজনীতির ধারা প্রবর্তন করতে হবে।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস- অতীত ও বর্তমান রূপ

আমাদের দেশে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সন্ত্রাস অনেকটা ঐতিহ্যের মত লালিত, পালিত হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-যাকে কেন্দ্র করে এদেশের সকল রাজনৈতিক আন্দোলন, সেখানেই প্রথম এদেশের শিক্ষাঙ্গনের সকল প্রকার রাজনৈতিক ভায়োলেন্স প্রতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক রূপলাভ করে ঘাটের দশকে ন্যাশনাল ষ্টুডেন্ট ফেডারেশন এন.এস.এফ এর মাধ্যমে। এর পূর্বে পঞ্চাশের দশকে এ ছাত্র সংগঠন তেমন কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও স্বৈরাচারী আয়ুব খানের শাসনামলে নবশক্তি নিয়ে প্রকাশ করে। জেনারেল আইয়ুবের ক্ষমতার মসনদ ঠিক রাখা এবং ছাত্র আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে, ছাত্রদের মাঝে একটি সন্ত্রাসী, দাঙ্গাবাজ গ্রুপ তৈরীর মাধ্যমে, ছাত্র সমাজের ভাবমূর্তি নষ্ট করার লক্ষ্যেই মোনায়েম খানের তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়েছিল এ ছাত্র সংগঠন। সরকারের মদদপুষ্ট হয়ে এ সংগঠনের সন্ত্রাসীরা আইয়ুব মোনায়েমের হাতিয়ার হিসেবে রাজনীতি এবং শিক্ষাঙ্গন সমূহে এক অশান্ত ও অসহনীয় পরিবেশ সৃষ্টির উন্মত্ততায় মেতে ওঠে। সেখান থেকেই দেশের ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস সন্ত্রাসের সূচনা হয়। পরবর্তীকালে যারা ক্ষমতায় এসেছেন তারা জেনারেল আয়ুবের তুখোড় সমালোচক হলেও ক্ষমতা রক্ষার রাজনীতিতে আইয়ুবকে অনুসরণ করতে বিন্দুমাত্র ভুল করেননি। যার প্রমাণ মেলে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরপরই। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ একনায়কত্ববাদী মানসিকতা বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক ময়দান ও শিক্ষাঙ্গন উভয় ক্ষেত্রেই পূর্ণ সমীকরণ করল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জনপদের সর্বত্র অস্ত্র ও সন্ত্রাসের বিষবাষ্প মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে দেয়। ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে '৭৫ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়টাতে খুনী সন্ত্রাসী এবং অস্ত্রবাজদের হাতে জনজীবন ছিল জিম্মি, খুনের লাশ এবং খুনী সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্যে পূর্ণ ছিল শিক্ষাঙ্গন। শিক্ষার্থীদের হাতে তখন কলম নয় রাইফেল, পিস্তল, গ্রেনেড হাতে তারা এক এক জন সৈনিক। দীর্ঘদিনের প্রবাদ Pen is mighter than swrod. তলোয়ারের চেয়ে কলম বড় বা অসির চেয়ে মসি বড়-যে দার্শনিক তত্ত্ব এ বাক্যে নিহিত রয়েছে তাও বদলে গেল। ১৯৭৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলে সংঘটিত হয় নৃশংস ছাত্রহত্যা। তৎকালীন

www.icsbook.info

ছাত্রলীগের অন্তঃদ্বন্দ্বের ফসল এই নৃশংস ঘটনায় ৭জন তরুণের দেহ ব্রাশ ফায়ারে ঝাঁঝরা করে দেয়া হয়। সন্ত্রাস তার যাত্রা অব্যাহত রাখে।

১৯৭৫ সালের শেষের দিকে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হলেও সন্ত্রাস কমেনি। সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের মধ্যেও একটি সশস্ত্র গ্রুপ গড়ে ওঠে। ক্যাম্পাস রাজনীতি এবং দলের অভ্যন্তরে গ্রুপ গড়ে ওঠে। ক্যাম্পাস রাজনীতি এবং দলের অভ্যন্তরে গ্রুপভিত্তিক আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় সন্ত্রাস অব্যাহত থাকে আপন গতিতে। ১৯৮২ সালে স্বৈরাচারী সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজনৈতিক সংলাপের সময় একটি জোটের দেয়া শর্ত হিসেবে সরকার প্রধান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সে বছর ১১ই মার্চ সংঘটিত 'শিবির নেতার' হত্যাকাণ্ডের বিচারে সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের ক্ষমা করে দেয়। ফলে তাদের খুনীরা ফ্রি লাইসেন্স পেয়ে যায়। ইসলামের উত্থান তথা ছাত্রশিবিরের অগ্রযাত্রা ঠেকানোর জন্য আওয়ামী বাকশালী, মস্কোপন্থী, পিকিংপন্থীরা ঐক্যবদ্ধভাবে সন্ত্রাস চালায়। তাই দেখা যায় ক্ষমতাসীন সরকারের আমলেই ছাত্রদের হাতে সর্বাধিক পরিমাণ অস্ত্র গিয়েছে, সর্বাধিক ছাত্র হত্যা হয়েছে, সন্ত্রাসজনিত কারণে শিক্ষাঙ্গনসমূহ সর্বাধিক পরিমাণ অনির্ধারিতভাবে বন্ধ থাকে।

৯০ এ গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচার পতনের পর ৯১-এ একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতির দীর্ঘ প্রত্যাশার ফলশ্রুতিতে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সন্ত্রাসের করাল গ্রাস থেকে আমাদের শিক্ষাঙ্গন মুক্তি পায়নি। বরং ক্ষমতাসীন সরকারের সাড়ে তিন বছরের মাথায় শতাধিক ছাত্র নিহত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতর বন্দুকযুদ্ধ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫জন শিক্ষক প্রহার, খুলনা বি.এল. কলেজের নির্বাচিত জি.এস., এ.জি.এস এবং সাহিত্য সম্পাদকে হত্যা, এতিম আমান উল্লাহর জীবন ছিনিয়ে নেয়া, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে একজন ডাক্তারসহ তিন ছাত্রের নৃশংস হত্যাকাণ্ডসহ শিক্ষাঙ্গনের নৈরাজ্যকর পরিবেশ স্বৈরাচারের আমলকেও হার মানিয়েছে। সন্ত্রাস, সহিংসতা ও অস্ত্রের ঝনঝনাতিতে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ভয়াবহরূপ লাভ করেছে। যে অস্ত্র বিগত সরকার সমূহের আমলে প্রবেশ করেছিল তা বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সময়েও বের হয়নি। বরং সন্ত্রাস ও অস্ত্রের মহড়া বাড়ছেই। উপরন্তু সন্ত্রাসের রূপ, ধারণ, প্রকৃতি ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে। আগে লাঠি, হকিস্টিক, দা, কুড়াল, বল্লম ও ছুরিকাঘাতের ঘটনাই ছিল বেশী। বর্তমানে তার স্থান দখল করেছে রাইফেল, স্টেনগান, কাটাবন্দুক ও বোমা। অর্থাৎ সন্ত্রাস দিন দিন আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। ছাত্রদের হাতে এসব অস্ত্র দেখে পুলিশও ভয় পায়। উদ্ধার অভিযানে ব্যর্থ হয়ে পরস্পর বলাবলি করে "ওরা এমন সব অস্ত্র নিয়ে এসেছে যেগুলি আমরাও দেখিনি।" এখন প্রশ্ন কোন অদৃশ্য উৎস থেকে ছাত্ররা এসব অস্ত্র পেল?

www.icsbook.info

সন্ত্রাসের উৎস ও কারণ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে অধিকাংশ ছাত্র সংঘর্ষ ও হত্যাকাণ্ডের মূলে রয়েছে আদর্শিক দ্বন্দ্ব ও নেতৃত্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্পৃহা। ফলে অস্ত্রের ভাষা প্রাধান্য লাভ করছে। ক্ষমতায় যাবার সিঁড়ি হিসেবে ছাত্রদেরকে ব্যবহার করার রাজনৈতিক দলসমূহের হীন মানসিকতা ও ছাত্রদের অস্ত্র শক্তি ও পেশি মহড়ায় ইন্ধন যোগাচ্ছে। এর ফলে ছাত্রদের সুস্থ রাজনীতি চর্চার ধারাকে অনভিপ্রেত অসুস্থ ও উচ্ছৃঙ্খল ধারার দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। অপরদিকে ছাত্র সংঘর্ষ এবং হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যর্থতাই সন্ত্রাস নির্ভর ব্যক্তি সমষ্টিকে দিন দিন আরো উচ্ছৃঙ্খল ও বেপরোয়া করে তুলছে। বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও সে কমিটির রিপোর্ট দিনের আলো দেখেনি, নতুবা সুপারিশ মতো দোষীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সুতরাং সন্ত্রাস ও তার লাগাম ছাড়িয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এছাড়া শিক্ষক ধর্মঘট, শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন প্রেসার গ্রুপ সমূহের কার্যাবলী, নোংরা শিক্ষক রাজনীতি, অনির্ধারিত ছুটি, সেশনজট, ছাত্র সংসদ নির্বাচন প্রভৃতিও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসকে জিইয়ে রাখতে অনুকূল প্রভাব রাখছে।

প্রাসঙ্গিক ভাবে বলতে হয় আরো দু'টো কারণ আমাদের শিক্ষাঙ্গণগুলোতে সন্ত্রাসকে ইন্ধন যোগাচ্ছে। এর একটি হচ্ছে 'হলুদ সাংবাদিকতা'। একটি পতিত আদর্শের নিকট দায়বদ্ধ এদেশীয় কিছু পত্রিকার সাংবাদিক মহান দায়িত্ব হিসেবে সন্ত্রাসের হোতা এই কারণটির পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছেন অপর কারণটি হল বৈদেশিক চক্রান্ত। এ জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের নষ্ট করে দেয়ার জন্য এরা তৎপর। যার উৎকৃষ্ট প্রমাণ শুধুমাত্র সরকারি হিসাব মতেই লক্ষাধিক ছাত্র ভারতে অধ্যয়ন করছে।

প্রতিকার কোন পথে

সন্ত্রাসের ভয়াল থাবা থেকে এ দেশ, এ জাতি এবং তার ভবিষ্যৎ অগ্রনায়কদের রক্ষা করতে হলে এখনি তৎপর হতে হবে সকলকে। দেশের সচেতন মহলকে ভাবতে হবে ছাত্ররাজনীতির স্বরূপ নিয়ে। গ্রহণ করতে হবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, সংযোগ করতে হবে নতুন মাত্রা। এখানে আমরা কতিপয় নির্দেশনা তুলে ধরছি বিবেচনার জন্য।

প্রথমত: ছাত্ররাজনীতিতে মেধার সংযোগ ঘটাতে হবে। মেধাহীন পেশিনির্ভর ছাত্র ছাত্ররাজনীতি পরিহার করে মেধার ভিত্তিতে ছাত্রসমাজের মুখপাত্র নির্বাচন করতে হবে। এ ব্যাপারে ছাত্রসমাজসহ শিক্ষক ও অভিভাবক মহলকে সচেতন হতে হবে।

দ্বিতীয়ত: পরমত সহিষ্ণুতা ছাত্রদের শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্ররাজনীতি সম্পর্কে আচরণবিধি তৈরি করতে হবে। গণতন্ত্রের চর্চার বিধান থাকতে হবে। ছাত্রসংগঠনগুলোর আন্দোলনের ক্ষেত্র জাতীয় রাজনীতি থেকে ফিরিয়ে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশে শিক্ষার অধিকার আদায়ের আন্দোলনে শামিল করতে হবে।

www.icsbook.info

তৃতীয়তঃ সন্ত্রাসীদের নিজ নিজ সংগঠন থেকে বহিষ্কার করতে হবে। সন্ত্রাসীদের লালন ও পৃষ্ঠপোষকতা দানে বিরত থাকতে হবে সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহকে। এর জন্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বয়কট করতে হবে সন্ত্রাসী ছাত্রসংগঠনগুলোকে।

চতুর্থতঃ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সন্ত্রাস নির্মূলে সদিচ্ছা সৃষ্টি করতে হবে। ছাত্রদের ব্যাপারে শিক্ষকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের পরিবর্তে তারা যদি রাজনৈতিক ইচ্ছা প্রণোদিত হন তাহলে সন্ত্রাস নির্মূলের চিন্তা সুদূর পরাহত। সুতরাং শিক্ষকদের আরো বেশি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে।

পঞ্চমতঃ ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। হত্যা, সন্ত্রাস ইত্যাদির বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের ঘৃণাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এখানে আমরা সন্ত্রাস নির্মূলে আমেরিকান নিগ্রো বুদ্ধিজীবীদের দুটো সুপারিশের কথা উল্লেখ করতে চাই। প্রথম পরামর্শ হল এই যে, সন্ত্রাস নৈরাজ্য এবং এ ধরনের মানসিকতা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য ধর্মীয় অনুভূতি ও ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা দেয়া এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সহশিক্ষার পরিবর্তে পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রচলিত ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থাও সন্ত্রাসের জন্য দায়ী। অতএব এর আমূল পরিবর্তন করে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে।

> ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে '৭৫ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়টাতে খুনী সন্ত্রাসী এবং অস্ত্রবাজদের হাতে জনজীবন ছিল জিম্মি, খুনের লাশ এবং খুনী সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্যে পূর্ণ ছিল শিক্ষাঙ্গন। শিক্ষার্থীদের হাতে তখন কলম নয় রাইফেল, পিস্তল, গ্রেনেড হাতে তারা এক এক জন সৈনিক। দীর্ঘদিনের প্রবাদ Pen is mighter than swrod. তলোয়ারের চেয়ে কলম বড় বা অসির চেয়ে মসি বড়-যে দার্শনিক তত্ত্ব এ বাক্যে নিহিত রয়েছে তাও বদলে গেল। ১৯৭৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলে সংঘটিত হয় নৃশংস ছাত্রহত্যা। তৎকালীন ছাত্রলীগের অন্তঃদ্বন্দ্বের ফসল এই নৃশংস ঘটনায় ৭জন তরুণের দেহ ব্রাশ ফায়ারে ঝাঁঝরা করে দেয়া হয়। সন্ত্রাস তার যাত্রা অব্যাহত রাখে।

আশার প্রদীপ ইসলামী ছাত্রশিবির

উপরের আলোচনা সামনে রাখলে এ কথা দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করতে হবে যে,

www.icsbook.info

মানুষ গড়ার, মেধা ও মননের বিকাশ কেন্দ্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আজ সন্ত্রাসীদের লালন, পালন ও বিচরণ ক্ষেত্র। ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবক সকলেই আজ উদ্বিগ্ন এর অবসান চায় সবাই। জাতির আকুতি আর লাশ নয়, শিক্ষাঙ্গনে মানবতার বিকাশ চাই। কিন্তু এর জন্য ভূমিকা পালনে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসছে না কেউ। মুখে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বুলি, অন্যদিকে সন্ত্রাস তোষণ আজকে যেন বিঘোষিত জাতীয় নীতি। শিক্ষক বুদ্ধিজীবী চিন্তাশীল মহল সন্ত্রাসের মোকাবেলায় বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধে এগিয়ে আসার প্রয়োজন অনুভব করছেন। এক্ষেত্রে দেশের সরকারিদল এবং প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জক। তারা সন্ত্রাসীদের প্রত্যাখ্যান করার পরিবর্তে ফুলের মালা দিয়ে তাদের বরণ করে সন্ত্রাসের রাজনীতিকে উৎসাহিত করছেন। আর সন্ত্রাসীরা নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে হিংসা, জিঘাংসা আর হানাহানির মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশকে কলুষিত করছে। শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরে সুশিক্ষা গ্রহণের রঙিন স্বপ্ন নিয়ে আগত নিরীহ তরুণ শিক্ষার্থীরা এ দূষিত পরিবেশের শিকার হয়ে হতাশায় নিমজ্জিত। এমতাবস্থায় ইসলামী ছাত্রশিবিরের ইতিবাচক ও গঠনমূলক ছাত্ররাজনীতি ছাত্রসমাজের মাঝে জন্ম দিচ্ছে নতুন আশার আলো এবং উদ্দীপনার জাগরণ। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রতিষ্ঠাই হয়েছে হত্যা সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য নিরসনের লক্ষ্যে শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য। শিবির বরাবরই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ। সম্মিলিত বিরোধিতার মোকাবেলায় শিবির ধৈর্য, আদর্শ ও চারিত্রিক সৌন্দর্যে জয়ী হতে চায়। বিরোধীদের শত উস্কানি ও উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণায় উত্তেজিত না হয়ে আদর্শ ও গঠনমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার পরিবেশ সংরক্ষণ ও বিকাশে বদ্ধপরিকর। তাই দেখা যায় শিবির প্রভাবিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কোন সন্ত্রাস নেই। উদাহরণস্বরূপ আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে নজর দেব। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেত্রী মিডিয়া সাক্ষাৎকার ও বিভিন্ন সমাবেশে প্রদত্ত অভিমত হচ্ছে এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী তৎপরতার অভিযোগ অলীক কল্পনা প্রসূত। সামগ্রিক পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক। ছাত্রছাত্রীদের মাঝে রাজনৈতিক বিভাজন আছে। মতাদর্শগত পার্থক্য আছে সকল মতের অনুসারী ছাত্রছাত্রীরা সুষ্ঠু পরিবেশে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। এখানে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের অভিযোগ সম্পূর্ণ অবান্তর ও ভিত্তিহীন।"

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পরিবেশের ক্ষেত্রে একটি আদর্শ স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়। পাশাপাশি চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্র সংসদে ৮৬ সাল থেকে শিবির অধিষ্ঠিত। লক্ষণীয় যে এ কলেজটিই ১৯৮৭-৯১ সাল পর্যন্ত পরপর চারবার বিভাগীয় ভিত্তিতে এবং ১৯৯২ সালে জাতীয় ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যেসব

www.icsbook.info

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিবির শক্তিশালী সন্ত্রাস সেখানে নির্মূল। অপরদিকে ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরকে অগণতান্ত্রিকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি সন্ত্রাস এ দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপেই আছে। কবির ভাষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি ডাকাতের গ্রাস'। আন্তঃদলীয় কোন্দল, সামান্য পানি খাওয়ার ন্যায় তুচ্ছ ঘটনার নির্মম শিকার নিরীহ ছাত্র বুলবুল, নিজদলের কর্মীদের হাতে মনিরুজ্জামান বাদল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবু বক্কর, রুয়েটের আরাফাত, বুয়েটের সনি, গালিব হাসান লিটনের মতো নেতাদেরও হত্যার শিকার বানানো, এমনকি শিক্ষক পেটানোর মতো ন্যক্কারজনক ঘটনাও এখানে ঘটছে। তাদের হামলায়, ইতোমধ্যে শিবিরের ১৩৯ জন নেতাকর্মী শাহাদাত বরণ করেছেন। আশ্চর্য হই যখন তারাই নির্লজ্জের মতো ১৩৯জন নেতাকর্মী শাহাদত বরণ করেছে অথচ শিবিরকে সন্ত্রাসী সংগঠন বলে গালি দেয়। তাদের এহেন অবস্থা চোরের মা'র বড় গলা এ পুরনো প্রবাদকেই কেবল স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে, ইসলামী ছাত্রশিবিরের উত্থান একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজন। একথা আজ দেশপ্রেমিক মহল অকপটে স্বীকার করছেন। বিশেষ করে অতীতের বড় বড় ছাত্রসংগঠনগুলোর বর্তমানের আদর্শিক দেউলিয়াপনা, আন্তকোন্দল, সংঘাত, নৈতিক অবক্ষয়, সাংগঠনিক বিপর্যয়, মেধাশূন্য সন্ত্রাসনির্ভর নেতৃত্ব, কর্মসূচিহীনতা তথা সামগ্রিক অন্তসারশূন্যতা শিক্ষাঙ্গনে অমানিশার যে অন্ধকার ডেকে এনেছে তার প্রেক্ষিতে শিবিরের উত্থান দেশ ও জাতির জন্য আশার উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। হতাশার মাঝে আশার প্রদীপ জ্বলতে হলে যে চড়াই-উৎরাই আর দুর্লঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধকতা, বাধা-বিপত্তি, জুলুম-নির্যাতন আর ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে হবে, শিবির সে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। শহীদের রক্ত ঝরছে। শহীদের রক্তের মত শক্তিশালী আর কোন জিনিস নেই, আর কোন কর্মপন্থা বা কর্মসূচিই একটি আন্দোলনকে তার গতিবেগ ততটা বাড়িয়ে দিতে পারে না যতটা পারে শহীদের রক্ত।

পরিশেষে বলা যায়, ছাত্ররাজনীতিকে সুস্থ ও কল্যাণকর করতে হলে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস বন্ধ ও আদর্শ চরিত্রবান, মেধা সম্পন্ন নেতৃত্ব তৈরির কোন বিকল্প নেই। তাই আজ শ্লোগান উঠেছে 'মেধাশূন্য সন্ত্রাসনির্ভর চরিত্রহীন ছাত্র নেতৃত্ব পরিহার করুন'। ইসলামী ছাত্রশিবির তারই বাস্তব প্রতিধ্বনি।

লেখক : সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.icsbook.info

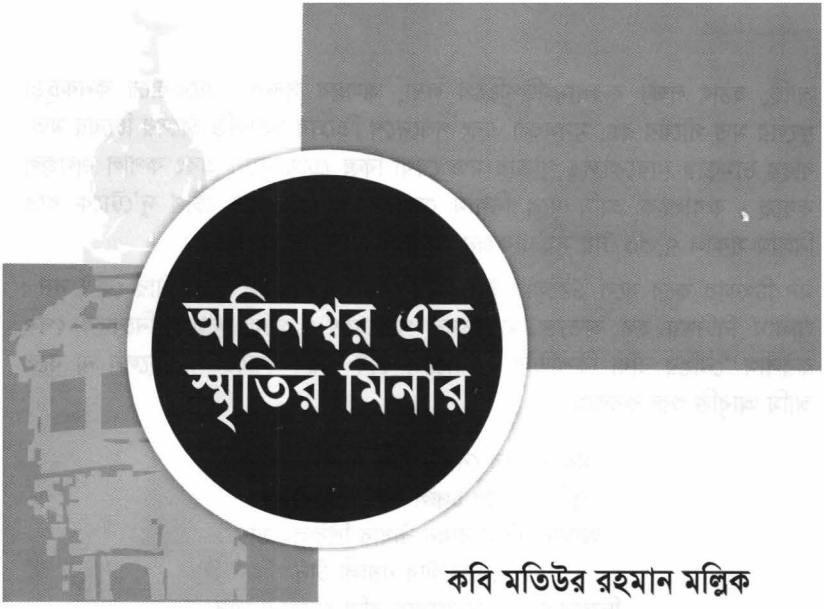

অবিনশ্বর এক স্মৃতির মিনার

কবি মতিউর রহমান মল্লিক

কবি বেনজীর আহমদ তখন বেঁচে আছেন। মহাকবি ফররুখ আহমদের কবরের খোঁজ করতে গিয়ে কবি বেনজীর আহমদের বাড়িও পেয়ে গেলাম। পেয়ে গেলেও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম না। কেননা সেদিন ছিলো ফররুখ আহমদের জন্যই আমার সমস্ত কাতরতা অথবা এক ধরনের আবেগ এবং আবেগের সিদ্ধান্ত আজ নয়, অন্য কোন দিন, আজ কেবল ফররুখ, কেবল ফররুখ অন্য কেউ নয়।

তখন শুনেছিলাম, কবি বেনজীর আহমদ খুব একটা চলাফেরা করতে পারেন না; বেশি দিন হয়তো বাঁচবেন না। তাই উতলা হয়ে উঠলাম। যত তাড়াতাড়ি কবির সাথে দেখা করা যায়, সাক্ষাৎকার আনা যায়। সাক্ষাৎকার আনতে পারলে মাসিক কলমের একটি সংখ্যা উজ্জ্বলতর হবে। অন্য আরো একটি কারণে কবির সঙ্গে দেখা করার তাগাদা ছিলো। তাগাদা ছিলো 'নোঙরে বাঁধা কিশ্‌তি' কবিতাটির সবটুকু উদ্ধারের।

'নোঙর বাঁধা কিশ্‌তি' কবিতাটি আমি ঢাকা থেকে প্রকাশিত কোন একটি দৈনিকে পেয়েছিলাম। কোন দৈনিকে যে পেয়েছিলাম তা আজ আর আমার মনে পড়ছে না- সংগ্রাম নাকি ইত্তেফাক? সেই কবিতাটি আমার এতো ভালো লেগেছিল যে মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সেই ৭০ দশকে আবৃত্তি করতাম। কবি বেনজীর আহমদের ঐ দীর্ঘ কবিতাটি আবৃত্তি করে আমি পুরস্কারও পেয়েছি।

এক সময়, ৭০ দশকের মাঝামাঝি কবিতাটি হারিয়ে যায়। স্মৃতিতেই বেঁচে থাকে মাত্র চারটি প্যারা। প্যারা চারটির কোনো কোনোটি আজো আমি বক্তৃতার মধ্যে সুযোগ-সুবিধা মত আবৃত্তি করে থাকি। তা কয়েক মাস হবে, কয়েক মাস পরে একেবারে সোজা গিয়ে হাজির হলাম বেনজীর আহমদের বাড়ি। বসে আছি, বসে

www.icsbook.info

আছি, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম-ছিপ্‌ছিপে লম্বা, অসম্ভব সুন্দর। একেবারে কনকচূড়া ফুলের মত গায়ের রঙ, মুখমণ্ডল এবং গণ্ডদেশে তিলের ছড়াছড়ি-চাঁদের চিত্রের মত, বাহুর চামড়ায় নারকেলের পাতার মত রেখা কিন্তু চোখ দুটো এবং কপাল জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। কপালকে আমি ধরে নিলাম ভোরের আকাশ আর চোখ দু'টোকে ধরে নিলাম সকাল ৭.৩০ টার সূর্য একজন আসছেন, ধীরে, অতি ধীরে।

মন চিৎকার করে বলে উঠলো। ইনি কবি বেনজীর আহমদ ছাড়া আর কেউ নন। সালাম বিনিময় হল অত্যন্ত আবেগঘন পরিবেশে। আমি আমার নিবেদন পেশ করলাম 'নোঙর বাঁধা কিশতি'র ব্যাপারে। কবি স্মরণ করতে পারছিলেন না বলে আমি আবৃত্তি শুরু করলাম-

মরা বন্দরে নোঙর বাঁধা কিশ্‌তি মোর
তুলি মাস্তুলে চঞ্চল পাল দক্ষিণা বার
আমার টুটিল বাঁধন বাঁধার শিকল-ডোর
নয়া জিন্দেগীর নয়ালী চাঁদ
দিলের গহনে জাগায়েছে বুঝি হাজারো সাধ

তব সে কিশতি মতি-মুক্তারে আজো জগৎ
ভোলে নিকো দোস্ত ভুলেছিলে নিজে তুমিই খোদ
দিশেহারা ধরা খুঁজিতেছে পথ অন্ধবৎ
কুফুরিবাদের হাঁপরে পড়িয়া ভুলিছে বোধ
দেখাও তাহারে পথের চিন
আবার রণুক তৌহিদী সুরে লিখিল বীণ
ভীত- কম্পিত যারা কাপুরুষ ঘৃণ্যতম
মুক্তি-আজাদী তাহাদের রুদ্ধদার
গোলামী তসবীহ্‌ পড়িছে তাহারা দমবদম
পরিহারো যত মোনাফেকীন
মুর্দার তরে নহেগো বন্ধু তোমার দ্বীন

দেশ-শ্রেণী ভেদে ভাগ করি করি মানুষ জাত
শোষণে পেষণে শাসন চালায়ে বিশ্বময়
আজো যারা পায়ে দলে মানবতা দিবস রাত
নব শত পথে রচিছে তারাই নতুন ভয়
নব ছলনায় না ভুলি আর
আজকে তার কুহক কলারে দাও সাবাড়

আবৃত্তি শুনে কবিকে খুব উচ্ছল মনে হলো। এবং স্মরণ করতে পারলেন। কাকে একজনকে ডাকলেন। সংরক্ষিত পত্রিকাগুলোর সন্ধান দিয়ে, তার সঙ্গে একটি কক্ষে

www.icsbook.info

যেতে বললেন। আলো-আঁধার ঘেরা সেই কক্ষে ঢুকেই এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। পত্রিকার ঢিবি চোখে পড়লো। একটি বান্ডিল তুলে ধরলাম। নিচের দিক থেকে দৃষ্টি পড়তেই থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। সম্ভবত সব শেষ। বাইরের অবয়ব ঠিকই আছে। কেবল ভেতর থেকে উঁইতে-বৃত্তাকারে এবং সুক্ষ্মভাবে-সবকিছুই খেয়ে ফেলেছে। কবিতার-নোঙরে বাঁধা কিশ্‌তির-শুধু শিরোনাম পেলাম, তাও খাওয়া। মনটা ভেঙ্গে গেল। কবিকে বললাম, অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। কবির সেই দীর্ঘশ্বাসের অর্থ আমার জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি বলে আমিও প্রসঙ্গান্তরে চলে যাই। কিন্তু সেই যে দীর্ঘশ্বাসটি কবিতার সাথে মিশে গেছে- আবৃত্তি করবার সময় টের পাই, বেদনার্ত হয়ে ওঠে মন-আজো আলাদা করতে পারিনি।

কবি সেদিন দেশ-মানুষ-আজাদী নিয়ে খুব মূল্যবান সব কথা বলেছিলেন। কিন্তু আমি কবিতা পেলাম না বলে এতোটা ভারাক্রান্ত ছিলাম যে, অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে কবির কথা আত্মস্থ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হইনি। ভেবেছিলাম, পরে একবার টেপরেকর্ডার নিয়ে আসবো, সবকথা বাণীবদ্ধ করবো এবং কলমের জন্যে একটি সাক্ষাৎকারও নেবো।

ভাঙ্গামন নিয়ে বিদায় চেয়েছিলাম এবং কবি এক গভীর আন্তরিকতায় আবার যোগাযোগ করতে বলেছিলেন। অর্থহীন ব্যস্ততায় কেটে গেল অনেকদিন। দেখা করে তাঁর মূল্যবান কথাও বাণীবদ্ধ করা হলো না, সাক্ষাৎকারও আনা হলো না।

পত্রিকায় হঠাৎ একদিন কবির ছবি দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। সব শেষ। কবি ইন্তেকাল করেছেন। মন চিৎকার করে বলতে থাকলো- মল্লিক, কবির সেদিনকার কথাগুলোও তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারতে, জীবনে একবারই কবির সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছিলো তোমার, সে সুযোগকেও কাজে লাগাতে পারলে না।

পড়লেন অনেক চেষ্টা করেও দীর্ঘক্ষণ তাকে হুঁশ করা হেলো না। বুঝলাম সত্যিই সর্বস্তরের সেদিন সেই সুযোগ অর্থাৎ জীবনে মাত্র একদিন কবি বেনজীর আহমদের দেখা পেয়েও-কাজে লাগাতে পারিনি বলে এক বুক ভাঙা বেদনায় আজো সান্ত্বনাহীন হয়ে পড়ি। সতর্ক থাকার পরও এ ধরনের আর একটি সান্ত্বনাহীন বেদনার সাথে কখনো জড়িয়ে পড়বো ভাবতে পারিনি। সেই সান্ত্বনাহীন অসহ্য আরেকটি জ্বালা যা জড়িয়ে আছে শহীদ আবুল কাশেম পাঠানের সঙ্গে।

মনে হয় এইতো সেদিন। বসে আছি কলম অফিসে। বেশ ব্যস্ততা। স্বভাব-সুলভ ভঙ্গিতে দুলতে দুলতে ঢুকলেন কামরুল আলম ভাই। মিষ্টি হাসির মানুষ। সাথে কেউ একজন। আমার দৃষ্টি সোজাসুজি নতুন মানুষটির সিঁথিতে গিয়ে আছড়ে পড়লো। আছড়ে পড়লো তার ভ্রুতে। সিঁথির সামনের দিকে সম্ভবত একটি মোড় থাকার কারণে এক গোছা চুল ফুলে আছে বলে আমার চোখ সেখানেও আছড়ে পড়লো। তারপর তার পেটানো শরীরের পৌরুষ দেখতে দেখতে আমার চোখ আটকে গেল ঐ অচেনা আগন্তুকের শিশুর মত সরল এক হাসির ফালিতে। পরিচয় জানবার জন্যে ভেতরেই তাগাদা অনুভব করলাম।

www.icsbook.info

কামরুল আলম ভাই পরিচয় করিয়ে দিলেন, মল্লিক ভাই, চিনতে পেরেছেন? বি.এল. কলেজের এ.জি.এস., আমাদের কাশেম ভাই।

দায়িত্ব হিসেবে কাশেমের বয়স আমার কাছে কম মনে হলো। কিন্তু সুন্দর দু'টি চোখের দিকে তাকিয়ে দেখি দৃষ্টির প্রাচুর্যে তার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতর দীপ্তি।

কাশেম কামরুল ভাইয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো, মল্লিক ভাই খুলনায় যান নাকি যে, চেনবেন? একেবারে সত্য কথা বলায় আমি বরং খুশি হয়ে বললাম- ভাইরে, একটা পত্রিকা, একটা মানুষ, লেখা সংগ্রহও করতে হয়, সম্পাদনাও করতে হয়, প্রুফও দেখতে হয়, সময় বের করা কষ্টকর। ইচ্ছে কি করে না খুলনায় যেতে? যাই-ও। কিন্তু ২/৪ দিনের ছুটি চলে যায় বাগেরহাটে, মা'র সাথে দেখা করে আসতে আর যেতে।

কামরুল আলম ভাই আমার পক্ষ নিয়ে বলেছিলেন, আসলেই মল্লিক ভাইয়ের অবস্থা খারাপ! ব্যাচারারে দায়ী করে লাভ নেই।

দাওয়াত দিলে এখন থেকে যেতে হবে কিন্তু। ছাড় হবে না।

সম্ভবত 'ছাড় হবে না' বাক্যটা আমাকে বিস্মিত করেছিলো। বিস্মিত করেছিলো এই জন্যে যে, ঐ বাক্যটার ভেতরে ছিলো পরিচ্ছন্ন দাবি ও ভালোবাসার এক অপূর্ব আকর্ষণ।

আমি গুণমুগ্ধের মত বলে ফেলেছিলাম, খালি খালি কি আর বি.এল. কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা তোমাকে ভোট দেয়? এতো অল্প সময়ের মধ্যে তুমি আমাকেও যেভাবে আকৃষ্ট করেছো-বাব্‌বাহ্ বি.এল. কলেজে পড়লে, তুমি আমার ভোটটাও পেতে।

চা-নাস্তা এসে গেলো। কামরুল আলম ভাই, আমি এবং কাশেম খুলনার ইসলামী আন্দোলনের বিবিধ বিষয় নিয়ে কথা শুরু করলাম। মূল বক্তা কামরুল ভাই, আমি শ্রোতা। টেবিলে লেখা-লেখি থাকার কারণে, মাঝে মাঝে শাণিত মন্তব্য করছিলো কাশেম। ওদের দু-জনের আলোচনা এবং পর্যালোচনা আমাকে ভেতরে ভেতরে দক্ষিণবঙ্গের ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত করে তুলছিলো। কথা শোনা আর সম্পাদনা করা কিন্তু একই সাথে বেশ জটিল। এবং জটিল বলে কাশেমের মূল্যবান সেই সব মন্তব্য আজ আর মনে নেই।

চা-নাস্তার পর কামরুল ভাই আর অপেক্ষা করতে চাইলেন না। কাশেমকে নিয়ে কোথাও যাবার তাড়া। আমি দু-জনকেই সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যাচ্ছি। এক ফাঁকে কামরুল ভাই কানে কানে কাশেম যাতে শুনতে না পারে- বললেন- মল্লিক ভাই, দোয়া করবেন, কাশেম খুলনার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব, শহীদ হালিম ভাইয়ের অভাব অনেকখানি পূরণ করতে পারবে।

আমি আমার সমস্ত ভালোবাসা মেশানো দৃষ্টি দিয়ে পূর্ণাঙ্গ কাশেমকে একবার দেখে নিলাম।

www.icsbook.info

সিঁড়িতে পা রাখতে যাবে, কাশেম আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে বললো- খাস করে দোয়া করবেন, খুলনায় যেতে হবে কিন্তু। আমার একহাত তার হাতের দু'মুঠোয় ধরা ছিলো। আর আমি আমার বাম হাতের তার ডানহাতের কব্জি এবং কব্জির উপরিভাবে স্পর্শ দিয়ে যাচ্ছিলাম- স্নেহ এবং আবেগের।

চেয়ারে ফিরে এলাম। অনেকক্ষণ কাজ করতে পারলাম না। আমার হৃদয়-মন-আত্মা কেবল কাশেমকে নিয়ে গর্ব করতে লাগলো। দক্ষিণবাংলা তথা সমগ্র বাংলাদেশের অন্ধকার এই কাশেমরাই একদিন দূর করবে।

খুব বেশী দিন অতিবাহিত হয়নি। সকালে অফিসে বসে কাজ করছি-সম্ভবত আলতাফই হবে হন্তদন্ত হয়ে এসে বলেলো-

খুলনার খবর পড়েছেন?

বললাম- খবর পেয়েছি আগেই, কিন্তু পত্রিকা পড়া হয়নি।

ও খুব আবেগ নিয়ে বললো-

পড়েন, দেখেন অবস্থা?

পড়লাম। প্রথমে আমি ঠিক কাশেমের পরিচয় স্পষ্ট করতে পারিনি। হঠাৎ বি.এল. কলেজের এ.জি.এস. মনে পড়তেই আমাকে আর আমি ধরে রাখতে পারিনি। লুকিয়ে কাঁদবার জন্যে চলে গেছি গোছলখানায়। ট্যাপ ছেড়ে দিয়ে শব্দ নিয়ন্ত্রণ করে কেঁদেছি আর মোনাজাত করেছি।

কাশেমরা আমাদের পরে এসে চলে গেল আগে আগে। কত সৌভাগ্যবান ওরা। ইয়া আল্লাহ, ওদের রক্ত তুমি কবুল করো। খানজাহানের পুণ্যভূমিকে তুমি ইসলামী আন্দোলনের দুর্বার ঘাঁটিতে পরিণত করো। আর আমাদের ভেতরের সমস্ত অলসতা এবং গাফলতি তুমি দূর করে দাও। আমাদের গোনাহের শেষ নেই বলে, আমরা কবুল হইনা, কবুল হয় ওরা। মা'বুদ তুমি আমাদের মাফ করে দাও।

সারাদিন কোন কাজ করতে পারলাম না। বাসায় গিয়ে আমি আমার স্ত্রীকে কাশেমের শাহাদাৎ এবং তার সাথে যে আমার অল্প সময়ের জন্য কথা হয়েছিলো এবং আমাকে যে পাগল করে দিয়ে গিয়েছিলো, খুলে বললাম। এও বলেছিলাম-

আর ইসলামী আন্দোলনের কাজে পিছপা হওয়া যাবে না। কাশেম আমার চোখ খুলে দিয়ে গেছে নতুন করে। যে চোখ শহীদ আব্দুল মালেক ভাই একদা খুলে দিয়েছিলেন।

ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় নিয়ে অফিসে আসি যাই। কাশেমের স্মৃতি এখনও জ্বলন্ত। যে চেয়ারটায় বসে চা-নাস্তা করে গিয়েছিলো, অজান্তে সে দিকে চোখ পড়লেই মন্‌টা হুঁ-হুঁ করে ওঠে। মনে মনে শপথ গ্রহণ করি দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আপসহীন হতে হবে। কোন মিথ্যার সাথে আর সম্পর্ক-সম্বন্ধ নয়।

এমনি এক সময় মিজান নিয়ে এলো শহীদদের বেশ কিছু নোট ডায়েরি। মিজান, কেন্দ্রের মিজান পাতা উল্টাচ্ছে আর পড়ছে। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার

www.icsbook.info

উপক্রম। প্রত্যেক শহীদই কোনো না কোনো জায়গায় শাহাদাৎ কামনা করে কিছু না কিছু লিখে গেছে। কিন্তু আবুল কাশেম পাঠানের লেখাটি আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যখন দেখাতে লাগলো-

শহীদ হবার ইচ্ছে আজ থেকেই শুধু নয় যেদিন ইসলামী ছাত্রশিবির ভালভাবে বুঝতে শিখেছি সেদিন থেকে।....

তখন কাশেমের প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করলাম। সে আকর্ষণ আজো আমাক মুহ্যমান করে রেখেছে। সে হয়ে আছে আমার অন্তর-মহাদেশের এক অবিনশ্বর স্মৃতির মিনার। সম্ভবত সেই কারণে গোলাম কুদ্দুস ভাই এবং গোলাম মাওলা ভাই যখন শহীদদের ওপর গান লিখতে বলেছিলেন আমি লিখতে পেরেছিলাম-

আবুল কাশেম পাঠান করেছে জীবন দান।
কোরানের পথে আর রাসূলের পথে তাই
চিরদিন রবে অম্লান
কোন দিন হবেনা সে ম্লান

রক্তে রক্তে ঐ পূর্ব আকাশের বুক
লাল না হলে
উঠতনা সূর্য আসতনা প্রভাত
উজ্জ্বল উচ্ছল ঝলমলে,

খানজাহানের দেশে কাশেম এক আকাশ আজ
সৌরভে গৌরবে সূর্য মহান। ঐ

কাশেম এক ইতিহাস কাশেম এক প্রেরণা
কালজয়ী চিরজয়ী সেনাপতি

প্রতিবাদে প্রতিরোধে জেহাদের উজ্জ্বল
শহীদের স্বপ্নীল ধ্রুব জ্যোতি
রূপসার তীরে তীরে

জনতার মিছিল ঐ এগিয়ে চলে
চেতনার শিখা হয়ে জালিমের সব বাধা
দলে মূলে
এক কাশেম ঐ দেখ

লাখো লাখো কাশেম হয়ে
সম্মুখে হও আগুয়ান-ঐ

www.icsbook.info

সেই হাস্যোজ্জ্বল চেহারা আজও চোখের সামনে ভাসে

এ্যাডভোকেট মো: আনছার উদ্দীন

২৩শে অক্টোবর' ৯৪। বেলা আনুমানিক ১টা। অন্যান্য এ্যাডভোকেট সহ আমি খুলনা মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মামলা পরিচালনার জন্য উপস্থিত। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এখনও আদালতে হাজির হননি। খবর পেলাম আবুল কাশেম পাঠান সিটি কলেজে শহীদ হয়েছে। একজন পুলিশ সার্জেন্ট এ খবরটি আদালত পাড়ায় পৌঁছে দেন। খবরটি শুনে প্রথমতঃ কিছুটা আনমনা হয়ে গেলাম। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে সঙ্গী আইনজীবীদের উপরে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে একাই রিক্সাযোগে সিটি কলেজ মোড়ে জামায়াত অফিসের পাশে ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হলাম।

গোটা শহর থমথমে। রিক্সা দ্রুত ঘটনাস্থলে আমাকে পৌঁছে দিল। ঘটনাস্থল তখন নীরব রণক্ষেত্র। সিটি কলেজের মধ্যে সন্ত্রাসী খুনিচক্র অপেক্ষা করছে। পুলিশ কলেজ গেটের অনতিদূরে খুনীদের নিরাপত্তা বিধানে ব্যস্ত। তৎকালীন ডিসি হেড কোয়ার্টার জনাব নূরুল আলম চৌধুরী ও খুলনা কোতায়ালী থানার ওসি জনাব নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল দাঙ্গা পুলিশ খুনীদের নিরাপত্তার জন্য পাহারা রত। আলহেরা মসজিদের চত্বরে শিবিরের নেতারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করণীয় নির্ধারণে ব্যস্ত। হোটেল রয়্যালের মধ্যে বহু লোক ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে। কাশেম পাঠানের লাশ গরীব নেওয়াজ ক্লিনিকে। হাজারও লোকের ভিড় গরীব নেওয়াজের সামনে।

শিবির নেতা আঃ ওয়াদুদকে নিয়ে শহীদদের লাশ দেখতে গেলাম। তখনও শহীদের নাকে অক্সিজেনের পাইপ লাগানো আছে। কাশেম পাঠান যেন ঘুমিয়ে আছে।

www.icsbook.info

কাশেমের মৃত্যুকে বিশ্বাস করতে পারছি না। কাশেমকে অন্য হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিতে বলে অফিসের দিকে রওনা দিলাম। শহীদের লাশ নিয়ে রয়্যাল হোটেলের সামনে এলে সিটি কলেজের ভেতর থেকে আবারও গুলি করা হয়। এবার শোকাহত জনতা লাশ নিয়ে সিটি কলেজের দিকেই অগ্রসর হয়। কলেজের ভেতর থেকে মুর্হুমুহু গুলি বর্ষণ হতে থাকে শোকাতহত ছাত্র জনতার ওপর। গুলিতে আহত জুবায়েরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গরীব নেওয়াজে। ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। এক দিকে সশস্ত্র সরকার দলীয় সন্ত্রাসীরা অন্য দিকে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার এ যুদ্ধে পুলিশ প্রথমতঃ নিষ্ক্রিয়। পরে নিরীহ ছাত্র জনতার পেছন দিক থেকে আক্রমণের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে বার বার। কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করা হচ্ছে। সামনে সন্ত্রাসী খুনীদের গুলি পেছনে পুলিশের আক্রমণ। যতদূর পারলাম সহযোগী একজন এ্যাডভোকেট সহ পুলিশের রাইফেলের মুখে দাঁড়িয়ে পুলিশকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলাম। সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করতে বার বার করে পুলিশকে অনুরোধ করলাম কিন্তু ফল হল না। রাস্তার উপর আহতদের গড়াগড়ি ও রক্তের স্রোত কালো পিচ কে লালে লাল করে ছিল। পুলিশ অফিসারদের গুলি করার নির্দেশে সাধারণ সিপাহীরা হতভম্ব; তাদের অনেকেই খুনীদের পাকড়াওয়ের পরিবর্তে নিহত ও আহতদের উপরে গুলি করার নির্দেশের প্রতিবাদ করে বলে উঠল, 'সব হুকুম পালন করা যায় না।' কাশেম পাঠানের লাশ বহন করে শহরে মিছিল করে আবার রয়্যাল চত্বরে শহীদের লাশ রাখা হয়। অতঃপর মর্গে পাঠান হয়।

পরের দিন হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম তরুণ নামের আর একজন ছাত্র নিহত হয়েছে গতকালের ঘটনায়। বিশাল জনতার উপস্থিতিতে শহীদ আবুল কশেম পাঠান ও তরুণের নামাজে জানাজা হাসপাতালেই আদায় করা হল। তরুণের লাশ তার আত্মীয়-স্বজন গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। কাশেম পাঠানের লাশ নিয়ে গোটা শহরে মিছিল করে রয়্যাল চত্বর নিয়ে আসা হল। সেখানে আবার জানাজা শেষে শহীদের বসুপাড়াস্থ বাড়ীতে নেয়া হল। সেখানে যে করুণ দৃশ্যের অবতারণা হল তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। পুরুষ, মহিলা, ছাত্র-ছাত্রী, কিশোর-যুবক, বৃদ্ধ নির্বিশেষে লাখো মানুষের ক্রন্দন, বার বার মূর্ছা যাওয়া ও আহাজারির ভিতর দিয়ে শহীদের লাশ দাফন করা হল বসুপাড়া কবরস্থানে শহীদের আব্বার কবরের পাশে।

কাশেম পাঠান মেধাবী ছাত্র ছিল। সুস্বাস্থ্যের ও ফুটফুটে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা এখনো চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। কাশেম পাঠানের তিরোধান এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। ছাত্র হিসেবে, ব্যবসায়ী হিসেবে, ইসলামী আন্দোলনের ছাত্র কাফেলার নেতা হিসেবে, বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র সংসদের ভারপ্রাপ্ত জিএস হিসেবে, সমাজে শালিস দরবারের বিচারক হিসেবে, পরিবারের কর্তা হিসেবে শহীদ আবুল কাশেম পাঠান ছাত্রজীবনে যে দায়িত্ব পালন করেছে তার শাহাদাতের পর পূর্ণ খবর আমাদের

www.icsbook.info

কাছে আসে। খুলনার প্রশাসনে, সাংবাদিক জগতে, ব্যবসায়ী মহলে, রাজনৈতিক অঙ্গনে কাশেম পাঠানের এত প্রভাব ছিল বেঁচে থাকতে ভাবতে পারিনি। আজ কাশেম পাঠান আমাদের মাঝে নেই, তার আত্মা জান্নাতের বাগিচায় বিচরণ করছে।

কাশেমের খুনিদের বিরুদ্ধে নাম, ঠিকানা উল্লেখ করে মামলা করা হয়েছে। আসামীরা আজও গ্রেফতার হয়নি। তারা অধিকার পেয়েছে স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী, হুইপ আশরাফ হোসেন ও মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান সহ বিএনপি নেতাদের গাড়ীতে গাড়িতে ঘোরাফেরা করার। অধিকার পেয়েছে বিএনপি সরকারের যাবতীয় আনুকূল্য পাবার। অন্যদিকে তরুণ হত্যায় শিবিরের দেওয়া মামলা গ্রহণ না করে শিবিরের নেতাদের আসামি করে সে মামলা বিএনপি দায়ের করল। সে মামলায় আসামী হিসেবে শিবির নেতাদের গুলি করে পর্যন্ত বন্দী করা হয়েছে। প্রায় সকল আসামিকেই কারাগারে যেতে হয়েছে।

হায়রে নিয়তি! ক্ষমতা কারো হাতে চিরদিন থাকে না কিন্তু যুলুম অত্যাচার, নির্যাতনের দাগ কখনো মুছে না বরং চিরকাল থেকে যায়।

আমরা তার অভাব চরমভাবে উপলব্ধি করছি। আমাদের সকলকে বিশেষ করে তরুণ কাফেলাকে কাশেমের অভাব পূরণে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসার আহবান জানাই।

লেখক : সাবেক আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, খুলনা মহানগরী

জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনি জানি
শহীদি রক্তে হেসে ওঠে যবে জিন্দেগানী

www.icsbook.info

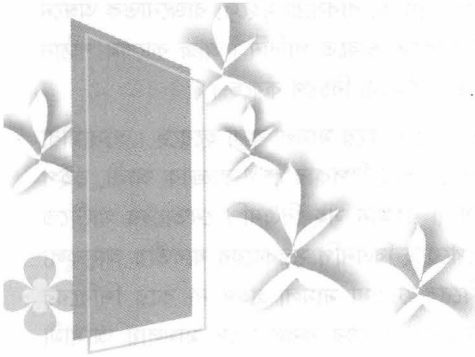

শহীদের মর্তবা বা মর্যাদা

মোহাম্মদ আবদুল মতিন

শহীদ কারা

আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদ বা আন্দোলন-সংগ্রামে যারা জীবন দান করে তাদেরকেই শহীদ বলা হয়। শহীদ বা শাহাদাত শব্দটি কুরআনী পরিভাষা। সুতরাং যাকে তাকে শহীদ বলা বা দাবি করা সঠিক নয়।

শহীদ হওয়া বা দাবি করার জন্য তিনটি শর্ত অপরিহার্য। তা হলোঃ

এক. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর আন্তরিকভাবে দৃঢ় ঈমান রাখতে হবে।

দুই. একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ বা আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হবে।

তিন. আল্লাহর দ্বীন তথা জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংকল্প থাকতে হবে। এ সম্পর্কে পবিত্র আল কুরআন এবং সহীহ হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। যা নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

১ম শর্ত- আল্লাহ ও রাসূলের ওপর আন্তরিকভাবে দৃঢ় ঈমান রাখতে হবে। এ সম্পর্কে আল কুরআনের সূরা হাদীদ এর ১৯নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা বলেন 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে তারাই হলো সিদ্দিকীন ও শুহাদা। তাদের জন্য তাদের রবের নিকট মহাপুরস্কার ও নূর বা জ্যোতি রয়েছে।"

অনুরূপভাবে সূরা হুজরাত এর ১৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, "প্রকৃত মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর দৃঢ় ঈমান এনেছে। এরপর তারা (এ ব্যাপারে) কোন সন্দেহ সংশয় পোষণ করে না এবং নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ-সংগ্রাম করে। প্রকৃত পক্ষে তারাই সত্যবাদী"।

মহান আল্লাহ তা'লা সূরা আত্ তাওবার ১১৯ নম্বর আয়াতে বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা

www.icsbook.info

মু'মিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। অতঃপর তারা (শত্রুকে) হত্যা করে এবং নিজেরাও নিহত (শহীদ) হয়।"

এভাবে সূরা আস সফ এর ১০ ও ১১ নম্বর আয়াতে শহীদ হওয়ার জন্য ঈমানের শর্ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার কথা বলব, যা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে মুক্তি দিবে। আর তা হলো, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর দৃঢ় মজবুতভাবে ঈমান রাখবে এবং জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ-সংগ্রাম করবে। এটাই হলো উত্তম পন্থা, যদি তোমরা সে সম্পর্কে জ্ঞান রাখো"।

এভাবে উল্লেখিত আয়াত ছাড়াও শহীদ হওয়ার জন্য ঈমানের শর্ত সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আল কুরআনের এই পরিভাষা শহীদ হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত, তাকে অবশ্যই ঈমানদার হতে হবে। ঈমানবিহীন কোন ব্যক্তি শহীদ হতে পারে না। মহানবী (সাঃ) শহীদকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণীর শহীদদের জন্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) উপর দৃঢ় ঈমান রাখা প্রথম শর্ত আরোপ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আমি রাসূল (সাঃ) এর নিকট শুনেছি। তিনি বলেছেনঃ শহীদ চার শ্রেণীর। ১. ঈমানদার লোক যিনি পরিপূর্ণ ঈমানদার অর্থাৎ ঈমান অনুযায়ী সর্বক্ষেত্রে আমল করেছে, সে শত্রুর সাথে মোকাবেলা করে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে আল্লাহর কাছে ঈমানের সত্যতা বাস্তবে পরিণত করে দেখাল। এমনকি শেষ পর্যন্ত সে ব্যক্তি নিহত হলো। এ কারণে শহীদ ব্যক্তি এমন অতি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভ করিবে যে, কিয়ামতের দিন জনগণ তার দিকে মাথা উঠিয়ে চোখ খুলে দেখতে থাকবে। এ ব্যক্তি ১ম শ্রেণীর শহীদ। ২. ঈমানদার লোক পরিপূর্ণ ঈমানদার অর্থাৎ ঈমান অনুযায়ী সর্বক্ষেত্রে আমল করেছে। (কিন্তু শত্রুর সাথে যুদ্ধে বীরত্বের দিক দিয়ে ১ম ব্যক্তির মত সাহসী নয়, এই জন্য) শত্রুর সাথে মোকাবেলা করল ভীতু-কাপুরুষ ব্যক্তির মত। যার চামড়ার ভিতরে কাঁটাদার গাছের কাঁটা বিদ্ধ করা হয়েছে। তার উপর তীর আসলো। নিক্ষেপকারী কে তা জানা যায়নি এবং তাকে নিহত করল। এ ব্যক্তি (ভীত হওয়ার কারণে) দ্বিতীয় শ্রেণীর শহীদ। ৩. এই ব্যক্তি ঈমানদার লোক, কিন্তু তার মধ্যে ভাল-মন্দ উভয় প্রকার আ'মল রয়েছে। সে শত্রুর সামনে উপস্থিত হয়ে খুব বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে ঈমানের সত্যতা বাস্তবে পরিণত করে আল্লাহর নিকট তা প্রমাণ করলো। এমনকি সে ব্যক্তি নিহত হলো। এ ব্যক্তি তৃতীয় শ্রেণীর শহীদ। ৪. এ ব্যক্তি ঈমানদার লোক, কিন্তু পাপ কর্ম করেছে। সে শত্রুর সামনে হাজির হয়ে খুব বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে ঈমানের সত্যতা বাস্তবে পরিণত করে আল্লাহর নিকট প্রমাণ করলো। এমনকি সে ব্যক্তি নিহত হলো। এ ব্যক্তি চতুর্থ শ্রেণীর শহীদ। (জামে আত-তিরমিজী, মিশকাত)। উপরোক্ত চার শ্রেণীর শহীদের সাথেই ঈমানের সম্পর্ক রয়েছে। অতএব আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর আন্তরিক ঈমান ছাড়া কেউই শহীদ হতে পারেনা। তবে কেউ মুখে মুখে বাহ্যিকভাবে ঈমানের দাবি করলেই ঈমানদার হওয়া যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আন্তরিকভাবে দৃঢ় ঈমান না আনবে।

www.icsbook.info

আর যদি কেউ মুখে মুখে ঈমানের দাবি করে অথচ অন্তরে তার ছোঁয়া লাগে না। সে কোনভাবেই প্রকৃত ঈমানদার হতে পারে না। বরং সে হবে আল্লাহর কাছে মুনাফিক। যদি এ ধরনের মুনাফিক মুসলমান আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয় তবুও সে শহীদ হবে না। বরং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ সম্পকে মহানবী (সাঃ) বলেন "আর মুনাফিক ব্যক্তি নিজের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ-জিহাদ করল। অতঃপর যখন সে শত্রুর সামনে হাজির হয়ে যুদ্ধ করলো এমনকি সে নিহত হলো। তবুও সে ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে। কেননা, তলোয়ার কখনো মুনাফিকী মুছে ফেলতে পারে না।" (দারেমী, মিশকাত)। সুতরাং এই হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, একজন মুনাফিক মুসলমান যুদ্ধ করতে করতে শত্রুর হাতে নিহত হলেও সে শহীদ হবে না এবং জান্নাতে যেতে পারবে না। বরং সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সেখানে কিভাবে একজন ঈমানবিহীন ব্যক্তি শহীদ হতে পারে?

দ্বিতীয় শর্তঃ শহীদ হওয়ার জন্য দ্বিতীয় শর্ত হলো, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই যুদ্ধ-জিহাদ, আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হবে। এ সম্পর্কে পবিত্র আল কোরানের সূরা বাকারার ২০৭ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, "আর কতক লোক এমন আছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে। আর আল্লাহ এইসব বান্দার প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল"। অনুরূপভাবে সূরা মুমতাহিনার ০১ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন "(হে ঈমানদারগণ!) যদি তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বের হয়ে থাকো তবে কেন শত্রুদের কাছে গোপনে বন্ধুত্বের কথা পাঠাও?"

প্রকৃত ঈমানদার আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসরণ করে থাকে। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ তা'লা সূরা আল ইমরান এর ১৭৪ নং আয়াতে বলেন, "আর ঈমানদার লোকেরা আল্লাহর সন্তুষ্টিরই অনুসরণ করে থাকে।" একজন ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) নিকট এসে কয়েকটি যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে মহানবী (সাঃ) যা বলেন, "হাদীসটি আবু উমামাতুল বাহিলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাঃ) নিকট এসে বললো, (হে নবী!) আপনি কি এমন লোক দেখেছেন, যে যুদ্ধ-জিহাদ করে সওয়াব চায় এবং মানুষের নিকট সুনাম ও সুখ্যাতি ও চায়। তার জন্য কী হবে? তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ তার কোন সওয়াবই হবে না। একথা তিনি তিনবার বললেন। এরপর তিনি বললেন, কোন আ'মলই আল্লাহ তা'লা কবুল করেন না। কিন্তু যে আ'মল খালেসভাবে আল্লাহর জন্য করা হয় এবং যে আ'মল বা কর্ম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় (কেবলমাত্র সে আ'মল বা কর্মই কবুল করেন)।" (নাছাই দ্বিতীয় খণ্ড)

সুতরাং এই হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, বিশুদ্ধ নিয়ত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া কোন আমল বা কর্মই আল্লাহর নিকট কবুল বা গ্রহণযোগ্য হয় না। আল্লাহর নবী (সাঃ) জিহাদকে দু' শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এ সম্পর্কে হযরত মুয়াজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেনঃ জিহাদ দু'প্রকার। প্রথম প্রকার এই যে, জিহাদকারী আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, নেতার আনুগত্য করে, জিহাদে উত্তম মাল খরচ করে,

www.icsbook.info

সঙ্গী সাথীদের সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং ফাসাদ (অর্থাৎ হত্যাকাণ্ড, লুটতরাজ, ঘরবাড়ি ধ্বংস করা ও গণিমতের মালের খিয়ানত ইত্যাদি) থেকে বিরত থাকে। সুতরাং তার ঘুম যাওয়া ও জেগে থাকা সবই পুণ্য। দ্বিতীয় প্রকার জিহাদ এই যে, জিহাদকারী আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করে না বরং) গর্ব অহংকার, মানুষকে বীরত্ব দেখানো ও শোনানোর জন্য জিহাদ করে, নেতার নাফরমানী করে এবং দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করে। সুতরাং নিজের পাপ মোচন করে ঘরে ফিরতে পারে না। (আর নিহত হলে শহীদ হবে না)" (ঈমাম মালেক, আবু দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত)

দুনিয়ার স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের জন্য যদি কোন ব্যক্তি জিহাদ সংগ্রাম করে তাহলে কিয়ামতের দিন তার কি অবস্থা হবে এ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ

"হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম ঐ ব্যক্তির ফায়সালা করা হবে যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে। তাকে হিসাব দেওয়ার জন্য আনা হবে। তখন আল্লাহ তা'লা তাকে তাঁর নিয়ামত সমূহ স্মরণ করিয়া দিবেন। সে ব্যক্তিও নিয়ামতসমূহ স্বীকার করবে। এরপর তিনি তাকে বলবেন, এ নিয়ামতগুলোর শুকরিয়া হিসেবে তুমি কি আ'মল করেছিলে? সে ব্যক্তি বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়েছি। তিনি (আল্লাহ) বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি তো এজন্য জিহাদ-সংগ্রাম করছো যে, তোমাকে বীর-যোদ্ধা বলা হবে। আর তা তোমাকে (দুনিয়াতে) বলা হয়েছে। এরপর (দোযখের দারোয়ানকে) নির্দেশ দেয়া হবে (তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য) তখন তাকে তার মুখের উপর ভর করে টেনে নিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।" (সহীহ মুসলিম, মিশকাত)

তৃতীয় শর্তঃ শহীদ হওয়ার জন্য তৃতীয় শর্ত হলো, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে জিহাদ-সংগ্রাম করা। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সূরা বাকারার ১৯০ নং আয়াতে বলা হয়েছে। "আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ-সংগ্রাম করো।" অনুরূপভাবে একই সূরার ২৪৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো, আর জেনে রাখ, আল্লাহ অবশ্যই সবকিছু জানেন ও সবকিছু শোনেন।' উপরে উল্লেখিত আয়াত দু'টিতে আল্লাহ তা'লা জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর নিচের আয়াত দু'টিতে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়ে সাথে সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও কারণ বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। যেমন সূরা বাকারার ১৯৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে "আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ-জিহাদ করো যে পর্যন্ত না ফিতনা (অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা) বিদূরিত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুরূপভাবে সূরা আনফালের ৩৯ নম্বর আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে " আর তোমরা তাদের (খোদাদ্রোহীদের) সাথে যুদ্ধ-সংগ্রাম করতে থাকো যতক্ষণ না ফিতনা (বিশৃঙ্খলা, অশান্তি) চূড়ান্তভাবে নির্মূল হয়ে যায় আর আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ ভাবে (সমাজ জীবনে) আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট হয়।" সুতরাং আল্লাহর নিকট শাহাদাত কবুল বা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত যা কুরআন ও

www.icsbook.info

হাদীস দ্বারা উল্লেখ করা হলো। অর্থাৎ এক. অন্তরে খাঁটি ও দৃঢ় ঈমান। দুই. সকল আ'মল বা কর্মতৎপরতার জন্য একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তিন. আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করা। অতএব যখন প্রকৃত মুমিন মুসলিম উপরোক্ত তিনটি শর্ত পূর্ণ করে শহীদ হবে। তখন কেবলমাত্র এ শ্রেণীর নিহত ব্যক্তিকে শহীদ বলা যাবে। আর এসব শহীদের জন্যই কুরআন এবং হাদীসে মর্যাদার কথা বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে।

শহীদের মর্তবা বা মর্যাদা

মানুষের যত প্রকার বা ধরনের মৃত্যু রয়েছে তার মধ্যে সর্বোত্তম মৃত্যু হলো শহীদি মৃত্যু। আর এ মৃত্যু কেবলমাত্র তারাই লাভ করে যারা উপরোক্ত তিনটি শর্ত পূর্ণ করে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' বা আল্লাহর পথে জিহাদ তথা আন্দোলন সংগ্রাম করে। যারা এ শহীদি মৃত্যু লাভ করে তাদের মর্তবা বা মর্যাদা যে কত উচ্চ মানের যা মহান আল্লাহ তা'লা স্বয়ং নিজেই বর্ণনা করে সূরা আল বাকারার ১৫৪ নং আয়াতে উল্লেখ করে বলেন, "আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না।" অনুরূপভাবে আরো বিস্তারিতভাবে সূরা আল ইমরানের ১৬৯ থেকে ১৭২ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহপাক বলেন,"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও রিযিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা কিছু তাদেরকে দান করেছেন তাতে তারা আনন্দিত। আর যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্যও তারা আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ তাদের কোন ভয় নেই এবং কোন চিন্তা ভাবনাও নেই। তারা আল্লাহর নিয়া'মত ও অনুগ্রহের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে এ কারণে যে, আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।"

আল ইমরানের এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'লা শহীদদের চারটি মর্যাদার কথা বর্ণনা করেছেন। ১ম হলোঃ তারা অনন্ত জীবন লাভ করবে। ২য় হলোঃ তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিকপ্রাপ্ত হবেন। ৩য় হলোঃ তারা সদা-সর্বদা আনন্দমুখর থাকবে। ৪র্থ হলোঃ তারা যেসব মু'মিন ভাইদের দুনিয়ায় ছেড়ে গেছেন তাদের জন্যও আনন্দ প্রকাশ করবে এজন্য যে তারাও দুনিয়াতে জিহাদে বা আন্দোলন-সংগ্রামে নিয়োজিত আছে এবং তারাও জিহাদ করতে করতে একদিন শহীদ হয়ে এসব উন্নতমানের নিয়ামত ও অতি উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। এ আয়াতগুলো ওহুদ যুদ্ধে শহীদদের উদ্দেশে নাযিল হলেও এর হুকুম (নির্দেশ) আ'ম বা সাধারণ। এ উভয় শ্রেণীর শহীদদের বিষয়ে হাদীস বর্ণনা রয়েছে।

ওহুদ যুদ্ধে শহীদদের জন্য উন্নতমানের নিয়া'মত এবং অতি উচ্চ মর্যাদার কথা খাসভাবে এ আয়াত নাযিল হয়েছে বলে হাদীস পাওয়া যায়। যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) তাঁর সাহাবাগণকে বললেন, যখন তোমাদের ভাইয়েরা ওহুদ যুদ্ধের দিন শহীদ হলো, তখন আল্লাহ তাদের রূহসমূহ

www.icsbook.info

সবুজ বর্ণের পাখির ভিতরে রাখলেন। এ অবস্থায় তারা জান্নাতের নহরগুলোর উপরে এসে জান্নাতের ফলসমূহ খায় এবং আরশের নিচে লটকানো স্বর্ণের ঝাড় বাতির নিকটে এসে থাকে। সুতরাং যখন তারা তাদের উত্তম খানা, উত্তম পানীয় ও উত্তম বাসস্থান পেল তখন বললো, "কে আমাদের জীবিত ভাইদের নিকট আমাদের পক্ষ থেকে এ সুসংবাদ পৌঁছে দিবে যে, আমরা জান্নাতে জীবিত আছি। আর যেন দুনিয়ার জীবিত মুসলিম ভাইয়েরা জান্নাত হাসিল করার জন্য অমনোযোগী না হয় এবং যুদ্ধের সময় যেন তারা অলসতা ও কাপুরুষতা না দেখায়।" তখন আল্লাহ তা'লা বলেন, আমি তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের নিকট এসংবাদ পৌঁছে দিব। এরপর আল্লাহ সূরা আল ইমরানের উপরোক্ত এ আয়াত নাযিল করেন।

উপরোক্ত এ আয়াতের হুকুম আ'ম বা সাধারণ যাতে যুগ যুগ ধরে সকল শহীদগণ উন্নতমানের নিয়া'মত ও অতি উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন। রাবী হযরত মাসরুক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর নিকট সূরা আল ইমরানের এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, আমরা এ আয়াত সম্বন্ধে রাসূল (সাঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি বললেনঃ শহীদদের রূহসমূহ সবুজ বর্ণের পাখিগুলোর ভিতরে রাখা হয়, তাদের জন্য আরশের নিচে ঝাড়বাতিসমূহ লটকানো রয়েছে। তারা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা ভ্রমণ করে থাকে। অত:পর তারা এ বাতিসমূহের নিকটে এসে থাকে। এরপর তাদের রব তাদের দিকে ভালভাবে উঁকি দিয়ে দেখেন ও বলেন তোমরা কি আর কোন জিনিসের খাহেশ করো? তারা উত্তরে বলে, আমরা আর কোন জিনিসের খাহেশ করবো অথচ আমরা এত সুন্দর অবস্থায় আছি যে, জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই ভ্রমণ করে থাকি। এরপর আল্লাহ তা'লা তাদেরকে তিনবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। এ অবস্থায় তারা দেখে যে, তাদেরকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত রাখা হচ্ছে না তখন তারা বলে, হে আমাদের রব! আমরা ইচ্ছা করি যে, আমাদের রূহসমূহ পুনরায় আমাদের শরীরে প্রবেশ করে দুনিয়াতে আবার পাঠানো হোক, আমরা আপনার রাস্তায় যুদ্ধ করে দ্বিতীয়বার শহীদ হয়ে আসি। যখন আল্লাহ দেখেন যে, তাদের আর কোন প্রয়োজন নেই তখন তাদেরকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকেন।" (সহীহ মুসলিম, মিশকাত)

যুগে যুগে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারকারীদের প্রতিদান সম্পর্কে বলতে গিয়ে সূরা আল ইমরানের ১৯৫নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, "তাদের রব তাদের দোয়া এই বলে কবুল করে নিলেন যে, (দ্বীনের জন্য) কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই নষ্ট করি না। তা সে পুরুষ হোক কিংবা হোক সে নারী। তোমরা পরস্পর এক। তারপর সেসব লোক যারা হিজরত করেছে, তাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যারা লড়াই করেছে ও নিহত (শহীদ) হয়েছে, অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে মন্দ কাজগুলি দূর করে দিব এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবো এমন জান্নাতে যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। এই হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম প্রতিদান।"

www.icsbook.info

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে আন্দোলন করতে যেয়ে যদি কেউ নিজের ঘরবাড়ি ত্যাগ করে শহীদ হয়ে যায় অথবা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে, তবে আল্লাহ তাদের পছন্দমতো প্রতিদান দিবেন। এই মর্মে সূরা আল হজ্ব এর ৫৮ ও ৫৯ নং আয়াতদ্বয়ে মহান আল্লাহ বলেন, "আর যারা আল্লাহর রাস্তায় ঘর-বাড়ি ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত (শহীদ) হয়েছে অথবা (স্বাভাবিকভাবে) মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উত্তম রিযিক দান করবেন। আল্লাহ হলেন সর্বোৎকৃষ্ট রিযিক দাতা। আর তাদেরকে এমন এক স্থানে প্রবেশ করাবেন যাকে তারা পছন্দ করে। আর আল্লাহ তো মহাজ্ঞানী, সহনশীল।"

শহীদের বাসস্থান সম্পর্কে হযরত সামুরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন, আমি আজ রাতে স্বপ্নে দেখলাম। দু'জন লোক (ফিরিশতা) এসে আমাকে গাছের উপর উঠিয়ে এমন এক অতি উত্তম ও সুন্দর ঘরে নিয়ে গেল যার থেকে উত্তম ঘর আমি আর কখনও দেখিনি। তারা বললো, এ ঘর হলো শহীদগণের ঘর।" (সহীহ আল বুখারী)

আল্লাহর দ্বীনের পথে শহীদেরা তাদের মর্তবা এতো বেশী অনুভব করবে যে, যখন তারা শহীদ হবে এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য বলা হবে, তখন তারা দুনিয়ায় রেখে যাওয়া মুমিন ভাইদের জন্য আপসোস করবে। এমর্মে সূরা ইয়াসীন এর ২৬ ও ২৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

"(শহীদ হবার সাথে সাথে) তাকে বলা হবে জান্নাতে প্রবেশ করো। তখন সে আফসোস করে বলবে হায়, আমার জাতির লোকেরা যদি (আমার এই মর্যাদা সম্পর্কে) জানতে পারতো যে, আমার পরওয়ার দেগার আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং সম্মানিতদের দলভুক্ত করেছেন।"

স্বাভাবিক মৃত্যুর চেয়ে শাহাদাতের মৃত্যু এতই মর্যাদাপূর্ণ যে, স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) নিজেই একাধিকবার শহীদ হওয়ার জন্য কামনা করেছেন। এ সম্পর্কে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদিসে মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন "যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম করে বলছি, আমার কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় যে, আমি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাই। তারপর আবার জীবিত হই এবং আবার শহীদ হয়ে যাই। তারপর পুনরায় জীবিত হই এবং পুনরায় শহীদ হয়ে যাই।" (সহীহ আল বুখারী)

আল্লাহর দ্বীনের পথে শহীদ হওয়ার মর্তবা বা মর্যাদা এত বেশী উচ্চমানের যে শহীদ ব্যক্তি দশবার শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করবে। এ মর্মে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইরশাদ করেন। "জান্নাতে প্রবেশের পর একমাত্র শহীদ ছাড়া আর কেউই দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না। অথচ তার জন্য দুনিয়ার সবকিছুই জান্নাতে থাকবে। সে ফিরে এসে দশ দশ বার শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা করবেন। কেননা বাস্তবে সে শহীদের মর্যাদা সেখানে (জান্নাতে) দেখতে পাবে।" (সহীহ আল বুখারী)

www.icsbook.info

সরাসরি জান্নাত পাওয়ার লালসা মুমিনদের এত বেশী যে, তাৎক্ষণিকভাবে নিজের জীবন উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে দুনিয়ার ভোগকে ছুড়ে ফেলে শত্রুর মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে শহীদ হতে দ্বিধাবোধ করে না। এ সম্পর্কে হযরত আমর ইবনে দীনার (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন "ওহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করল, বলুন তো শহীদ হলে আমি কোথায় থাকবো? তিনি (সাঃ) বললেন, জান্নাতে থাকবে। তখন সে তার হাতের খেজুরগুলো (যা সে খাচ্ছিল) ছুড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেল।" (সহীহ আল বুখারী)

শহীদের মর্যাদা এতো বেশী ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন যে, শহীদের মায়েরা পর্যন্ত নিজের সন্তানকে আল্লাহর দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করতে আনন্দবোধ করতো। এ সম্পর্কে হযরত আনাস-ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, বারাআ'র কন্যা উম্মে রুবাই হারেসা ইবনে সূরাকার মা নবী করীম (সাঃ) এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী করিম (সাঃ) আপনি আমাকে হারেসা সম্পর্কে কিছু বলুন! হারেসা বদর যুদ্ধে অদৃশ্য তীরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সে (হারেসা) যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তাহলে আমি ধৈর্যধারণ করবো। আর তা না হলে তাঁর জন্য আমি অঝোরে কাঁদবো। তিনি (সাঃ) বললেন, হে হারিসার মা জান্নাতের অসংখ্য বাগান রয়েছে, আর তোমার পুত্র সেখানে সর্বোচ্চ জান্নাত "জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করেছে।" (সহীহ আল বুখারী)

শহীদদের শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে ৬টি মর্যাদার কথা হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত মিকদাদ ইবনে মা'দি কারিব (রাঃ) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন আল্লাহর নিকট শহীদের ৬টি উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। আর তাহলো-

১. প্রথম রক্তপাতেই তার গোনাহ সমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।
২. জান্নাতে তার স্থান তাকে দেখানো হবে।
৩. তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হবে।
৪. বড় বিপদ-আপদ থেকে সে নিরাপদ থাকবে।
৫. তার মাথায় আকর্ষণীয় ১টি মুকুট পরানো হবে। যার এক-একটি মনি, মুক্তা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা আছে তার চেয়েও উত্তম হবে। আর টানা টানা চোখবিশিষ্ট ৭২ জন হুরের সাথে তার বিয়ে দেওয়া হবে।
৬. তাকে তার ৭০ জন আত্মীয়-স্বজনের শাফায়াতের জন্য অনুমতি দেওয়া হবে। (মিশকাত)

যদি কেউ শাহাদাতের তামান্না রাখে। আর জিহাদ বা আন্দোলন-সংগ্রাম করতে যেয়ে দুশমনের হাতে আহত হয়ে শহীদ না হয়ে স্বাভাবিক ভাবে বিছানায় শুয়েও মারা যায় তবুও সে শহীদের পূর্ণ মর্যাদা লাভ করে। এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ্দাদ (রাঃ) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বনি উমাইয়া গোত্রের তিন ব্যক্তি নবী করিম (সাঃ) এর নিকট আসে ও ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি (সাঃ) উপস্থিত সবাইকে জিজ্ঞেস করেন, কে এই ৩জন (নব মুসলিম) এর মেহমানদারি করবে? হযরত তালহা (রাঃ)

www.icsbook.info

বললেন, আমি এদের দেখাশুনার ভার নেব। ফলে তারা তালহা (রাঃ) এর নিকট রয়ে গেল। পরে কোন এক সময় নবী করিম (সাঃ) তাদেরকে এক জিহাদে পাঠালেন। তাদের মধ্যে একজন মুজাহিদদের সঙ্গে যায় ও শাহাদাৎবরণ করে। তারপর দ্বিতীয় মুজাহিদ বাহিনী পাঠালেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাদের সঙ্গে যায় এবং সেও শাহাদাতবরণ করেন। তৃতীয় ব্যক্তি স্বাভাবিক ভাবে নিজের বিছানায় মৃত্যুবরণ করেন। হযরত তালহা (রাঃ) বলেন, আমি এই তিন ব্যক্তিকে (স্বপ্নে) জান্নাতের মধ্যে দেখতে পেলাম। যে ব্যক্তি নিজের বিছানায় স্বাভাবিক ভাবে মারা যায়, সে (জান্নাতে) তাদের সবার আগে ছিল। তারপরে দ্বিতীয় শহীদ এবং যে প্রথমে শহীদ হয়েছিল সে সবার পেছনে ছিল। তালহা (রাঃ) বলেন, একথায় আমার মনে খটকা লাগে, ফলে আমি হুজুর (সাঃ) নিকট উপস্থিত হয়ে এ স্বপ্নের কথা তাঁকে খুলে বলি। তিনি (সাঃ) বললেন, এতে তুমি অবাক হচ্ছ কেন? এটা তো খুবই পরিষ্কার কথা যে, যে মুমিন দীর্ঘ জীবন লাভ করবে সে আল্লাহর তাসবীহ্-তাহলীল- ও তাকবির দ্বারা উচ্চ স্থানই পাবে। অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তিও শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা রাখতো। কিন্তু মৃত্যু তাকে সেই সুযোগ দেয়নি। এ ধরনের লোককে শহীদের মধ্যে গণ্য করা হবে।"(তারগীব ও তারহীব,আহমাদ)

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, যদি কোন মুসলিম জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলনে জড়িত না থাকে তাহলে তার শহীদ হওয়ার কোনই সুযোগ থাকেনা। আন্দোলনের বাইরে থেকে তাসবীহ-তাহলীল, দো'আ-খায়ের করে শাহাদাতের আকাঙ্খা করে শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়া যায়না। বরং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা ইসলামী আন্দোলনে জড়িত থেকে শাহাদাতের তামান্না বা আকাঙ্খা করলেই তার স্বাভাবিক মৃত্যুতেও শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা পাওয়া যাবে। অতি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যু শাহাদাতের এই সুযোগ লাভের জন্য আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদ বা আন্দোলনে জড়িত থাকতে হবে। আর তাহলেই কেবলমাত্র শহীদ হওয়ার এই সুযোগ পাওয়া যাবে। আর এই সুযোগ লাভ করলেই আল-কুরআন এবং সহীহ হাদীসে বর্ণিত দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বোচ্চ সম্মানজনক মর্যাদা সে লাভ করবেন। হে আল্লাহ ! আমাদের (নারী-পুরুষ) সকলকেই দৃঢ়-মজবুত ঈমান ও খালেস নিয়তে তোমারই সন্তুষ্টি লাভের আশায় দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক থেকে অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন শাহাদাতের মৃত্যু দান করে নিয়ামতে পরিপূর্ণ সর্বোচ্চ জান্নাত "জান্নাতুল ফিরদাউস" দান কর। আমীন॥

লেখক : নায়েবে আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, খুলনা মহানগরী

www.icsbook.info

স্মৃতির পাতায়
বিমানের শাহাদাত

মাষ্টার শফিকুল আলম

শ্রমিক আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে নিজেকে দীর্ঘদিন ধরে সম্পৃক্ত রাখার ফলে লেখালেখিতে আমার অভ্যাস তেমনটি নেই বললেই চলে। বলতে গেলে আমার মত একজন রাজনৈতিক কর্মীকে দিয়ে কেবল ময়দানের কাজই সম্ভব, লেখালেখি নয়। তার পরেও শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল ভাইয়ের শাহাদাতের পর আমাকে বড় পীড়া দিয়েছিল। সে সময় তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে দায়িত্বশীলদের অনুরোধে আমাকে একটি লেখা তৈরি করতে হয়েছিল। যা ছিল নিতান্তই আমার নিজস্ব অনুভূতি। দীর্ঘদিন পর আবার ইসলামী ছাত্রশিবিরের মহানগর সভাপতি মু. সাইদুর রহমান ও সেক্রেটারি আজিজুল ইসলাম ফারাজীর অনুরোধে খুলনার ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের প্রথম শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমানের ওপর লেখা দিতে হবে। তাদের অব্যাহত অনুরোধের পর লিখতে বসেই ভেবে পাচ্ছিলাম না যে, কোন দিক থেকে লেখা শুরু করি। কারণ আমিনুল ইসলাম বিমানের শাহাদাতের সময় খুলনা মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারির দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। ফলে আমাকে বেশ কাছ থেকেই সবকিছু অবলোকন করতে হয়েছিল। বলতে গেলে আমার হাতের ওপরই বিমানের শাহাদাৎ। তার স্মৃতি ও কর্মচঞ্চলতা আমাকে আজও কাঁদায়।

ব্যক্তিগতভাবে আমি ছাত্রজীবনে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত না পেলেও মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া যে, ১৯৭৫ সালে বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পেয়ে ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান এবং কোরআনের সমাজ কায়েমের চেষ্টা করা যে ঈমানী দায়িত্ব এ অনুভূতি আমাকে ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সহায়তা করেছে। পাশাপাশি ইসলামী ছাত্রশিবিরের উদীয়মান যুবকদের

www.icsbook.info

দাওয়াতী ময়দানে বাতিলদের মোকাবেলায় শাহাদাতের তামান্না নিয়ে কাজ করার মানসিকতা দেখে আমার আফসোস হচ্ছে কেন ছাত্রজীবনে দাওয়াত পেলাম না!

যাই হোক, এভাবে কর্মজীবনে এসে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পেয়ে যখন আমি আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলাম, তখন এক পর্যায়ে ১৯৯১ সালে মহানগরী জামায়াতের সেক্রেটারির দায়িত্ব এসে পড়ে আমার ওপর। ওই সময় আমাদের প্রিয় নেতা, ভাষাসৈনিক অধ্যাপক গোলাম আযমকে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা প্রকাশ্যে যখন আমীরে জামায়াত হিসেবে ঘোষণা করে তখন ঘাদানিক নামের তথাকথিত একটি সংগঠন গণ-আদালতের নামে দেশব্যাপী নৈরাজ্য শুরু করে। এমনকি আমীরে জামায়াতের চরিত্র হনন করে তার সম্পর্কে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকে। এমনকি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর বক্তব্য ও বিকৃত ছবি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও হ্যান্ডবিল/পোস্টারিংয়ের মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্তি করার চেষ্টা করে। এ অবস্থায় জামায়াতে ইসলামী সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের জীবনীর ওপর বুকলেট প্রকাশ করে তা বুদ্ধিজীবী ও সুধীমহলে প্রচার করা হবে। তৎকালীন নগর জামায়াতের আমীর সিদ্ধান্ত দেন যে, এই প্রচারণা আমরা প্রথমেই আইনজীবী এবং বিজ্ঞ বিচারকবৃন্দের মধ্যে বিতরণের মধ্য দিয়েই শুরু করতে চাই। ওই সিদ্ধান্তের আলোকেই আমরা কয়েকজন বুকলেট নিয়ে খুলনার কোর্ট এলাকায় রওয়ানা হই। এসময় শিবির নেতা আমিনুল ইসলাম বিমান আমাদের সাথে ছিল। শুধু সাথেই ছিল না বুকলেট বিতরণে তার ভূমিকা ছিল অগ্রণী ও সাহসী। প্রথমে যখন আমরা কোর্ট প্রাঙ্গণে বুকলেট বিতরণ শুরু করি তখন একজন ঘাদানিক আইনজীবী বিমানের ওপর আক্রমণ করে। হামলায় আমিনুল ইসলাম বিমান আহত হলে আমরা বুকলেট বিতরণ বন্ধ করে তাকে নিয়ে জামায়াত অফিসে ফিরে আসি। পরে অন্যান্য স্থানে আবারও বুকলেট বিতরণ শুরু করি এবং তখনও বিমানের মধ্যে ছিল অন্যরকম প্রাণচাঞ্চল্য। পবিত্র মাহে রমজান মাস থাকায় ওইদিন পুরোটা দিনই আমাদের সাথে বিমান জামায়াত অফিসে সময় কাটায়। আমাদের সাথে ইফতারিও করে। ইফতারির পর আমাকে বলে যে, আমি শিবির অফিসের দিকে যাচ্ছি। আমি বললাম, ওই জায়গাটা কিন্তু খুবই রিস্ক। শুনছি ঘাদানিকরা আওয়ামীলীগ অফিসে জড়ো হচ্ছে। যে কোন সময় কোন অঘটন ঘটাতে পারে। আমি তাকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেই। ঠিক সেই মূহুর্তে খালিশপুর থেকে খবর আসে যে, আওয়ামী ঘাদানিকরা শ্রমিক কল্যাণ অফিসে হামলা চালিয়েছে। হামলায় আমাদের কয়েকজন ভাই আহত হয়েছেন। যাদেরকে ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। এ সময় নগর আমীর আনসার ভাই সাংবাদিক বেলাল ভাইকে নিয়ে আমাকে খালিশপুরে যাবার জন্য বললেন। বেলাল ভাইকে নিয়ে আমি রিক্সাযোগে ডাকবাংলা পর্যন্ত যেতেই দেখি ঘাদানিকরা দলে

www.icsbook.info

দলে রিক্সাযোগে আওয়ামী লীগ অফিসের দিকে যাচ্ছে। তখনই আমার আশংকা হল যে, এরা কিছু ঘটাতে পারে। বেলাল ভাইকে বললাম ওরা হয়ত এবার খুলনা অফিসে আক্রমণ করবে। বেলাল ভাই বললেন, আমাদের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে খালিশপুর যাওয়ার। সুতরাং আমরা খালিশপুরেই যাই। এরপর দু'জনে বেবিট্যাক্সিযোগে খালিশপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সেখানে পৌঁছে দেখা গেল এক বিভীষিকাময় দৃশ্য। আহত সকলের চেহারায় একটি উদগ্রীব ভাব। ততক্ষণে সেখানে পুলিশও আসে। এরই মধ্যে পুলিশের ওয়াকিটকি থেকে আওয়াজ আসল যে, খুলনায় জামায়াত অফিসে আক্রমণ হয়েছে। তখন মোবাইল ছিল না। যে কারণে আমরা খালিশপুরের আলহাজ্ব নূর আলী চৌধুরীর বাসা থেকে টেলিফোনে জানলাম শিবির অফিসে আক্রমণ হয়েছে এবং সেখানে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। আহত শিবির নেতা আমিনুল ইসলাম বিমানকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। বেলাল ভাই তার সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালনের জন্য সেখানে ছুটে যান। ওইদিন গভীর রাতে আমি যখন খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাই তখন শ্রমিক কল্যাণ অফিসে যারা আহত হয়েছিল তাদের মধ্যে আবু জাফর ভূইয়া ও আবু তাহেরের অবস্থা খুবই আশংকাজনক দেখা গেল। এর কিছুক্ষণ পরই খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, বিমান শহীদ হয়েছে। শাহাদাতের খবর পাওয়ার পরও শহীদ বিমানের সঙ্গী-সাথীরা সেদিন চরম ধৈর্য ও শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়েছিল। খুলনার ইতিহাসে তা একটি বিরল ঘটনা।

> শিবির নেতা আমিনুল ইসলাম বিমান আমাদের সাথে ছিল। শুধু সাথেই ছিল না বুকলেট বিতরণে তার ভূমিকা ছিল অগ্রণী ও সাহসী। প্রথমে যখন আমরা কোর্ট প্রাঙ্গণে বুকলেট বিতরণ শুরু করি তখন একজন ঘাদানিক আইনজীবী বিমানের ওপর আক্রমণ করে। হামলায় আমিনুল ইসলাম বিমান আহত হলে আমরা বুকলেট বিতরণ বন্ধ করে তাকে নিয়ে জামায়াত অফিসে ফিরে আসি। পরে অন্যান্য স্থানে আবারও বুকলেট বিতরণ শুরু করি এবং তখনও বিমানের মধ্যে ছিল অন্যরকম প্রাণচাঞ্চল্য।

আমার জানামতে খুলনার ছাত্র ইসলামী আন্দোলনে বিমানই হচ্ছে প্রথম শহীদ। আমি জেনে আরও অবাক হয়েছি যে, তার পিতৃ জন্মস্থান গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। তার পরিবারের সবাই আওয়ামী ঘরানার লোক। বিমান নিয়মিত তাহাজ্জুত নামায পড়ত এবং এলাকার দলমত নির্বিশেষে সকলের কাছে একজন

www.icsbook.info

আদর্শ, চরিত্রবান ছাত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই আদর্শবান ছাত্রটি কার দাওয়াতে ইসলামী আন্দোলনে এসেছিল এ বিষয়টি খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, সাংবাদিক বেলাল ভাইয়ের দাওয়াতেই তিনি ইসলামী আন্দোলনে এসেছিলেন। আমার জানামতে সাংবাদিক বেলাল ভাই তার ছাত্রজীবনে দাওয়াত দিয়ে তার সোহবাতে যাদেরকে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিল সাহসী, মেধাবী ও স্ব স্ব ক্ষেত্রে যোগ্য।

যাই হোক, সেদিন রাতেই বাংলাদেশ বেতার থেকে সরকার ঘোষণা দেয় যে, আমাদের প্রিয় নেতা, ভাষাসৈনিক অধ্যাপক গোলাম আযমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একদিকে খালিশপুরে শ্রমিক কল্যাণ অফিসে হামলা, এরপর খুলনা শিবির অফিসে হামলা ও আমিনুল ইসলাম বিমানের শাহাদাত এবং সর্বোপরি আমীরে জামায়াত গোলাম আযমের গ্রেফতার এসব মিলিয়ে ওই রাত আমার জীবনে একটি কালো অধ্যায় হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আমীরে জামায়াতের গ্রেফতারে যেমন সারা বিশ্বে এবং দেশের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের আহত করে তেমনি তার সাথে বিমানের শাহাদাত বেদনাকে আরও মর্মাহত করে।

সংগঠনের সিদ্ধান্তে পরদিন সুশৃঙ্খলভাবে শহীদ হাসিদ পার্কে জানাজা এবং পরে শহীদ বিমানের লাশ নগরীর বসুপাড়া কবরস্থানে দাফন করা হল। হাজার হাজার লোক তার জানাজায় অংশ নিয়ে এ ধরনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছিল। কিন্তু বিমানের শাহাদাতের ২০ বছর পূর্ণ হলো। আজ আমাকে একথা অত্যন্ত বেদনার সাথে বলতে হচ্ছে যে, এ পর্যন্ত যতগুলো সরকারই ক্ষমতায় এসেছে বিমানের খুনীদের কেউই গ্রেফতার করতে পারেনি বরং ২০ বছর পরে এসে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার বিমান হত্যা মামলাটি রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রত্যাহার করে নিয়েছে। যা অত্যন্ত দুঃখজনক। ঘটনাটি বিমানের সাথীদের হৃদয়কে ব্যথিত করেছে। যে কারণে শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমানের হত্যার বিচার আজ মহান আল্লাহর দরবারেই কামনা করছি। আরও দোয়া করি আল্লাহ তুমি আমার প্রিয় শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমানকে শাহাদাতের মর্যাদা দান কর এবং তার সাথী সঙ্গীদেরকে এদেশের কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠা করায় সর্বস্ব ত্যাগ ও কুরবানী দানের তৌফিক দান কর।

লেখক ঃ নায়েবে আমীর, খুলনা মহানগরী, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

www.icsbook.info

জান্নাতের সবুজ পাখি

মোঃ মাহফুজুর রহমান

হক এবং বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। আলো ও আঁধারের অস্তিত্ব কখনও একসাথে থাকতে পারে না। দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতায় যুগে যুগে নবী ও রাসূলদের এবং তাঁদের অনুসারীদের তৎকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠিত কায়েমি স্বার্থবাদী মহলের এবং রাষ্ট্রশক্তির রোষানলে পড়তে হয়েছে। সত্যের সেনানীদের অবর্ণনীয় দুঃখ, কষ্ট নির্যাতন এবং নিষ্পেষণের শিকার হতে হয়েছে, এমনকি নিজের জীবনকে আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়ে শাহাদাতের অমিয় পেয়ালা পান করতে হয়েছে অনেককে। খানজাহানের পুণ্যভূমি খুলনা মহানগরীর দ্বীনের বাগান যাদের রক্তে সিক্ত হয়েছে সেই সব শহীদ ভাইয়েরা আমার খুবই কাছের মানুষ। আজও আমি একান্ত নিভৃতে একাকী চোখ বন্ধ করে তাঁদের সচল কর্মতৎপরতা দেখতে পাই যা আমার জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক। দীর্ঘদিন একসাথে চলার কারণে তাঁদের হাজারও কথা এবং তথ্য ভাণ্ডার থেকে দ্বীনি আন্দোলনের কর্মীদের অনুপ্রেরণা দিতে পারে সেই আশায় নিম্নে ৪ জন ভাইকে বিশেষভাবে স্মরণ করছি। (উল্লেখ্য শহীদ বেলাল ভাইয়ের উপর লেখা শহীদ বেলাল স্মারক গ্রন্থে আছে)

শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান: খুলনার ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের ১ম শহীদ বিমান ভাই। আমার বেশ আগে তিনি সাথী শপথ নিয়েছিলেন আওয়ামী পরিবার থেকে সংগঠনে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। ময়দানে তাঁর সাহসী এবং আপসহীন ভূমিকা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস ছিল। সাবেক আমীরে জামায়াত প্রফেসর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিলের দাবিতে ঘাদানিক এবং বামপন্থীদের তথাকথিত আন্দোলন চলছিল। তারা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উপর আঘাত হানছিল। শহীদ বিমান ভাই তাদের হাতেই ১ম শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতের দিন একই সাথে তারের

www.icsbook.info

পুকুর মসজিদে আসরের নামাজ শেষে বিমান ভাই আমার নিকট থেকে পকেট চিরুনি নিয়ে মাথার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ঘাদানিকদের দ্বারা ঐদিন কোট চত্বরে আমাদের রিক্সা শ্রমিক নেতা শহীদ ভাই এর উপর হামলা এবং তাকে উদ্ধারের ঘটনা বলছিলেন। কে জানত আর কিছুক্ষণ পরই ঐ পাষন্ডরা আমাদের বিমান ভাইয়ের জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিবে। তখন ছিল রমজান মাস। আমাদের শান্তিধাম মোড়ের অফিসে তৎকালীন মহানগরী সভাপতি জি.এম ইলিয়াস ভাই, বিমান ভাই সহ আমরা আরো অনেকে ইফতার শেষে মাগরিবের নামাজ আদায় করি। আমার পরীক্ষা থাকার কারণে ইলিয়াস ভাই এর নিকট থেকে ছুটি নিয়ে বি.এল কলেজে আসার কিছুক্ষণ পরেই জানতে পারি যে, ঘাদানিকরা শিবির অফিসে হামলা চালিয়েছে এবং আমাদের বিমান ভাই মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন, তাকে ২৫০ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাত ১১টার পর দৌলতপুর কলেজের (ডে/নাইট) ভি.পি.কামরুজ্জামান মিঠু ভাই কান্নাজড়িত কণ্ঠে আমাকে বিমান ভাই এর শাহাদাতের খবর জানালেন। শাহাদাতের খবর শুনে সেদিন বি.এল. কলেজের হলগুলোতে বিমান ভাইয়ের সাথীদের মধ্যে কান্নার যে রোল পড়ে গিয়েছিল তা সারাজীবন আমার মনে থাকবে। জানাজা অনুষ্ঠানে বিমান ভাইয়ের পিতার বক্তব্য সকলকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। তিনি বলেন, "আমার সন্তান হারানোর চেয়ে ওদের ভাই হারানোর বেদনা আমার কাছে বেশী মনে হচ্ছে"। বিমান ভাইয়ের শাহাদাতের পরে বেরিয়েছে কর্মময় জীবনের অনেক ঘটনা। একজন ভিখারী বিমান ভাইয়ের নিকট একটি লুঙ্গি চেয়েছিল বিমান ভাই তার নতুন লুঙ্গিটি ভিখারীকে দান করে দিয়েছিলেন। এই নিয়ে তার পিতার নিকট বকা শুনতে হয়েছিল। তিনি ২টি টিউশনি করে তার ১টি টিউশনির টাকা আন্দোলনের কাজে এবং অভাবীদের জন্য ব্যয় করতেন। বিমান ভাইয়ের মত নিবেদিতপ্রাণ হয়ে ত্যাগ কুরবানীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলে দ্বীনি আন্দোলন আরো বেগবান হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বিমান ভাইকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান করে নিন।

২। শহীদ মুন্সী আঃ হালিম ঃ যার সুললিত কণ্ঠের কুরআন তেলাওয়াত অনেকের হৃদয় স্পর্শ করত, যার মুখ থেকে প্রায় শোনা যেত "আজো সেই কুরআন আছে, হাদীস আছে সেই ঈমান আর মানুষ নেই" এই গানের চরণ। তিনি আমাদের একান্ত প্রিয় ভাই শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম ছাড়া আর কেউ নয়। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ হায়েনাদের পৈশাচিকতার বীভৎস রূপ দেখে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল গোটা জাতি। তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের ভাড়াটিয়া গুন্ডা বাহিনী এবং ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীরা বি.এল. কলেজের মসজিদের মধ্যে নির্মমভাবে কুপিয়ে রক্তাক্ত করেছিল মুন্সী আব্দুল হালিমকে। হালিম ভাই পানি পান করতে চাইলে পাষণ্ডরা তাঁকে পুকুরের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। সেখান থেকে তাকে উঠিয়ে মসজিদের পাশে গাছের নিচে গলায় ছুরি চালিয়ে পশুর মত জবেহ করে ওরা আনন্দ উল্লাস করেছিল। তাদের ধারণা ছিল বি.এল. কলেজের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর প্রাণপ্রিয় নেতা ছাত্রসংসদের জি.এস. মুন্সী আব্দুল হালিমকে হত্যা করলে ছাত্রশিবির দুর্বল হয়ে যাবে কিন্তু তা হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ ছাত্রশিবির সেখানে

www.icsbook.info

পূর্বের তুলনায় সার্বিকভাবে আরো অনেক বেশী শক্তিশালী হয়েছে। শাহাদাতের সময় মুন্সী আব্দুল হালিম ভাই বি.এল.কলেজ সভাপতি ছিলেন, আমি সেক্রেটারি ছিলাম এবং শহীদ আবুল কাশেম পাঠান সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। আমিও ঐদিন গুলিবিদ্ধ হয়েছিলাম। জানি না আল্লাহ আমাকে কেন বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমার প্রিয় সাথীদের হারানোর বেদনা নিয়েই হয়ত আমাকে বাকিটা জীবন কাটাতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা সমাধানে এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে বি.এল. কলেজে যত কাজ হয়েছে সেখানে হালিম, কাশেম ও রহমত ভাইয়ের হাতের ছোঁয়া আজো পরিলক্ষিত হয়। যত দিন বি.এল. কলেজ থাকবে, মসজিদের ঐ সুউচ্চ মিনার থাকবে, পুকুর থাকবে, ততদিন সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে তাদের প্রিয় জি.এস. মুন্সী আব্দুল হালিমকে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা শাহাদাতের তামান্নায় উজ্জীবিত হয়ে দুর্বার গতিতে কাজ করার অনুপ্রেরণা পাবে। আল্লাহ আমার প্রিয় সভাপতিকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন।

৩। **শহীদ শেখ রহমত আলী ঃ** রহমত ভাই ছিলেন আমার প্রিয় রুমমেট। লেখাপড়ার দিক দিয়ে ২ বছরের সিনিয়র হলেও বয়সের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন আমার থেকে আরো বড়। পারিবারিক সমস্যার কারণে অনেক দেরিতে স্কুলে গিয়েছিলেন। ছোট থাকতেই অন্যের বাড়িতে লজিং থেকে কঠোর পরিশ্রম করে লেখা-পড়া করতেন। অনার্স পড়াকালীন তিনি বি.এল. কলেজের হলে থাকতেন। রহমত ভাইয়ের হাসি সকলের মন কেড়ে নিত। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট এবং তার নিজ এলাকায় লোকদের নিকট খুব জনপ্রিয় ছিলেন। এলাকার লোকজন মাঝে মাঝে এসে আমাদেরকে বলতেন আমরা রহমতকে আমাদের ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বানাবো। আমরা তাদেরকে রহমত ভাইয়ের ছাত্রজীবন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলতাম। রহমত ভাইয়ের কণ্ঠের সুমধুর আজানের ধ্বনি সকলকে মুগ্ধ না করে পারত না। হাজী মহসিন হলের মসজিদ উদ্বোধনের দিন তিনি সর্ব প্রথম আজান দিয়েছিলেন। আমি, রহমত ভাই, আব্দুর রহীম ভাই এবং মিলন ভাই মাঝে মধ্যে একসাথে রান্না করে খেতাম। আমাদের সাংগঠনিক ব্যস্ততার কারণে বেশীর ভাগ সময়ে রহমত ভাই-ই রান্না করতেন। দায়িত্বশীলদের তিনি অনেক বেশি ভালোবাসতেন। এক রাতের ঘটনা আমরা প্রোগ্রাম সেরে অনেক রাতে ফিরে দেখলাম রহমত ভাই ঐ রাতে যেকোন কারণেই হোক রান্না করেননি। বাইরের পরিবেশ ভালো না থাকার কারণে হোটেলেও যেতে পারলাম না। অগত্যা না খেয়েই শুয়ে থাকলাম। দায়িত্বশীলরা না খেয়ে শুয়ে পড়ার কারণে রহমত ভাই নিজেকেই অপরাধী বলে মনে করলেন। রাত্র আনুমানিক ১.৩০ মিনিটের দিকে রহমত ভাইয়ের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি বললেন, মাহফুজ ভাই উঠে খেয়ে নেন আমি আপনাদের জন্য রান্না করেছি। যদিও উঠতে কষ্ট হচ্ছিল তারপরও না উঠলে রহমত ভাই কষ্ট পাবেন সে কথা চিন্তা করে ভাত খেয়ে আবার শুতে গেলাম। রহমত ভাই সেদিন প্রমাণ করে দেখিয়েছেন রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও দ্বীনের সম্পর্কের কারণে একজন ভাইকে কতবেশি ভালোবাসা যায়।

www.icsbook.info

বি.এল. কলেজে প্রায় সব সময়ে টেনশন লেগে থাকত। সারা রাত জেগে আমাদের হল পাহারা দিতে হতো। একদিন রাতে টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে। কর্মী সাথী ভাইকে প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। কাউকে ডাকা ভালো মনে করলাম না। রহমত ভাই এবং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম রহমত ভাই রাত- ১টা পর্যন্ত এবং আমি সকাল পর্যন্ত হল পাহারা দিব। কোন আপত্তি ছাড়াই শুধুমাত্র ছাত্র আন্দোলনের প্রয়োজনে আমার এই ভাইটি হল পাহারা দিতে চলে গেলেন।

ছাত্রজীবনের শেষ পর্যায়ে এসে রহমত ভাই সংগঠনের সদস্যপ্রার্থী হয়েছিলেন। কুরআন শুদ্ধ করে পড়ার ব্যাপারে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রতিদিন সকালে তাঁকে নিয়ে কিছুক্ষণ সহীহ শুদ্ধ করে পড়ার অনুশীলন সম্পন্ন করেই আমি আমার নিজের অধ্যয়ন শুরু করতাম। আমার এই প্রিয় ভাইটি দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। ২০ সেপ্টেম্বর সংগঠনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা যখন ক্যাম্পাস ছেড়ে দিয়ে বাইরে চলে আসছিলাম তখন রহমত ভাই তিতুমীর হলে অবস্থানরত ছাত্রদের বাইরে চলে যাওয়ার জন্য সতর্ক করতে যেয়ে নিজেই হলের মধ্যে আটকা পড়ে গেলেন। নরপিশাচের দল ছাত্রসংসদের সাহিত্য সম্পাদক ও বি.এল. কলেজ ক্যাম্পাস সভাপতি রহমত ভাইকে একের পর এক রামদার ৩২টি কোপ দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছিল। তারা তার স্পাইনাল কর্ড কেটে দিয়েছিল। তিতুমীর হলের বাথরুমের দেয়ালের গায়ে শহীদ রহমতের রক্তের ছোপছোপ দাগ এখনো আছে। হায়েনার দল রহমত ভাইকে শিয়াল কুকুরের মত পা ধরে টানতে টানতে বি.এল. কলেজের ২য় গেট পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল। উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকাতে পাঠানো হলে ২রা অক্টোবর '৯৩ তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন। রহমত ভাইয়ের বৃদ্ধা মা, ভাই-বোনেরা এবং আমরা আজও তার অভাব বোধ করছি। আল্লাহ রহমত ভাইকে তার প্রিয় বান্দাদের কাতারে শামিল করে নিন।

৪. শহীদ আবুল কাশেম পাঠান: বি.এল কলেজের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর প্রাণপ্রিয় নেতা শহীদ আবুল কাশেম পাঠান। যিনি সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে ছাত্র সংসদের এ.জি.এস নির্বাচিত হয়েছিলেন। তার আকর্ষণীয় চরিত্রের এবং অপরকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আপন করে নেয়ার যে যোগ্যতা আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন তার তুলনা করা চলে না। কোন ছাত্রের সাথে একবার পরিচয় হলে ঐ ছাত্র কাশেম ভাইয়ের পিছু ছাড়ত না। আর এ কারণেই কাশেম ভাইকে 'হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা' বলা হতো। খুলনা শহরের বসুপাড়াতে কাশেম ভাইয়ের বাড়ি ছিল। এলাকার বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। ভবিষ্যতে জন প্রতিনিধি হিসেবে এলাকাবাসীর সেবা করবেন এটাই অনেকের ভাবনা ছিল। কাশেম ভাই স্থানীয় পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন যার কারণে সাংবাদিক মহলসহ খুলনার অনেক গুনীজণের স্নেহভাজন ছিলেন তিনি। তার শাহাদাতের পর অনেকের সহানুভূতিশীল মন্তব্য থেকেই এ কথা জানা যায়। হালিম এবং আমান উল্লাহ আমান ভাইয়ের শাহাদাতের ঠিক ১ বছর ১ মাস ৩ দিন পর ১৯৯৪ সালের ২৩ অক্টোবর সরকারি

www.icsbook.info

সিটি কলেজের প্রধান গেটের সামনে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানানোর সময় তৎকালীন সরকারি দলের ছাত্রসংগঠনের রক্ত পিপাসু হায়েনারা কাশেম ভাইকে গুলি করে এবং তিনি ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতের সময় কাশেম ভাই বি.এল. কলেজের সভাপতি এবং ছাত্র সংসদের ভারপ্রাপ্ত জি.এস. এর দায়িত্ব পালন করছিলেন। (হালিম ভাইয়ের শাহাদাতের পর কাশেম ভাই একই সাথে এ.জি.এস. এবং ভারপ্রাপ্ত জি.এস. এর দায়িত্বে ছিলেন)। ঐ দিনের ঘটনা আমি তখন দৌলতপুর থানা শিবিরের সভাপতি। মহানগরী সভাপতি শেখ আব্দুল ওয়াদুদ ভাইয়ের নির্দেশে বি.এল. কলেজে টেনশন থাকার কারণে সেখানে যেতে হয়েছিল। কলেজে যেয়ে কাশেম ভাইয়ের সাথে সার্বিক বিষয়ে পরামর্শ করার পর আমরা কয়েকজন দর্শন ডিপার্টমেন্টে গেলে প্রফেসর বজলুল করিম স্যার আমাদেরকে আপ্যায়ন করালেন এবং কাশেম পাঠান ভাইকে ২টা কলা খেতে দিলেন। আমি বল্‌লাম স্যার আপনি কাশেম পাঠানকে ২টা কলা দিলেন কেন? স্যার রসিকতা করে বললেন কাশেম পাঠান একই সাথে এ.জি.এস. এবং ভারপ্রাপ্ত জি.এস. হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে বিধায় ২টা, কলা দিয়েছি। কলেজের পরিস্থিতি শান্ত থাকার কারণে দর্শন ডিপার্টমেন্ট থেকে বের হওয়ার পর কাশেম ভাই সিটি কলেজে চলে গেলেন এবং আমি হলে চলে গেলাম। এটাই কাশেম ভাইয়ের সাথে আমার শেষ দেখা। হলে যাওয়ার আনুমানিক ১ থেকে দেড় ঘন্টা পর কাশেম ভাইয়ের শাহাদাতের খবর জানতে পারলাম। বি.এল. কলেজের পরিবেশ ঠিক রাখার জন্য এ খবর ২/১ জন দায়িত্বশীল ছাড়া আর কাউকে না দিয়ে সবাইকে নিয়ে আমরা খুলনায় আসলাম এবং গরিব নেওয়াজ ক্লিনিক থেকে কাশেম ভাইয়ের লাশ বের করে রাজপথে মিছিল করলাম। একজন শহীদের লাশ নিয়ে মিছিল করার সময় কর্মীদের জযবা এবং আবেগ কেমন হতে পারে তা দেখার সুযোগ সেদিন হয়েছে। কাশেম পাঠান ভাইয়ের শাহাদাত পরবর্তী শোক র‍্যালিতে এত বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগম ঘটেছিল যা ইতঃপূর্বে কোন দিন হয়নি। বিমান, হালিম, আমান, রহমত, কাশেম পাঠান এবং শেখ বেলাল উদ্দিন আমাদের প্রেরণার বাতিঘর। ওরা জান্নাতে সবুজ পাখি হয়ে বিচরণ করছে এবং আল্লাহর কাছ থেকে রিজিক প্রাপ্ত হচ্ছে এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ওদের আর কোন অপরাধ ছিলনা। অপরাধ ছিল একটিই, আর তা হলো ওরা মহাপরাক্রান্ত স্ব-প্রশংসিত আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বকে ঘোষণা করেছিল। শহীদেরা মরে না। তাঁরা আমাদের হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের মানুষ এবং বাতিল শক্তির মোকাবিলায় জান-মাল কোরবানী করে সক্রিয় থাকার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। আল্লাহ শহীদদেরকে চির সবুজ রাখুন এবং শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমীন॥

লেখক : সাবেক কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক ও সাবেক সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, খুলনা মহানগরী।

www.icsbook.info

ফুটবার আগেই যে ফুল ঝরিয়ে দেয়া হলো

প্রফেসর মোঃ বজলুল করিম

মানুষ এ পৃথিবীতে আসে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং পুনরায় মৃত্যুবরণ করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। এ দু'টি ঘটনার মধ্যে একটি মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনে বহুকিছু করার আছে। জন্মের মধ্যেই যে মৃত্যুর বীজ লুকিয়ে থাকে একথা সকলেরই জানা। মহাকালের তুলনায় মানুষের জীবনকাল অতি সামান্য, বলতে গেলে সমুদ্রের তুলনায় একটি বিন্দুর চেয়েও কম। তথাপি এ স্বল্পকালীন স্থায়িত্বের মধ্যেও আদর্শ, সৎ, চরিত্রবান, মানব কল্যাণকামী ব্যক্তিরা স্মরণীয় কিছু রেখে যান।

১৯৬২ এর ২রা আগষ্ট থেকে ১৯৯৫-এর ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত অধ্যাপনারত থেকে বর্তমানে অবসর গ্রহণ পর্বে (এল,পি,আর) ছুটি ভোগ করছি। প্রায় শতাব্দীকালের ঐতিহ্যে লালিত দক্ষিণবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের গবেষণামূলক ইতিহাস রচনার প্রেক্ষিতে (১৯০২ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত) বহুমুখী তথ্য কণিকা সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাকে প্রয়োজন বশত অনেক অজানা অভিভাবক, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়েছে। কলেজ জীবনের সুদীর্ঘ ৯০ বছরে সংগৃহীত ঘটনা স্রোতের মধ্যে যেগুলো অত্যধিক বেদনাদায়ক, তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে অতি সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। এ উপলক্ষে আমি এদেশের ছাত্ররাজনীতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপরও আলোকপাত করতে চাই।

১৯৯৩ এর ২০শে সেপ্টেম্বর বি.এল. কলেজের ইতিহাসে একটি কালো দিন। এ দিনে কলেজের সবুজ চত্বরে এমন একটি ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে যা কলেজের অতীতের সকল ঘটনাকে ম্লান করে দিয়েছে। বি.এল. কলেজকে এমন মলিন অবস্থা ইতঃপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি। এদিন সন্ত্রাসীদের হামলার নির্মমভাবে নিহত

www.icsbook.info

হয় হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর নির্বাচিত প্রতিনিধি কলেজ ছাত্র সংসদের অতি সুযোগ্য জি.এস. মুন্সী আব্দুল হালিম। গুলিবিদ্ধ ও জবাই করা দু'টো পৈশাচিক ঘটনাই ঘটলো একটি ছাত্রের জীবনের উপর। এরূপ আঘাত সাধারণত দেখা যায় না। বি.এল. কলেজের একজন ছাত্রের রক্তে এই প্রথম সিক্ত হয় কলেজের সবুজ জমিন। ঐ দিন কলেজ চত্বরে মারাত্মকভাবে আহত হয় ছাত্রসংসদের সাহিত্য সম্পাদক রাষ্ট্রবিজ্ঞান এম.এস.এস. শ্রেণীর ছাত্র শেখ রহমত আলী, সংসদের সাবেক জি.এস. আব্দুর রহিম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মাকসুদুর রহমান মিলন, মাহফুজুর রহমান, হাফিজুর রহমান, মুশফিকুর রহমান মিঠু, দেলোয়ার হোসেন, আজিজুল হক সহ অনেকেই।

চিকিৎসা করে অনেকেই কোন রকমে বেঁচে আছেন। এখনো বিপদ কাটেনি কিন্তু বহু অর্থ ব্যয় করে চিকিৎসা করালেও বাঁচানো যায়নি শেখ রহমত আলীকে। ১৯৯৩ সালের ২রা অক্টোবর রহমত আলী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। কয়েক মাস কলেজের ক্লাসসমূহ বন্ধ থাকে, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। শিক্ষার পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়, কলেজের সম্পত্তি ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব পড়ে পুলিশ বাহিনীর উপর। সেই চরম অশুভ মুহূর্ত থেকেই অদ্যাবধি কলেজের পবিত্র অঙ্গন পুলিশ প্রহরারত। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক সবাই আতঙ্কিত কে, কখন বা কোথায় আততায়ীর আঘাতে প্রাণ হারাবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

১৯৯৪ সালের ২৩শে অক্টোবর। বেলা ৯টা ৪০ মিনিট। আমি ছাত্র-সংসদের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক আব্দুস সোবহান গোলদারসহ অন্যান্য সহকর্মীরা দর্শন বিভাগের চেয়ারে উপবিষ্ট। পুস্তকাদি ক্রয়সহ অন্যান্য খরচের হিসাব কষছিলাম। ছাত্রসংসদের ভারপ্রাপ্ত জি.এস. আবুল কাশেম পাঠান (মুন্সী আব্দুল হালিম নিহত হবার পর থেকে এ.জি.এস. আবুল কাশেম পাঠান ভারপ্রাপ্ত জি.এস. হিসেবে দায়িত্ব পালনরত ছিল), ছাত্র-সংসদের পত্রিকা সম্পাদক মু. মাসুদ আলম গোলদারসহ অন্যান্যরা দর্শন বিভাগের সেমিনার শিক্ষক কক্ষের দরজা বরাবর উপস্থিত হয়। আমি চোখ তুলে তাকাতেই কাশেম বিনীতভাবে বললো, 'স্যার, কেমন আছেন।' কথা বিনিময়ের পর তাদেরকে বসতে বললাম শিক্ষক কক্ষে, শিক্ষকদের চেয়ারে বসতে কিছুতেই রাজি না হয়ে পিওনের টুলে বসলো কাশেম পাঠান। ছাত্র সংসদের সমাজ কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসেবে আমাকে বলল, 'স্যার, এ বছর আরো গাছ লাগানো যায় না? কলেজ অঙ্গনে আপনার গাছ লাগানো ও পরিচর্যার বিষয়টি আমরা চিরদিন স্মরণ করবো। আমি মনে করি কাজও প্রার্থনা আপনার নিকট সমান।"

একথা বলতে বলতেই পিওন জাহিদুর রহমান মিষ্টি, কলা ও চায়ের ব্যবস্থা করলো। যথারীতি খেয়ে সে সসম্মানে আমাকে বলল, 'স্যার, খুলনায় যাব জরুরি কাজ আছে, আমাদের জন্যে দোয়া করবেন।' উঠে করমর্দন করেই তাদেরকে বিদায় দিলাম কিন্তু এ বিদায় যে চিরদিনের হবে তা তখন বুঝতে পারিনি। ঐ দিনই বেলা ১১টায় খুলনা সিটি কলেজের সামনে কাশেম পাঠান গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হবার ঘটনা বিশ্বাস হচ্ছিল

www.icsbook.info

না। বেদনায় খান খান হয়ে গেল আমার হৃদয়, এও কি সম্ভব! বি.এল. কলেজের আরো একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রকে চিরতরের জন্যে নিভিয়ে দেয়া হলো। অনেক সহকর্মীকে নীরবে চোখের পানি ফেলতে দেখেছি। শিক্ষক-কর্মচারীদের শোকসভায় সহকর্মীদের একবাক্যে বলতে শুনেছি, বড় ভাল ছেলে ছিল কাশেম পাঠান। বিধবা মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক-কর্মচারী, সহপাঠী, সহযোগী সকলকেই শোক সাগরে ভাসিয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে বিদায় করে দেয়া হলো।

একজন কাঠুরিয়ার বড় সম্পদ তার কুঠার, একজন কৃষকের গরু, লাঙ্গল এবং জমি। একজন শিক্ষকের কাছে সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে তার ছাত্র-ছাত্রী, পুস্তক, কালি ও কলম। ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন অবৈধভাবে ছিনিয়ে নিলে পিতা-মাতার ন্যায় তাদের শিক্ষকেরাও কম দুঃখ পান না। নিহত মুন্সী আব্দুল হালিম, শেখ রহমত আলী, আবুল কাশেম পাঠানের সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত। তারা যে কলেজের ছাত্র, আমি সে কলেজের একজন অধ্যাপক, তারা যে সময়ে ছাত্র সংসদের জি.এস., এ.জি.এস. এবং সাহিত্য সম্পাদক আমি সে সময়ে সমাজকল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক। কাজেই এদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিভিন্ন কাজ করার সুযোগ হয়েছে। এ সুযোগে এদের ও অন্যান্য সদস্যদের কর্মপদ্ধতি ও ব্যক্তিগত গুণের কথা জানতে পারি। এর কিছুকথা আমি তুলে ধরতে চাই। ইসলামী জীবন ধারায় উদ্বুদ্ধ মুন্সী আব্দুল হালিম ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষে বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিপুল ভোটে সাহিত্য সম্পাদক নির্বাচিত হয়। ১৯৯২-৯৩ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জি.এস. পদে নির্বাচিত হয় এবং সে সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (২০-৯-৯৩) জি.এস. এর দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে গেছে।

শেখ রহমত আলী ৯১-৯২ সংসদে ক্রীড়া সম্পাদক এবং ৯২-৯৩ সংসদে সাহিত্য সম্পাদক নির্বাচিত হয়। ক্রীড়া বিভাগের সম্পাদক হিসেবে ফুটবল, হকি, ক্রিকেট ও ভলিবল খেলার আয়োজন করে এবং সে সাহিত্য বিভাগের অনুষ্ঠানাদি অতি নিষ্ঠার সাথে পরিচালনা করে।

আবুল কাশেম পাঠান ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় ছাত্রনেতা। ৯১-৯২ ও ৯২-৯৩ ছাত্রসংসদে সর্বোচ্চ ভোটে বিজয়ী এ.জি.এস.। সদা হাস্যোজ্জ্বল, মেধাবী ও স্বাস্থ্যবান কাশেম পাঠান অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের মনের মণিকোঠায় স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছিল।

আমি ব্যক্তিগতভাবে ১৯৮৭ সাল থেকে তাদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পাই, তারপর সমাজ কল্যাণের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসেবে মেলামেশায় ব্যাপারটা ঘনীভূত হয়। এক পর্যায়ে হালিম আমাকে জানায়, "তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর কর্মপদ্ধতি কেবলমাত্র আদর্শিক রাজনীতি এবং উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন নেতৃত্বই মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে।" এ আদর্শকে ধ্রুবতারা জেনেই হালিম জীবনে অগ্রসর হচ্ছিল।

www.icsbook.info

বি.এল. কলেজকে নিয়ে হালিম, রহমত, কাশেমের চিন্তা ভাবনার অন্ত ছিল না। সেবামূলক কর্মে নিজেদেরকে ডুবিয়ে রাখতো এবং সহপাঠীদের উদ্বুদ্ধ করত। তাদের গঠনমূলক কর্মের কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। ১৯৯২ এর ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল মহামান্য রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের সঙ্গে বঙ্গভবনে দেখা করে সংসদের ভি.পি. শেখ জাকিরুল ইসলাম, জি.এস. আব্দুর রহিম, এ.জি.এস. আবুল কাশেম পাঠান সাহিত্য সম্পাদক পরবর্তী সংসদের জি.এস. মুন্সী আব্দুল হালিম সহ আরো অনেকেই। এর সঙ্গে ছিলেন কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম। সংসদের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক আব্দুস সোবহান গোলদার ও বাংলা বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর শাহ্ মোঃ আনোয়ার হোসেন। তাদের আবেদন অনুযায়ী কলেজকে রাজস্ব খাত থেকে উন্নয়ন খাতে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং পরে ২ লক্ষ টাকা প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে বি.এল. কলেজকে প্রদান করা হয়। ১৯৯২ এর ছাত্র সংসদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই এটা সম্ভব হয়।

এসব ছাত্রদের কর্মপদ্ধতি গঠনমূলক। ছাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে এদেরও স্বাভাবিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল এতে সন্দেহ নেই। ১৯৯৩-এর জুলাইয়ে (৯২-৯৩) এর সংসদ, অধ্যক্ষ কাজী রফিকুল হকের অনুমতিক্রমে একটি প্রতিনিধিদল জি.এস. আব্দুল হালিম, এ.জি.এস. আবুল কাশেম পাঠান, পত্রিকা সম্পাদক মাসুদ আলম গোলদারের নেতৃত্বে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, পরিকল্পনা ও ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাবার মনস্থ করে। অধ্যক্ষ সাহেব তাদের সঙ্গে আমাকেও পাঠালেন। ঢাকায় গিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বি.এল. কলেজের অসুবিধার বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়। এ বিষয়ে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সদস্য খুলনা জেলার পাইকগাছা-কয়রার এম.পি অধ্যক্ষ শাহ্ মোঃ রুহুল কুদ্দুস সাহেব যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। তার সে অমূল্য সময় ব্যয় করার জন্য আমরা তার নিকট কৃতজ্ঞ। কলেজের জন্য ১৫০ খানা বৈদ্যুতিক পাখা পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এগুলো সবই হালিম ও কাশেমের একান্ত প্রচেষ্টার কারণে সম্ভব হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, ব্যারিষ্টার জমির উদ্দীন সরকার ও শিক্ষা সচিবের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

১৯০২ সালে বর্তমান বি.এল. কলেজ 'ব্রজলাল হিন্দু একাডেমী' নামে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এ কলেজে ছাত্রসংসদ গঠিত হয়নি। এ দীর্ঘ সময়ে মনোনয়নের মাধ্যমে সদস্য নির্বাচন করে কাজ চালানো হতো। ১৯৩৮ সালে ষ্টুডেন্ট পার্লামেন্ট গঠিত হয়। সে সময় থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ছাত্রসংসদের জন্য নির্ধারিত কোন উপযুক্ত অফিস কক্ষ ছিল না। কয়েক বছর কলা ভবনের একটি ছোট কক্ষে ও পরবর্তীতে প্রশাসনিক ভবনের পশ্চাতে আর একটি ক্ষুদ্র কক্ষে সংসদের কাজ চালানো হতো। এক সঙ্গে ৩৫ জন সদস্য ও সভাপতি সহ ১৪ জন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের বসার কোন উপায়ই ছিল না। ১৯৯১-৯২ ছাত্র সংসদের

www.icsbook.info

ভি.পি জাকির, জি.এস. রহিম, এ.জি.এস. কাশেম পাঠান, সাহিত্য সম্পাদক হালিমের উদ্যোগে একটি পৃথক ভবন অধ্যক্ষের নিকট থেকে অনুমোদন নিয়ে 'ছাত্রসংসদ ভবন' সাইন বোর্ড লটকানো হয় কিন্তু বসার জন্য কোন আসবাবপত্র না থাকার কারণে পুনরায় অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের সহযোগিতায় ৩০ জনের মত বসার জন্য ভাল চেয়ার সংগ্রহ করা হয়। ডিসেম্বর'৯২-এর নির্বাচনের পরপরই হালিম, কাশেম, জাকির, মাসুদ, মিলন সংসদ ভবনে বিদ্যুতায়নের জন্য অধ্যক্ষের নিকট আবেদন জানায়। অধ্যক্ষ সাহেব কক্ষের বিদ্যুতায়নের জন্য আমার উপর দায়িত্ব দেন। মঞ্জুরিকৃত অর্থ ব্যয়ের জন্য আব্দুল হালিম ও আবুল কাশেম পাঠানের সহযোগিতা নিই। সংসদের অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে তারা যে কত সতর্ক এবং সৎ তা আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করি। এরপর থেকে যত কাজ করেছি, যেমন-বৃক্ষরোপণ, রাস্তা মেরামত, বেঞ্চ তৈরী, গ্যাবিয়ন প্রস্তুত প্রভৃতি ক্ষেত্রেই তারা অত্যন্ত সততার পরিচয় দিয়েছে। এ সবের পশ্চাতে ১৯৯১ থেকে আমরণ পর্যন্ত হালিম, কাশেম ও তার সহযোগীদের চিন্তা ও কর্ম ওতপ্রতভাবে জড়িত। ঘটনাটি এখানেই শেষ হয়নি ছাত্র সংসদ ভবনের সম্প্রসারণের জন্যে ফ্যাসিলিটিস বিভাগের প্রকৌশলীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এর জন্য অর্থ মঞ্জুর হয় দুই লক্ষ টাকা। যা ব্যয় করে একটি সুন্দর সংসদ ভবন করা হয়েছে। এটা বি.এল. কলেজ স্টুডেন্ট পার্লামেন্টের জন্য একটি বড় রকমের সফলতা। কলেজের উন্নয়ন এবং সার্বিক মঙ্গলের জন্য এই যে আন্তরিক প্রচেষ্টা ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে এটা আমাদের নিকট শিক্ষার বিষয়রূপে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই সংসদ ভবনেই বর্তমানে কলেজে প্রহরারত পুলিশ বাহিনীর অন্যতম ঘাঁটি। যে দেশে রাত-দিন ছাত্ররা বলছে, স্বৈর-শাসন চাইনা, সামরিক শাসন চাই না-গণতন্ত্র চাই। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য কতিপয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ছাত্ররাই পরিচালিত হচ্ছে পুলিশের দ্বারা। জাতীয় সংসদ ভবন যেমন গণতন্ত্রের জন্য পবিত্র স্থান তেমনি বি.এল. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র সংসদ ভবনও। ক্ষুদ্র হলেও দু'টি সমজাতীয়। তাই পুলিশের শাসন থেকে মুক্ত করে বি.এল. কলেজে পড়া-লেখার শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য বর্তমান সরকারের প্রতি আমাদের আকুল আবেদন। ১৯৯৩ সালের আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে হালিম, কাশেম পাঠান, মাসুদ গোলদার, বাবলু, মুজিবর, জয়নাল আবেদীন সহ আরো অনেকে আমাকে বলল, "স্যার তিতুমীর ও মুহসীন হলের পার্শ্বে পতিত জমিতে একটি ফুল বাগান করতে হবে কিন্তু না ঘিরলে গরু-ছাগলের অনিষ্টতায় বিনষ্ট হয়ে যাবে"। হালিম, মাসুদ ও আমি কলেজ পোস্ট অফিসের পাশে বাঁশ বিক্রেতাদের নিকট ৩০টি বাঁশের জন্য আবেদন জানাই। দেয়ানা নিবাসী জনাব আব্দুল হাকিম গাজীর সহযোগীতায় ২৫টি বাঁশ বিনা মূল্যে বাঁশ ব্যবসায়ী সমিতির নিকট থেকে পাওয়া যায়। আরো ১০টি বাঁশ ক্রয় করে ঐ স্থান ঘিরে অনেক প্রকার বৃক্ষের চারা লাগানো হয়। স্থানটা দেখলেই মনে আনন্দ জেগে ওঠে। অধ্যক্ষ কাজী রফিকুল হক কর্তৃক এ বাগানের নাম দেয়া

www.icsbook.info

হয়েছে "বৈকালিকা"। হালিম, কাশেম ও তাদের সহকর্মীদের সহযোগিতায় এ বাগানটি করা সম্ভব হয়েছে।

১৯৯২ সালের মার্চ এর দিকে, হালিম, কাশেম, রহিম ও রহমত আলী আমার সাথে দেখা করে কলেজ পুকুর পাড়ে ও ফুটবল মাঠের পশ্চিম পার্শ্বে কয়েকখানা বেঞ্চ তৈরীর পরিকল্পনার কথা বলে। এ প্রসঙ্গে আমি তাদেরকে বললাম, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নয় দশক কেটে গেল এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাত্র ৩ খানা বেঞ্চ তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে ১ খানা বেঞ্চ উদ্ভিদবিদ্যার একজন অধ্যাপক ও ২ খানা অধ্যক্ষ আব্দুল হাই সাহেবের প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়। আমার ৩ দশকের অধ্যাপনা জীবনে কোন ছাত্র আমার নিকট এরূপ প্রস্তাব নিয়ে আসেনি। তাদের এ প্রস্তাবের জন্য স্বাগত জানালাম। সমাজকল্যাণ বিভাগের সম্পাদক হাফিজুর রহমান পিন্টু ও আল্ ফিদা হোসেনের সহযোগিতায় বিভিন্ন স্থান থেকে পুরনো ইট, সিমেন্ট ও বালি সংগ্রহের পর বেঞ্চ প্রস্তুতের কাজ শুরু ও সম্পন্ন করা হলো। সমাজকল্যাণ তহবিল ও অন্যান্য প্রাইভেট উৎস থেকে অর্থ যোগান দেয়া হয়। হালিম, কাশেম ও তার সহকর্মীদের নিকট থেকে এরূপেই বৃক্ষরোপণ কাজ তাদেরই উৎসাহে আমি ও আমার সহকর্মীদের সহযোগিতায় সম্পন্ন করতে পেরেছি।

২০শে সেপ্টেম্বর'৯৩ আব্দুল হালিম ও ২৩শে অক্টোবর'৯৪ কাশেম পাঠান নিহত না হলে ঢাকায় বিভিন্ন অফিসের সাথে যোগাযোগ করে কলেজের জন্য বিরাট অংকের অর্থ মঞ্জুরি আনা সম্ভব হতো।

ছাত্র-সংসদের কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের কথা চিন্তা ও সেবা করার বিষয়ে তৎকালীন সংসদের সদস্যবৃন্দ যত ভালভাবে দায়িত্ব পালন করেছে তা অতীতের ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গেছে। বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে কলেজের প্রতি এদের প্রাণের টান প্রতিফলিত হয়েছে। কলেজ চত্বরকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার চিন্তা-ভাবনা একজন ছাত্র প্রতিনিধির পক্ষে যতটুকু সম্ভব তার সবটুকুই বর্তমান ছিল মুন্সী আব্দুল হালিম, আবুল কাশেম পাঠান, শেখ রহমত আলীসহ তাদের অন্যান্য সহকর্মীদের মধ্যে। সংসদের অর্থ সততার সঙ্গে ব্যয়ের যথাযথ সু-ব্যবস্থা তারা করেছে। প্রত্যেকটি ভবনের গাত্রে ছোট ছোট নেম প্লেট স্থাপন করেছে সমাজ কল্যাণ বিভাগ। জি.এস. হিসেবে রহিম, হালিম ও কাশেম পাঠানের কর্মপদ্ধতি ছিল অতুলনীয়। বি.এল. কলেজের প্রতি মুন্সী আব্দুল হালিম ও আবুল কাশেম পাঠানের একটা মমতা ছিল। এর মাটি ও আকাশকে তারা যে ভালবাসতো তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় কলেজের কোন কাজে এদেরকে কোনদিন ক্লান্তিবোধ করতে দেখিনি।

মধ্যযুগের এশিয়া, ইউরোপে মুসলিম ও খ্রিষ্টান সমাজে অনেক জ্ঞানী, গুণী, ধার্মিক ব্যক্তি স্বমত ব্যক্ত করতে ও ন্যায় পথে থেকে কাজ করতে গিয়ে নিহত ও নির্যাতিত হয়েছেন। আজো কি তার অবসান হয়েছে? সৎ কর্মী ও চিন্তাবিদদের মৃত্যু আছে কিন্তু সৎ কর্মের মৃত্যু নেই। একটি মতাবলম্বীকে সহজেই হত্যা করা যায় কিন্তু মতবাদকে নির্মূল বা হত্যা করা যায় না। চন্দ্র ও সূর্যের রশ্মির মতই তা অপ্রতিরোধ্য। বাতাসের মতই তার গতি চলতে থাকবে। বহু প্রতিষ্ঠানে বহু লোক আছে কিন্তু কয়টা কণ্ঠ নতুন চিন্তা, নতুন নতুন তথ্য, নতুন কাজ ও কর্মে সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন?

www.icsbook.info

হালিম একজন দুর্লভ প্রতিভা, কাশেম একটি নক্ষত্র, রহমত একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মী। এদের আদর্শ ও চিন্তা ভাবনার কথা তাদের কর্মে প্রতিফলন ঘটেছে। বি.এল. কলেজের ইতিহাসে কলেজ অঙ্গনে তিনজন ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। ১৯৯১ সালের ১লা জানুয়ারি আততায়ীর গুলিতে মুক্তি মাহমুদ লিটন নিহত হয়, সে এ কলেজের ছাত্র ছিল না, তাকে কলেজ মসজিদের পাশে দাফন করা হয়। এ কলেজের ছাত্র না হলেও এটা আমাদের জন্যে বেদনার কারণ ছিল। মুন্সী আব্দুল হালিম ও রহমত আলী এ কলেজের প্রথম দু'জন ছাত্র যারা কলেজে গুলিবিদ্ধ ও ছুরিকাহত হয়ে মারা যায়। খানজাহান আলী থানার মশিয়ালী গ্রামে আব্দুল হালিমকে, সাতক্ষীরা জেলার তালা থানার দোহার গ্রামে শেখ রহমত আলীকে এবং খুলনার বসুপাড়ার কবরস্থানে আবুল কাশেম পাঠানকে দাফন করা হয়।

আব্দুল হালিমের লেখার স্টাইল ছিল ভিন্ন ধরনের। একজন পাকা সমালোচক। তার চারিত্রিক গুণ, ভদ্রতা-বিনয়, উদারতা ও মনের দৃঢ়তা আমাদের মুগ্ধ করত। এ সব গুণাবলী দূরের মানুষকে কাছে টেনে আনত। কাশেমের অন্তরে ছিল স্নেহ ও ভালবাসার অফুরন্ত ভাণ্ডার, নিজ গুণ ও কর্ম দিয়ে মানুষের মন জয় করতে পেরেছিল স্বল্প সময়েই। হালিমের কর্মপদ্ধতি সংসদের জি.এস. এর গণ্ডিতেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিল না। বাল্যকাল থেকেই পিতা-মাতা, অগ্রজ আব্দুল হাইয়ের অনুপ্রেরণায় সমাজ কল্যাণমূলক কর্মে জড়িত ছিল, সাংগঠনিক কর্ম ও পড়ালেখা উভয় কর্মের প্রতি তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল।

ক্রীড়া ও সাহিত্য উভয় বিষয়ে দক্ষ ছিল শেখ রহমত আলী। অনার্স পাস করে আমাকে একদিন বলল, "স্যার, বি.এল. কলেজকে আমার খুব ভাল লাগে। এখানকার সবকিছু আমাকে আকৃষ্ট করেছে। আমি এখানেই ভর্তি হতে চাই এম.এ-তে"। কথাগুলো শুনে শিক্ষক হিসেবে মনে প্রাণে আশীর্বাদ করলাম।

সংসদ, সংগঠন, সামাজিক কর্মকাণ্ড ছাড়াও কাশেম পাঠানের সাংবাদিক প্রতিভা ছিল অতুলনীয়। খুলনার দু'টি দৈনিকে সে পর্যায়ক্রমে স্টাফ রিপোর্টার ছিল এবং তার বেশ কয়েকটি লেখা খুলনার দৈনিকসমূহে প্রকাশিত হয়েছে।

হালিম, রহমত ও কাশেম পাঠানের মুখের মিষ্টি হাসি এখনো আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে, যার তুলনা বিরল। ১৯৯৩-এর সংসদের প্রতিটি সদস্যকে খুব সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করতে দেখেছি। প্রতি বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ বাজেট অনুযায়ী ব্যয় করতে অভ্যস্ত। কোন অর্থ যাতে অপচয় না হয় জি.এস. হিসেবে আব্দুল হালিম সেদিক সর্বদাই সজাগ থাকতো। তার মুখে শুনেছি "ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদত্ত অর্থ তাদেরই কল্যাণে ব্যয় হোক, আমরা তাদের সেবক মাত্র।" ছাত্র-সংসদের উপর অর্পিত দায়িত্বের ষোল আনাই যাতে যথাযথভাবে পালিত হয় তার ব্যবস্থা করে গেছে আব্দুল হালিম ও কাশেম পাঠান। ছাত্র-সংসদের সাহসী সেনাপতি হালিম ইচ্ছে করলেই হয়তো ২০শে সেপ্টেম্বর '৯৩ আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই কোন এক মুহূর্তে কলেজ থেকে সরে পড়তে পারতো অথবা আক্রান্ত হওয়ার পরপরই কোন এক অধ্যাপকের বাস ভবনে প্রবেশ করে পরিবারের সদস্যদের সাথে মিশে প্রাণ রক্ষা

www.icsbook.info

করতে পারত। শুধু নিজকে রক্ষা করলেই তো হবে না সহকর্মীদের কথা চিন্তা করেই এ বীরসেনানী সে পথ বেছে নেওয়ার চেষ্টা করেনি। এসব ঘটনা বিশ্লেষণে বোঝা যায় নেতৃত্বের কোন সৎ গুণাবলীর ঘাটতি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ছিল বলে মনে হয় না। পালিয়ে গিয়ে হালিম যদি প্রাণ রক্ষা করত আর তার কোন সহকর্মী যদি আক্রান্ত হয়ে নিহত হত তাহলে হয়ত আব্দুল হালিমের দুঃখের কোন সীমা থাকত না। অন্যকে বিপদের মধ্যে রেখে নিজকে রক্ষা করার প্রবণতা তার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। আমার এ উপলব্ধি বাস্তব ঘটনা বিশ্লেষণ লব্ধ। শেষ পর্যন্ত মসজিদের ভিতরে সৃষ্টিকর্তার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করতে গিয়েও ব্যর্থ হয়ে জীবন দিতে হল।

ফুলের সৌরভের ন্যায় হালিম, রহমত ও কাশেম পাঠানের আচরণে এক প্রকার আকর্ষণ ছিল। সংসদ সদস্যদের চোখ ভরা স্বপ্ন, মস্তিষ্ক ভরা পরিকল্পনা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও কাজের মাধ্যমে উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করেছে। তাদের সাংগঠনিক কর্মপদ্ধতি ও সততার কথা ভেবে আমি প্রস্তুত আনন্দ পাই

যে ঝর্ণা কল্‌কল্ শব্দে তর্‌তর্ করে প্রবাহিত হত তার কিছু ২০শে সেপ্টেম্বর '৯৩ ও ২৩শে অক্টোবর '৯৪ নিস্তব্ধ হয়ে থমকে দাঁড়ালো। গতিশীল জীবনের সব চঞ্চলতা থেমে গেল। যেমনি করে আকাশ থেকে পূর্ণ চন্দ্র বিদায় নেয় তেমনি করে হালিম, কাশেম, রহমত জীবনের এপার থেকে বিদায় নিল। ঝড়ের তাণ্ডব লীলায় উজ্জ্বল প্রদীপগুলোর জীবন নিভে গেল। এ ক্ষণজীবন ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে অমৃত পরিবেশনের কি দুর্জয় সাধনা মানুষের এ উপায়হীন নির্মম অসহায়তার সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের বুকে দীর্ঘ নিশ্বাস জমে উঠেছে, চোখে চোখে কান্না উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে সেদিন মৃত্যু পথযাত্রী হালিম, রহমত, কাশেমের চোখে কি মর্মন্তুদ কাকুতিই না দেখা গেছে। সে আত্মাহীন দেহ, ম্রিয়মান মুখ, নির্বানোন্মুখ দৃষ্টির বিপদঘন স্মৃতি যখনই তাদের পিতা মাতা, শিক্ষক, সহযোগী ও আপনজনের মনে ভেসে ওঠে তখনই দু'চোখ ছল ছল করে ওঠে। সব মানুষকেই একদিন এ আনন্দের সংসার রঙ্গভূমি ছেড়ে নিরুদ্দেশে যাত্রা করতে হবে। রহমত, হালিম, কাশেম সহ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শত শত ছাত্রকে ছাত্ররাজনীতি করার কারণে কে বা কারা জোরপূর্বক পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিল। জীবন ফুলেরই মত বি.এল. কলেজের সাজানো ফুলেরর বাগান কে বা কারা ঘন্টা খানেকের মধ্যে তছনছ করে দিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই ফুলগুলো আপনা-আপনিই শুকিয়ে যেত, পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নয় কিন্তু দুপুর না হতেই ফুটনোন্মুখ ফুলগুলোকে পেশি শক্তি প্রয়োগ করে দুমড়ে মুচড়ে ফেলে খুনিরা অট্টহাসি হাসলো। যারাই এ কাজ করুক না কেন এটা চিরদিন ঘৃণ্য বিষয় হয়েই থাকবে, হত্যাকারীরা চিরদিনই কলঙ্কিত ও অভিশপ্ত। অন্তত ইতিহাসের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কোন মানুষের যেন আর এরূপ মৃত্যু না হয় এটাই আমাদের আন্তরিক কামনা। হালিম, রহমত, কাশেমের মত ফুটনোন্মুখ ফুলগুলো গন্ধ বিতরণের পর যদি ঝরে যেত তবে কারোরই দুঃখ হতো না। কিন্তু যে ফুলগুলো সুমিষ্ট গন্ধের স্বপ্নটুকু ক্ষণিকের জন্যে নাসিকাগ্রে রেখে কুঁড়িতেই ঝরে যায় তাদের জন্যে কার না দুঃখ হয়?

লেখক : প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, দর্শন বিভাগ, সরকারি বি.এল. কলেজ, খুলনা

www.icsbook.info

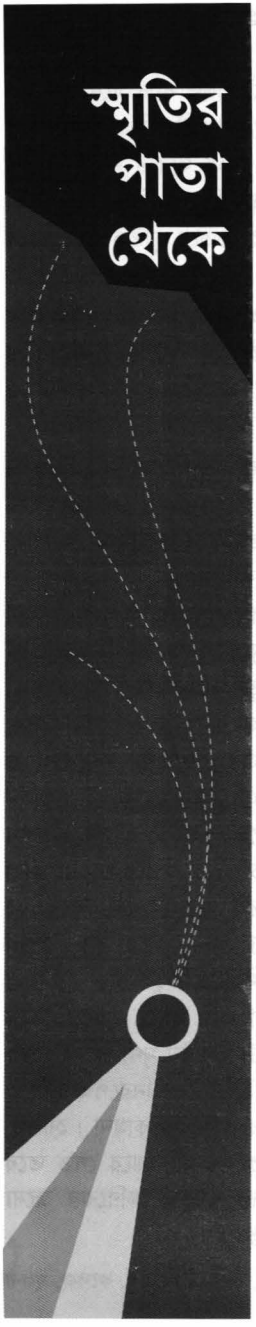

স্মৃতির পাতা থেকে

প্রফেসর কে.এম আওরঙ্গজেব

আজ থেকে উনিশ বছর আগের স্মৃতি। সময়টা অনেক পেছনের হলেও স্মৃতি আজও অম্লান। ১৯৯৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর। দুপুরের পরে আমার ক্লাস ছিল না। তাই জোহরের নামাজের কিছু আগেই নিজ ডিপার্টমেন্ট (প্রাণিবিদ্যা বিভাগ) থেকে বি.এল কলেজের অদূরে পাবলাতে বাসায় ফিরেছি। অন্যান্য দিনের মত আজ কলেজের ভেতরটা এবং মেইন গেটে কেমন যেন নিস্তব্ধতা লক্ষ করলাম। জোহরের নামাজের খানিকটা পরেই কলেজের দিকে গুলি ও বোমা ফাটার শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হলো ঘটনাটি কলেজের ধারে কাছে ঘটছে। কিছুক্ষণ পরেই লোকজনের দৌড়োদৌড়ি টের পেয়ে খবর জানার চেষ্টা করলাম। কেউ নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারছে না। শুধু বলছে কলেজের ছাত্রদের মধ্যে মারামারি বেধেছে। মনে একটুও শান্তি পাচ্ছি না। কিছু একটা অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটার পূর্ব মুহূর্তে আমার মনে যেরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তেমনি যেন আজ মনটা বেশ অশান্ত। তখনকার দিনে বি.এল কলেজে ছাত্রদের মধ্যে গন্ডগোল গোলযোগের খবর শুনে যে কেউ আগাম বলে দিতে পারতো ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাথে নিশ্চয়ই কুফরী মতবাদে বিশ্বাসী ছাত্র সংগঠনগুলোর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে থাকবে। আলোর সাথে আঁধারের যেমন সহাবস্থান চলে না। তেমনি ইসলামের সাথে গায়ের ইসলামের সহাবস্থান সম্ভব নয়। আলো থাকলে আঁধার দূরীভূত হবে। ইসলাম থাকলে গায়ের ইসলাম বিদায় নিতে বাধ্য। তাই ইসলামের সাথে গায়ের ইসলামের দ্বন্দ্ব-সংঘাত

www.icsbook.info

চিরকালের যুগে যুগে যত নবী-রসূল এসেছেন সকলের সাথে তৎকালীন সমাজের খোদাদ্রোহী কায়েমি স্বার্থের মোকাবিলা হয়েছে। আমাদের প্রিয় রাসূল (সঃ) আবু জাহেল, সাবু লাহাবগংদের মোকাবিলা করেছেন।

আমাদের দেশেও চলছে এ দ্বন্দ্ব সংঘাত। আর এ সংঘাতে জীবন দিতে হয়েছে বি.এল কলেজের নির্ভীক নিবেদিতপ্রাণ কয়েকজন তরুণকে। যাদের মধ্যে মুন্সী আব্দুল হালিম, আবুল কাশেম পাঠান ও শেখ রহমত আলীর সাথে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। ওরা ছিল আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্র। সময় সুযোগ পেলেই ওরা আসতো আমার ডিপার্টমেন্টে। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে সাংগঠনিক বিষয়ে ওরা আমার সাথে খোলামেলা আলাপ করতো। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক ছাড়িয়ে ওরা যেন বড় ভাইয়ের দাবি নিয়ে কথা বলতো আমার সাথে। একবার আমার পরিবার-পরিজন গ্রামের বাড়িতে চলে যাওয়ায় আমার বাসায় কাকে রাখা যায় আলাপ করতেই শেখ রহমত আলী বললো "স্যার আমিই আপনার বাসায় থাকবো। আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি থেকে ঘুরে আসেন।" কয়েকদিন পরে আমি দৌলতপুরে ফিরলাম। দেখলাম রহমত অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে তার দায়িত্ব পালন করেছে। এর কয়েকমাসের মধ্যেই কলেজ চত্বরে ঘটে গেল ২০ সেপ্টেম্বরের নারকীয় ঘটনা। সেদিন কে জানতো রহমত আর কোনোদিন আমার বাসায় আসবে না!

ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হিসেবে, ছাত্র নেতা হিসেবে মুন্সী আব্দুল হালিম ছিল এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বি.এল কলেজ ছাত্র সংসদের ১৯৯১-৯২ শিক্ষা বর্ষের নির্বাচিত সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে তার কর্মকান্ড ছিল খুবই সন্তোষজনক। ১৯৯২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রদের নিয়ে তিন দিনের হিরণ পয়েন্টে শিক্ষা সফরের দায়িত্ব দেয়া হয় তাকে। এই চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব সে খুবই দক্ষতার সাথে সম্পাদন করেছিল। পরবর্তীতে ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে কলেজ ছাত্রসংসদের জি.এস পদে নির্বাচিত হয়ে মুন্সী আব্দুল হালিম সকলের মুখ উজ্জ্বল করেছিল। হাজী মুহাম্মদ মহসিন হলের ৪০৬ নং কক্ষে থাকতো সে। বখতিয়ার রহমান মোল্লা ছিল তার রুমমেট, বখতিয়ারের অভিব্যক্তি মুন্সী হালিমের মত নেতা সত্যিই বিরল।

ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারী নির্বিশেষে সকলের নিকট হালিমের গ্রহণযোগ্যতা ছিল ঈর্ষনীয়, ভদ্রতা, নম্রতা, উদারতা ও সততার গুণে খুব সহজেই সাধারণ ছাত্রদের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারতো সে। তার প্রতিভা ছিল বহুমুখী। সুবক্তা হিসেবে তার যেমন সুনাম ছিল তেমনি সাহসী সংগঠক হিসেবে তার জুড়ি মেলাভার। তার মধুর কণ্ঠে কুরআন তেলওয়াত যারা একবার শুনেছেন তারা দীর্ঘদিন তা ভুলতে পারেননি। এটা ছিল তার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। হালিমের আর একটা গুণ ছিল সে ভাল ক্রিকেট খেলতে পারতো।

২০ সেপ্টেম্বরের কঠিন বিপদের মুহূর্তে হালিম ইচ্ছে করলে ঘটনাস্থল থেকে হয়তো পালিয়ে যেতে পারতো অথবা আশ-পাশের কোন বাসায় লুকিয়ে থাকতো পারতো।

www.icsbook.info

কিন্তু সহযোদ্ধাদের ময়দানে ফেলে নিজের জীবন বাঁচাতে সংকীর্ণ চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। জীবন দিয়ে হালিম প্রমাণ করে গেছে ইসলামী আন্দোলনের নেতা নিজ স্বার্থের জন্য কখনো ময়দান ত্যাগ করে না। জিতলে গাজী আর মরলে শহীদ'-এ মন্ত্রের বাইরে আর কিছু জানা নেই। তাইতো সেদিন কলেজের সবুজ চত্বর রক্তে লাল হয়েছিল। শুধু কলেজ চত্বর নয় কলেজের মসজিদে অবশেষে আশ্রয় নেয়া ছাত্র সংসদের নির্বাচিত জি.এসকে পরিকল্পিত উপায়ে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হলো। এরপর তাকে মসজিদ সংলগ্ন পুকুরে ছুড়ে ফেলা হয়। পানিতে তাঁর হাত-পা নড়া-চড়া করতে থাকায় হিংস্র পশুরা তাকে পুকুর থেকে তুলে এনে প্রকাশ্য দিবালোকে জবাই করে হাত পায়ের রগ কেটে দেয়। সেদিনের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা মনে হলে আজও গা শিউরে ওঠে। বি.এল কলেজের ইতিহাসে কেন, এমন ঘটনা বাংলাদেশের অন্য কোথাও বিরল।

মুন্সী আব্দুল হালিমের কি অপরাধ ছিল? বি.এল কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জি.এস নির্বাচিত হওয়া কি তার অপরাধ? তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয় কলেজের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরাই তো অপরাধ করেছে! আসলে ইসলাম বিদ্বেষীরা যখন দেখে গণতান্ত্রিকভাবে ইসলামের অগ্রযাত্রা রুখে দেবার নয়, তখন তারা সংঘবদ্ধভাবে গায়ের জোর খাটাতে চায়। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে আবুল কাশেম পাঠানকেও শহীদ হতে হলো। এভাবে বি.এল কলেজের আঙিনা থেকে একে একে ঝরে গেল হালিম, রহমত ও কাশেম পাঠান। আর খুলনার বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলনের ময়দান থেকে অকালে হারিয়ে গেল আমিনুল ইসলাম বিমান, আমান ও শেখ বেলাল উদ্দিন।

ইসলামী আন্দোলনের এসব নেতা-কর্মীদের রক্ত কি বৃথা যাবে? নিশ্চয়ই শহীদের রক্ত কখনো বিফলে যেতে পারে না। শহীদ ভাইয়েরা আমাদের শক্তি ও প্রেরণার নিরন্তর উৎস। তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে ইসলাম পাপড়ি মেলবে, বিকশিত হবে, পরিপূর্ণতা অর্জনের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবে। ধনী-গরীব, ছোট-বড়, আশরাফ- আতরাফ সব ভেদাভেদ ঘুচাবে। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর করবে। ন্যায় বিচার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। আমরা আছি সেদিনের প্রতীক্ষায়।

লেখক : সাবেক মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

www.icsbook.info

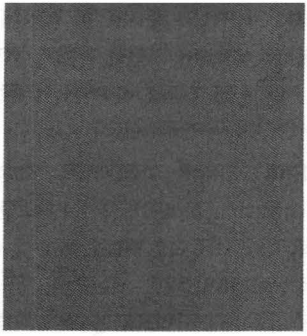

এক করুণ স্মৃতি

প্রফেসর মোঃ আব্দুল মান্নান

প্রথমেই বলে রাখি ছাত্ররাজনীতি সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বিচিত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান ও একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলনে শুধু প্রত্যক্ষ করা নয়, সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছি। জীবনের ঝুঁকি নিয়েছি। ৬৯ এ পুলিশের গুলিতে আসাদ জীবন দিয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তায়, খুব কাছে ছিলাম আমরা।' ৭১ এ সাতক্ষীরার তৎকালীন ছাত্রলীগের একজন বড় নেতাকে, যিনি তৎকালীন শান্তি বাহিনী ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থার কাছে অনুকম্পা ও নিরাপত্তা নিয়ে নিজ বাড়িতে নিরাপদে অবস্থান করছিলেন, তাকে আমরা তার গ্রামের বাড়ি ঘেরাও করে এক রাত্রিতে ধরে নিয়ে যাই এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে তাকে শামিল হতে বাধ্য করি।

ঊনসত্তরে ছাত্রদের আন্দোলনের সামনে সবচেয়ে বড় হুমকি ছিল তৎকালীন সরকার সমর্থক এন.এস.এফ. এর পেশীজীবী ছাত্রসংগঠন। কিন্তু শুধুমাত্র কয়েকজন পুলিশ কলাভবনের সামনে দিয়ে কয়েকপা ঢুকেছিল ছাত্রদের তাড়া করে, এর প্রতিবাদে এন.এস.এফ. বড় অংশ সরকার বিরোধী আন্দোলনে, ছাত্রসংগ্রাম পরিষদে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে যোগ দেয়। মাহবুবুল হক দোলন, নাজিম কামরান চৌধুরী (ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক) তাদের নেতা ছিলেন। '৭১ এর স্বাধীনতা আন্দোলনে ঢাকায় যে তরুণ বাহিনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অপারেশন করেছিল এবং পরবর্তীতে ধরা পড়ে খান সেনাদের হাতে মারাত্মকভাবে নির্যাতিত হয়েছিল, জীবন দিয়েছিল তরুণ রুমি, তারই পাশে ছিল দুঃসাহসী বদিউর রহমান বদি, যার পাথরের মত শরীর ও দুর্দান্ত চাল চলনে আমরা ভীত সন্ত্রস্ত থাকতাম। কারণ সে এন.এস.এফ এর একজন প্রধান শক্তি ছিল।

www.icsbook.info

৭১ এর দিনগুলি' নামক পুস্তকে শহীদ রুমির মা জাহানারা ইমাম তাঁর বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। সাতক্ষীরাতে একজন বিহারী সন্তান শেখ জাহিদুল ইসলাম জজ, যে আমার সতীর্থ, ৭১ এ স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন সক্রিয় সৈনিক ছিল। বর্তমানে সে সাতক্ষীরা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অন্যতম নেতা।

প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণ রাজনৈতিক পরিচয় এবং তা নিয়ে নানা তর্কবিতর্ক, গর্ব-অহংকার, দ্বন্দ্ব-সংঘাত এসব উপরিকাঠামোর ব্যাপার। আর বাস্তব সময়, যখন জাতীয় প্রয়োজনে ত্যাগের প্রশ্ন আসে, তখনই প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় মানুষের। অন্তঃসারশূন্য বক্তৃতা বাগাড়ম্বর, উত্তেজনা সৃষ্টি আর প্রয়োজনের সময় নিরাপদ দূরত্বে থেকে পরিণামে আন্দোলনের সুফল ভোগ করা, এগুলো আমাদের চারপাশে, আমাদের ইতিহাসে প্রচুর পাওয়া যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় নবাব সিরাজের ভূমিকায় অভিনয়ের ভঙ্গিতে প্রখ্যাত বক্তা মঞ্চ কাঁপিয়ে উদ্দীপ্ত গলায় বললেন এবার যদি পুলিশ গুলি করে তবে সে গুলি আমার এই বুক ভেদ না করে আমার কোন ভাইয়ের শরীরে লাগবে না'। মিছিল এগিয়ে গেল, ফার্ম গেটের কাছে গুলিতে কয়েকজন নিহত হলে সে খবর বটতলায় পৌঁছলে বক্তা বুক পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালেন, বললেন এইবার খেলা জমলো'। কিছু আগে তিনি বুকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেছিলেন পুলিশের গুলি এইখানে না ভেদ করে আর কারও শরীরে লাগবে না।' ৬৯ এর সেই বক্তা পরবর্তী চার খলিফার একজন। তিনি বর্তমানে দরবেশের পোশাক পরেন আর কোটি কোটি টাকার মালিক, মাঝে মধ্যে টকশোতে দেখা যায় প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে খুব বেশি দেখা যায় না। এমন সুবিধাবাদের নজির অজস্র। এক সময়ের চীনপন্থী কেউবা রুশ ভারতপন্থী এখন এক কাতারে দাঁড়িয়ে হাস্য বিনিময় করেন। সকলে ভিন্নতা ভুলে এক মহান জোট।

শিক্ষক হিসেবে জীবন কাটিয়েছি নিরপেক্ষ এই বোধ নিয়ে যে, তরুণরা নিজ নিজ বুদ্ধি বিবেচনা নিয়ে চলে। তারা সবাই আমার ছাত্রছাত্রী। কেউ ছাত্র রাজনীতি করে, অনেকেই তা করেনা। যারা ছাত্র সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত, তারা কে কোন্ দল করে সেটা দেখার বিষয় আমার নয়। পরবর্তীতে তারা সবাই যে সেই পথে চলে না, তারও অভিজ্ঞতা আমার প্রত্যক্ষে আছে। কাজেই ছাত্রসংসদে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসেবে অথবা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের সময় আমার বিবেচনা থাকত মনোযোগ এবং শৃঙ্খলা, সদাচার বিনয় ভদ্রতা ইত্যাদি সৎগুণের অধিকারী যারা তাদেরকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখা এটি আমার পেশাগত দায়িত্ব ও ব্যক্তিগত স্বভাব। এজন্য এ তালিকায় যেমন প্রচুর সাধারণ মেধাবী ছাত্রছাত্রী থাকত তেমনি অনেক রাজনীতি সংশ্লিষ্ট ছাত্র ও থাকত। তাদের নিজস্ব নিজস্ব দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও তৎপরতা অবশ্যই ছিল। কিন্তু তার মধ্যেই আচার আচরণের মার্জিত মানের কারণে অনেক ছাত্রনেতা দলনিরপেক্ষ ভাবে আমার প্রিয় ছাত্র ছিল। আমি যত ঘটনা দৃশ্য, অধ্যয়ন ও ইতিহাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে শিক্ষকতায় এসেছি, একজন তরুণ ছাত্র তো ততটা পথ চলেনি কাজেই তারা এই মুহূর্তে তাদের মত করেই চলবে। সব সময় তা অভ্রান্ত হবে এমনটা নয়। তবে

www.icsbook.info

উদ্দেশ্য সৎ এবং ব্যবহার ছাত্রসুলভ হলে আমি উদারতা দিয়ে তাদের গ্রহণ করেছি নিরপেক্ষ শিক্ষক হিসেবে। এ সঙ্গে সরকারি বি.এল. কলেজের প্রসঙ্গটিও উল্লেখ্য। এ কলেজ শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, সারা বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ কলেজের লক্ষ লক্ষ প্রাক্তন ছাত্র দেশে বিদেশে নানা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আছেন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ভূমিকা রাখতে না পারায় এ বিভাগে উচ্চশিক্ষার জন্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব বি.এল. কলেজকেই পালন করতে হয়। ধারা বাহিকভাবে পঁচিশ হাজার ছাত্র এ কলেজে অধ্যয়ন করে। ছাত্রসংখ্যার এই বিপুলতা অনেক প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই।

এ কলেজে ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলা বিভাগে যোগদান করি। এর আগে দুটি সরকারি কলেজ ও দুটি বেসরকারি কলেজে মোট চারটি জেলায় অধ্যাপনা করেছি। কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময়টি আমার কেটেছে বি.এল.কলেজে। ২০০৭ সালে অবসরে যাওয়া পর্যন্ত ২৬টি বছর দিনরাত্র বি.এল. কলেজের মধ্যে বাসায় সপরিবারে বসবাস করেছি। মধ্যবর্তীকালে এক বছরের জন্য বাগেরহাটে সরকারি মহিলা কলেজ এবং আট মাসের জন্য এম.এম.কলেজ যশোরে অধ্যাপনা করেছি। কিন্তু আমার অবস্থান ছিল বি.এল. কলেজের বাসায় এবং দু'বারই ফিরে এসেছি এ কলেজে। অধ্যক্ষ হিসেবে আমাকে অন্যত্র নিয়োগ দেয়া হয়, কিন্তু আমি সেটি গ্রহণ করিনি। কারণ শিক্ষকতার জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় আমার কাছে বি.এল. কলেজ। ছাত্র-সংসদের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসেবে সাহিত্য সংস্কৃতির অনুষ্ঠান আয়োজন ও খুলনার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যুক্ত থাকা আমার প্রাণপ্রিয় বিষয়। এ কলেজে ২৬ বছরের শিক্ষকতা এবং মোট একত্রিশ বছরের শিক্ষকতা জীবনে বহু ভাল মন্দ আনন্দ বিষাদের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি। ভাল ও আনন্দের ঘটনায় আনন্দিত এবং করুণ ঘটনায় মর্মান্তিক বেদনার অভিজ্ঞতা অনেক হল। এরই একটি করুণতম অধ্যায়ের কথা বলতে আজকের এই লেখা।

১৯৯৩ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর কলেজ প্রাঙ্গণে এক ভয়াবহ সংঘর্ষে তৎকালীণ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম ও সাহিত্য সম্পাদক শেখ রহমত আলী সহ অনেকে মারাত্মক ভাবে আহত হয়। খুলনা আড়াই'শ বেড হাসপাতালে ঐ রাত্রিতে আব্দুল হালিম এবং ঢাকায় চিকিৎসার জন্য নেয়া হলে রহমত আলী কয়েকদিন পরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। যে দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে এ সংঘর্ষ হয় বলে শুনেছি তাদের মধ্যে এমন সংঘাত হওয়ার কারণ কি, তা আমার মত অনেকেরই অজানা। তবে সেদিন কলেজ প্রাঙ্গণে বহু বহিরাগত মানুষকে হোস্টেলে লুটপাট ও অস্ত্রহাতে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। আরো দেখা গেছে এ দু'দলের বাইরের অন্যান্য ছাত্রসংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট দৌলতপুর এবং খুলনা খালিশপুর অঞ্চলের বিভিন্ন কলেজের ছাত্র ও ছাত্র নামধারী অথবা ভয়ানক স্বভাবের চেনা অচেনা ব্যক্তিদের। ঘন্টাখানেকেরও বেশি সময় প্রচণ্ড তাণ্ডবের পর তারা চলে গেলে কলেজে দাঙ্গা পুলিশের আগমন হয়। আমি ভর্তি পরীক্ষা কমিটির কাজকর্ম নিয়ে

www.icsbook.info

বাংলা বিভাগে অধ্যক্ষসহ অনেকের সঙ্গে ছিলাম। মূল ঘটনাটি ঘটে আমাদের নজরের বাইরে কলেজের ১নং গেট থেকে মসজিদের ভেতরে ও সামনে। বাণিজ্য ভবনের পাশের রাস্তায় দু'পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নিয়ে পরস্পরের দিকে ঢিল ও হাতবোমা ছোঁড়া ছুড়ির পরে একপক্ষ পিছু হটে মূল গেটের দিকে গেলে আমি ঝুঁকি নিয়ে ২নং গেটের কাছে আমার বাসায় চলে আসি। আমার বিভাগীয় প্রধান শাহ মুহম্মদ আনোয়ার হোসেন ও মসজিদের পাশে তাঁর বাসায় চলে যান। তাঁর কাছেই পরে হালিমের উপর আক্রমণের ঘটনাটি শুনেছি। তিনি বলেছেন হালিমকে মসজিদ থেকে আঘাত করতে করতে বাইরে নিয়ে অন্তত জন পঁচিশেক যুবক দেশী অস্ত্রের আঘাত করে পুকুর পাশে মৃত মনে করে ফেলে যায়। এ দৃশ্য দেখে আনোয়ার সাহেবের স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে যান। পরে শুনেছি মূল গেটে সহসা আগ্নেয়াস্ত্রের আক্রমণের মুখে হালিমরা কয়েকজন পিছিয়ে এসে মসজিদে আশ্রয় নেয়। অন্যরা, যারা তাদের তাদের আক্রমণ করে তাদেরকে আনোয়ার সাহেব কলেজের কোন পরিচিত ছাত্র নয় বলে আমার কাছে বলেছিলেন।

দুটি তরুণ জীবনের অবসান এবং শিক্ষাঙ্গনের এই ক্ষতি কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। দুটি সংগঠনের মধ্যকার সংঘাতে সুযোগ নিয়েছে অন্যান্য মহল। আমি সংসদে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসেবে কখনো ছাত্রশিবির, কখনো শিবির বিরোধী অন্যান্য দলীয় জোট এবং কখনো সর্বদলীয় ছাত্র প্রতিনিধি পরিষদের ছাত্রদের সাথে নিয়ে সাহিত্য সংস্কৃতি অনুষ্ঠান করেছি। দু একজন বাদে ছাত্র প্রতিনিধিদের আমার মূল্যায়নে সবসময়ই ভাল জেনেছি। উক্ত ঘটনার সময়ে ছাত্রশিবির সংসদে ছিল

আমার বাসা থেকে আমি যেটুকু দেখেছিলাম তা হল, রহমত আলী লাঠি ও ঢিল হাতে কয়েকজনের সাথে বিপক্ষকে ধাওয়া করে ১নং গেটের দিকে চলে যায়। পরে তাকে একা হোস্টেলের দিকে ফিরতে দেখি। এরপর সারা কলেজ প্রাঙ্গণ ছেয়ে যায় নানা ধরনের অচেনা লোকজনে। হোস্টেলের দিকে তাদেরকে যেতে ও লুটপাটের জিনিসপত্র নিয়ে যেতে দেখলাম। এটা বুঝলাম যে, এখন অন্যপক্ষ সামনে নেই। এরই মধ্যে তিন চারজন লোকে রক্তাক্ত একজনকে হাত-পা ধরে ঝুলিয়ে বাইরে নিয়ে যায়। পরিস্থিতি শান্ত হল দাঙ্গা পুলিশ ও সাংবাদিক এলে আমি তাদের কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে পুলিশ অফিসার বললেন একজন কি, দেখেন মসজিদের সামনে কয়েকজন পড়ে আছে, আপনাদের প্রিন্সিপালকে বলে হাসপাতালে পাঠালে দেখেন দু একজন বাঁচে কিনা। পরে আনোয়ার ভাই এর কাছে শুনেছি মুমূর্ষু আব্দুল

www.icsbook.info

হালিম চিনতে না পেরে বিপক্ষরা যখন ফিরে যায় তখন হাত তুলে তাদের ইশারা করলে তারা তখন তাকে শেষ আঘাত করে। আর আমার বাসার পাশ দিয়ে যাকে ঝুলিয়ে নিয়ে যায় সে ছিল রহমত আলী। অন্যান্য অনেকেই গুলিবিদ্ধ ও দেশি অস্ত্রের আঘাতে আহত হয়। রহমত হোস্টেলে তার রুমে ঢুকেছিল যেখানে তার ঘাড়ে অস্ত্রাঘাত করে টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে নামানো হয়। এই ঘটনার পরে কলেজে প্রায় নয় মাস শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকে। আমরা শিক্ষকরা কলেজে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোকদের সাথে খুলনায় ও বিভিন্ন স্থানে সাক্ষাৎ ও আলোচনা চালাতে থাকি কিন্তু তাতে অনেকটা সময় চলে যায়। পরে সবাই উপলব্ধি করে ক্ষতির পরিমাণ এবং কলেজে ক্লাস শুরু হয়।

দুটি তরুণ জীবনের অবসান এবং শিক্ষাঙ্গনের এই ক্ষতি কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। দুটি সংগঠনের মধ্যকার সংঘাতে সুযোগ নিয়েছে অন্যান্য মহল। আমি সংসদে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসেবে কখনো ছাত্রশিবির, কখনো শিবির বিরোধী অন্যান্য দলীয় জোট এবং কখনো সর্বদলীয় ছাত্র প্রতিনিধি পরিষদের ছাত্রদের সাথে নিয়ে সাহিত্য সংস্কৃতি অনুষ্ঠান করেছি। দু একজন বাদে ছাত্র প্রতিনিধিদের আমার মূল্যায়নে সবসময়ই ভাল জেনেছি। উক্ত ঘটনার সময়ে ছাত্রশিবির সংসদে ছিল। হালিম ও সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক রহমত যে সরাসরি আমার সাথে কাজ করত তাদের দুইজনকে আমি সম্ভাবনাময় তরুণ বলে জানতাম। তাদের আচরণে ভদ্রতা ও সততা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। বিশেষভাবে তরুন বয়সে তাদের এই জীবনাবসান অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে সম্ভবত তারা হয়তো নিতান্তই শিশু অথবা আদৌ তখনও তাদের জন্মই হয়নি তাই তারা সমালোচনার উর্ধ্বে। তবে বেঁচে থাকলে হয়তো এদেশের বর্তমান স্বাধীনতা সত্তার বিপক্ষে যে করাল আগ্রাসী শক্তি ঈশান কোনে কৃষ্ণ মেঘের মত ছায়া বিস্তার করে এগিয়ে আসছে, তার জন্য জীবন পণ করতে পারত। পরিশেষে আমি তাদের পরিবার পরিজনের জন্য সমবেদনা ও তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করি। আর যারা বাংলাদেশের জাতীয়তা ও স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে চায় তাদের মধ্যে সংঘাত নয়, ঐক্য কামনা করি, কারণ তাদের মধ্যকার যে কোন ভুল বুঝাবুঝির সুযোগ গ্রহণ করে অন্যদের ধূর্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার পথ করে দিতে পারে উপমহাদেশের ইতিহাস আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়।

লেখক : প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, সরকারি বি.এল. কলেজ, খুলনা

www.icsbook.info

বেহেশতী হাতের অমলিন ছোঁয়া

মোঃ আতাউর রহমান বাচ্চু

দিন আসে দিন যায়, মাসের পর মাস পেরিয়ে যায়, কালের গর্ভে হারিয়ে যায় বছরের পর বছর কিন্তু মানুষের হৃদয়ে এমন কিছু স্মৃতি গ্রথিত থাকে যা কখনও ভোলা যায় না। বরং এ স্মৃতিগুলোই তাকে কখনও কাঁদায় কখনও বা হাসায় এবং আগামী দিনে কাঙ্খিত মনজিলে পৌছাতে দুর্বার গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এমনি একটি স্মৃতি ইসলামী আন্দোলনের এই কন্টকাকীর্ণ চলার পথে আমাকে বার বার অনুপ্রাণিত করে।

আমি তখন সবে মাত্র অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। ১৯৯৪ সালের এপ্রিল/মে মাসের দিকে ইসলামী ছাত্রশিবির নড়াইল জেলা শাখা স্কুল ছাত্রদের নিয়ে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলো। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের জন্য আমাদেরকে নড়াইল টাউন ক্লাবে ডাকা হলো। টাউন ক্লাবে যেয়ে দেখলাম সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ। স্টেজে একটি ব্যানার ঝুলছে সেখানে লেখা আছে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আবুল কাশেম পাঠান ভারপ্রাপ্ত জি.এস. সরকারি বি.এল. কলেজ। নামটি দেখেই চমকে উঠলাম এবং অজানা এক আনন্দ আমার হৃদয়কে শিহরিত করলো। শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম, শহীদ রহমত আলী ও আবুল কাশেম পাঠান ভাইদের নাম বাড়িতে অনেক বার শুনেছি। বিশেষ করে ১৯৯৩ সালে ২০ সেপ্টেম্বরে বি.এল. কলেজে বাতিল শক্তির হামলায় যখন বি.এল. কলেজ সভাপতি ও নির্বাচিত জি.এস. মুন্সী আব্দুল হালিম ভাই ও শহীদ রহমত আলী ভাই শাহাদাৎ বরণ করেন তখন আমার ভাই (মাহফুজুর রহমান) কলেজ শাখার সেক্রেটারি ছিলেন এবং তিনিও মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। কাশেম পাঠান

www.icsbook.info

ভাই তখন কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। যার ফলে এই নামগুলো বাড়িতে অনেকবার শুনেছি এবং মানুষগুলোকে দেখতে কেমন হতে পারে তা শুধুই বারবার কল্পনায় ছবি এঁকেছি। কিন্তু আজ তাদেরই একজন আবুল কাশেম পাঠান ভাইকে স্বচক্ষে দেখতে পাব একথা ভাবতেই বসন্তের হাওয়ার মত হৃদয়কে আন্দোলিত করল।

প্রোগ্রাম শুরু হলো। কিছু সময় পর আবুল কাশেম পাঠান ভাই আসলেন। কিছুক্ষণ পর বক্তব্য রাখলেন। বক্তৃতা কি রেখেছিলেন সেটা মনে নেই এবং এখন বুঝি বয়সটা যা ছিলো তা বক্তৃতার গুরুত্ব উপলব্ধি করার মত নয় কিন্তু বক্তার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণের কারণে শুধু তারই দিকে তাকিয়ে ছিলাম। প্রতিযোগিতায় আমি একটি পুরস্কারও পেয়েছিলাম। যখন পাঠান ভাইয়ের হাত থেকে পুরস্কারটি নিতে গেলাম তখন দায়িত্বশীল ভাইয়েরা পরিচয় করিয়ে দিলেন এ মাহফুজ ভাইয়ের ছোট ভাই। সাথে সাথে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন এবং পুরস্কারটি হাতে দিয়ে বললেন প্রোগ্রাম শেষে দেখা করো। প্রোগ্রাম শেষে দেখা করার সময় আব্বা-আম্মাসহ বাড়ির সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলো। বললো তুমি দ্রুত সাথী শপথ নিয়ে আমাকে জানাবা এবং বি.এল. কলেজে বেড়াতে আসার দাওয়াত দিলেন। এর কয়েক মাস পরেই জানতে পারলাম পাঠান ভাই শাহাদৎ বরণ করেছেন। শাহাদাৎ-এর দুই বছর পর ৯৬ সালের ১১ই ডিসেম্বর সাথী শপথ নেওয়ার সুযোগ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিয়েছিলেন। কিন্তু পাঠান ভাইয়ের সাথে যে ওয়াদা ছিলো সাথী হওয়ার পর তাকে জানানোর সেটা বাস্তবায়ন করতে পারিনি। এখন নিজের বিবেকের কাছে নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হয় কারণ সাথী শপথ যদি আরো পূর্বে নিতে পারতাম তাহলে সু-সংবাদটি হয়তো পাঠান ভাইকে জানাতে পারতাম।

পাঠান ভাই বি.এল. কলেজে বেড়ানোর দাওয়াত দিয়েছিলেন। সত্যি একদিন সে কলেজে প্রবেশ করেছিলাম পাঠান ভাই যে বিভাগের ছাত্র ছিলেন সেই ব্যবস্থাপনা বিভাগের একজন ছাত্র হিসেবে। আবুল কাশেম পাঠান ভাই যে ক্যাম্পাসের সভাপতি ছিলেন, কালের আবর্তে সেই শহীদি ক্যাম্পাসে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সংগঠনের সভাপতি হিসেবে খেদমত করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তখন বি.এল. কলেজ ক্যাম্পাসে অনেক বিচরণ করেছি কিন্তু কোথাও আমাকে বি.এল. কলেজে বেড়াতে আসার জন্য দাওয়াত দানকারী মানুষটিকে বাস্তবে আর খুঁজে পাইনি। পাঠান ভাইকে খুঁজে পেয়েছি কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মচারী রাজা ভাইয়ের দু'নয়ন থেকে ঝরা ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুর মাঝে, খুঁজে পেয়েছি কলেজের সুইপার অনিল দাদার অশ্রুসিক্ত নয়নের মাঝে, নাইটগার্ড হাশেম চাচা ও লাল্টু ভাইদের আবেগ নিংড়ানো ভালবাসা ও কথার মাঝে। বি.এল কলেজ ক্যাম্পাসের প্রতিটি বৃক্ষ যেন ডেকে ডেকে বলে আমার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আবুল কাশেম পাঠান ছাত্র-ছাত্রীদের

www.icsbook.info

সমস্যাগুলো সমাধান করে দিত। সবুজ শ্যামল কচি ঘাস গুলো মৃদুমন্দ বাতাসে দুলে দুলে হয়তো বলে আমার উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে কাশেম পাঠানরা তরুণ ছাত্র সমাজের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিতো। ক্যাম্পাসের প্রতিটি শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যখন আমার সামনে কাশেম ভাইয়ের বিভিন্ন স্মৃতির কথা বলতেন তখন দেখিছে অজানতেই অনেকের চক্ষু থেকে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়েছে। বি.এল. কলেজের প্রতিটি স্থাপনার সাথে একাকার হয়ে মিশে আছে পাঠান ভাইয়ের স্মৃতি। তাই ক্যাম্পাসে দায়িত্ব পালনের সময় প্রতিটি মূহূর্তে শুধু শহীদদের কথা মনে হতো। মুন্সী আব্দুল হালিম ভাই, আবুল কাশেম পাঠান ভাই, রহমত আলী ভাই হলের যে রুমগুলোতে থেকেছেন সেখানে অনেক সময় থেকেছি। যেখানে দাঁড়িয়ে তারা হলের মসজিদে ইমামতি করেছেন সেখানে আমিও ইমামতি করার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু সব সময় তাদের তুলনায় নিজেকে অনেক বেশি অযোগ্য বলে মনে হয়েছে। দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে তখন সারাদিন শেষে ক্যাম্পাস থেকে হলে ফিরে রাতে নিজেকে নিজেই এহতেসাবের মুখোমুখি করেছি যে, কাশেম পাঠান ভাই দায়ীত্বশীল হিসেবে ক্যাম্পাসের সকলের সাথে যে আচার-আচারণ করেছেন, ক্যাম্পাসে যে ভূমিকা রেখেছেন আমি দায়িত্বশীল হিসেবে সে রকম পারছি কি? তখন অবশ্যই না পারার দায়ে নিজেকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হয়েছে।

আজ সাংগঠনিক জীবনের অনেকগুলো বছর পেরিয়ে এলেও যখন মাঝে মাঝে ক্লান্তি অবসাদ ও ব্যক্তিগত দুর্বলতাগুলো নফ্সকে আচ্ছন্ন করে ফেলে ঠিক তখনই আবার চলার পথে অনুপ্রাণিত করে, মনজিলে মকসুদে পৌঁছাতে গতি সঞ্চারিত করে কৈশোরে লোভীত শহীদ আবুল কাশেম পাঠান ভাইয়ের বেহেশতী হাতের সেই অমলিন ছোঁয়া। হে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আবুল কাশেম পাঠান সহ সকল শহীদ ভাইদের শাহাদাৎ-এর সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমীন॥

লেখক : কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক ও সাবেক খুলনা মহানগরী সভাপতি,
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.icsbook.info

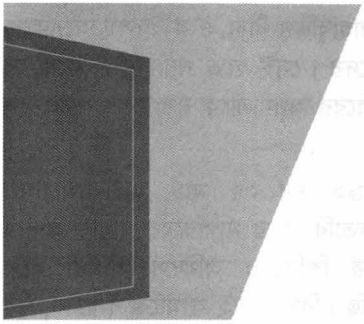

বন্ধু হারা বিএল কলেজ ক্যাম্পাস

জি.এম. ইলিয়াস হোসাইন

দক্ষিণ বাংলার সর্ববৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ খুলনার সরকারি বি.এল. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। দীর্ঘদিনের সুনামে মণ্ডিত এই কলেজ। মেধা, জ্ঞানচর্চা, প্রতিভা ও যোগ্যতা বিকাশের এক অনন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। যেখানকার প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-কর্মচারী সকলের মাঝে এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। জ্ঞানচর্চা ও ছাত্ররাজনীতি চর্চার অনন্য প্রাণকেন্দ্র এই কলেজ। যে কলেজে গড়ে ওঠা অনেক নেতৃত্ব আজ দেশ পরিচালনায় সুযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ১৯৭৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠার পর হতে এই কলেজে সক্রিয় পদচারণার মাধ্যমে বি.এল. কলেজকে এক ভিন্ন আঙ্গিকে গড়ে তুলতে ছিল সবসময় তৎপর। দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান সন্ত্রাস হতে বি.এল. কলেজকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখা, কলেজের সবধরনের সমস্যা সমাধানে ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে ছাত্রশিবিরের ভূমিকা ছিল সক্রিয়, যে কারণে কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রশিবির কয়েক দফা বিপুল জনপ্রিয়তার মধ্য দিয়ে বিজয় লাভ করে। ছাত্রশিবির সংসদে থাকা অবস্থায় কলেজের উন্নয়নে আরও জোরালো ভূমিকা রাখার সুযোগ পায়। যে কারণে ছাত্রশিবির সংসদে থাকাকালে বি.এল. কলেজ বাংলাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে প্রেসিডেন্টর পুরস্কার ও অনেক সরকারি অনুদান লাভ করতে সক্ষম হয়। বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্রশিবিরের এ জনপ্রিয়তা সহ্য করতে না পেরে ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য গঠন করেও মোকাবেলা করতে না পেরে, ১৯৮৯ সালে নির্বাচনের একদিন আগে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য পরাজয়ের আশঙ্কায়

www.icsbook.info

ছাত্রশিবিরের নির্বাচনী মিছিলে গুলি চালিয়ে শাহাবুদ্দিন ধীরা ও ফরিদসহ অনেককে নির্মমভাবে আহত করে নির্বাচন ভণ্ডুল করে দেয়। সেই হতে পর্যায়ক্রমে সন্ত্রাসের মাধ্যমে বি.এল. কলেজে এ ইসলামী ছাত্রশিবিরের অগ্রযাত্রাকে নস্যাতের অপপ্রয়াস চলে আসছে।

> শহীদ শেখ আমিনুল ইসলাম বিমান, শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম ও শহীদ শেখ রহমত আলী বি.এল. কলেজের তিন বিরল প্রতিভা। যাদের চরিত্র, ব্যবহার, যোগ্যতা ও নেতৃত্বের ছোঁয়া বি.এল. কলেজের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর হৃদয়ে স্থান নিয়ে আছে। কিন্তু যাদের পদচারণা ফুরিয়ে যাওয়ায় বি.এল. কলেজ ক্যাম্পাস আজ স্বজন ও বন্ধু হারা বেদনায় সিক্ত।

১৯৯২ এর ২৫ মার্চ, ২০ রমজান। ইফতারি সেরে মাগরিবের নামায আদায় করে শিবিরের অফিসে আমরা বসে আছি। বিমান ভাই আমাকে বললেন, খুব ক্ষুধা পেয়েছে- বাসায় যেতে চাইলেন। আমি বললাম পরে যাবেন। মুড়ি আর ছোলা খাচ্ছিলেন। খবর এলো ঢাকা থেকে টেলিফোন এসেছে। আমি পাশে জামায়াত অফিসে টেলিফোনে কেন্দ্রীয় সভাপতি হামিদ ভাইয়ের সাথে কথা বলছি, হঠাৎ করে গুলি আর বোমার শব্দ শুনে এগিয়ে দেখি শিবিরের অফিসে তথাকথিত ঘাদানিকরা হামলা করেছে। মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র আর মশাল জ্বালিয়ে কমরেড ফিরোজের নেতৃত্বে খুনের নেশায় উন্মত্ত হয়ে শিবিরের অফিস ঘিরে ফেলে ছাত্রশিবিরের হাতে গোনা কয়েকজন নিরীহ কর্মীকে নির্মমভাবে পিটিয়ে আহত করছে। আমিনুল ইসলাম বিমান, আব্দুল ওয়াদুদ ও জাহাঙ্গীরসহ অনেকে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। আমিনুল ইসলাম বিমানকে ভর্তি করা হলো ২৫০ শয্যা হাসপাতালে। সমস্ত শরীরের ক্ষতস্থান হতে রক্ত ঝরছে। রাত ১১-৫৫মিঃ কর্তব্যরত ডাক্তারের বিমর্ষ ভাব দেখে আমার সন্দেহ হলো। আমি বিমান ভাইয়ের হাত ধরে নাড়ি খুঁজতে লাগলাম। বিমান ভাই মুখ উঁচু করে কি যেন বলতে চাইলেন, কিন্তু প্রকাশ করতে পারলেন না। মুখে পানি দিলে বিমান ভাই হঠাৎ জ্ঞান হারালেন। শাহাদাতের পেয়ালা পান করে আমাদের মাঝ হতে চলে গেলেন।

২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ সাদেক ভাইয়ের টেলিফোনে জানতে পারলাম বি.এল. কলেজে ছাত্রদল ছাত্রশিবিরের উপর হামলা করেছে। জি.এস. হালিম ভাই, মিলন ভাই, রহমত ভাই ও হাফিজ ভাইসহ অনেকে মারাত্মক আহত হয়েছে। হালিম ভাইয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ২৫০ শয্যার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

www.icsbook.info

হাসপাতালে পৌঁছে শুনলাম হালিম ভাই আর আমাদের মাঝে নেই। ভেতরে প্রবেশ করে দেখি হাসপাতালের বারান্দায় হালিম ভাইয়ের সমস্ত শরীর রক্তে ভেঁজা, পুলিশ এক এক করে শরীরের সমস্ত ব্যান্ডেজ খুলে সুরত হাল লিখেছে। দেখলাম পাষন্ডরা কি নির্মমভাবে হত্যা করেছে। হাত পায়ের রগগুলো কেটে দিয়েছে। গলায় রামদা চালিয়ে নৃশংসভাবে জবাই করে হত্যা করেছে। লাশের বীভৎস রূপ দেখে অনেকেই মূর্ছা গেলেন। রহমত ভাই, হাফিজ ভাইয়ের অবস্থা খুবই খারাপ, মিলন ভাইয়ের খবর পাওয়া যাচ্ছে না। ডাক্তারের সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম রহমত ভাইয়ের অবস্থা ভাল নয়, ঢাকায় পাঠাতে হবে। ঢাকায় পাঠানো হলো চিকিৎসার জন্য, কিন্তু ১২ দিন ভোগার পরে ২ অক্টোবর আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে তিনিও চলে গেলেন।

শহীদ শেখ আমিনুল ইসলাম বিমান এম.এ পূর্ব-ভাগের ছাত্র এবং বি.এল. কলেজ ক্যাম্পাসের ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি। শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম হিসাব বিজ্ঞান ৩য় বর্ষের ছাত্র, কলেজ ছাত্রশিবিরের সভাপতি ও শেখ রহমত আলী রাষ্ট্রবিজ্ঞান এম.এস.এস শেষ বর্ষের ছাত্র ও কলেজ ছাত্রসংসদের সাহিত্য সম্পাদক।

শহীদ শেখ আমিনুল ইসলাম বিমান, শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম ও শহীদ শেখ রহমত আলী বি.এল. কলেজের তিন বিরল প্রতিভা। যাদের চরিত্র, ব্যবহার, যোগ্যতা ও নেতৃত্বের ছোঁয়া বি.এল. কলেজের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর হৃদয়ে স্থান নিয়ে আছে। কিন্তু যাদের পদচারণা ফুরিয়ে যাওয়ায় বি.এল. কলেজ ক্যাম্পাস আজ স্বজন ও বন্ধু হারা বেদনায় সিক্ত। আজ বি. এল. কলেজ ক্যাম্পাসে শোনা যায় না শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমানের সেই বজ্রকণ্ঠের গগনবিদারি শ্লোগান, ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু মানি না মানবো না, মুক্তির রাজপথ ইসলামী বিপ্লব। শোনা যায় না মুন্সী আব্দুল হালিমের হৃদয় স্পর্শী ভাষণ- বি.এল. কলেজ গড়ার অঙ্গীকার। মহসিন হল মসজিদে নামাযের ইমামতী আর সুরেলা কণ্ঠে কোরান তেলাওয়াত। শোনা যায় না শহীদ তিতুমীর হলে নামাযের পূর্বে শহীদ শেখ রহমত আলীর কণ্ঠে আযানের ধ্বনি আচ্ছালাতু খায়রুম মিনান্নাউম। পাষণ্ড খুনিরা কেড়ে নিয়েছে বি.এল. কলেজের সবুজ বাগানের তিন তিনটি তাজা ফুলকে। যাদের হারানো বেদনা কাঁদিয়ে রেখেছে বি.এল. কলেজের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোন, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও খুলনার অভিভাবকমণ্ডলীকে।

লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, খুলনা মহানগরী।

www.icsbook.info

এ স্মৃতি ভুলবার নয়

এড.শেখ আবদুল ওয়াদুদ

"আমার বুকের তাজা রক্ত দিয়ে শহীদ আমান লিখে রেখো।" শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্তে সাথীদের প্রতি এ মহান আহ্বান ছিল এতিম আমানের। ২০শে সেপ্টেম্বর'৯৩ দুপুর বেলা। সিটি কলেজে ছাত্রদলের সন্ত্রাসী কর্তৃক আটকেপড়া শিবির নেতা ওয়াছিয়ার রহমান মন্টু ও আবুল কাশেম পাঠানকে মুক্ত করে আনা হয়েছে। জামায়াত অফিসে সকলে বসা। হঠাৎ খবর এলো আলীয়া মাদ্রাসায় হামলা হয়েছে, শাহাদৎ বরণ করেছেন একজন। ছুটে গেলাম আলীয়া মাদ্রাসায়।

এতিম ছেলেরা দৌড়িয়ে এলো। গলা জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলতে লাগলো, এখন এসে কি হবে, এই যে আমানের লাশ। আমান আর বেঁচে নেই। সে শহীদ হয়েছে। কেন তাকে মারা হলো? জবাব দিতে পারিনি সেদিন এতিমদের এ প্রশ্নের। প্রচণ্ড বেদনায় হতবাক হলাম। কি বলবো শত-শত এতিম শিশুদের? কি বলে সান্ত্বনা দেব ওদের?

অফিস কক্ষের সামনে খাটিয়ায় রাখা সাদা কাপড়ে ঢাকা শহীদ আমানের লাশ। তার দেহে রয়েছে চেঙ্গিস ও হালাকুর উত্তরসূরি হিটলারের প্রেতাত্মা মানব রূপী হিংস্র কালসাপ হায়েনাদের একতরফা আক্রমণের সকরুণ চিহ্ন। চেহারায় যেন চমকে উঠছে আল্লাহর নুর। চতুর্দিক আলোকিত হচ্ছে নুরের তাজাল্লিতে। লাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে চোখে মুখে শোকের ছায়া নিয়ে ছুটে আসা অসংখ্য মানুষ। নির্বাক তাকিয়ে দেখছে শহীদ আমানকে। আর্তচিৎকার করতে করতে শহীদের লাশের নিকট লুটিয়ে পড়ছে শহীদের সাথীরা।

www.icsbook.info

পিতা-মাতার আদরের ধন আমান বাড়িতে ফিরতে পারেনি আলেম হয়ে, মানুষ হয়ে। পিতা অত্যন্ত আশা করে বলতো আমার আমান বড় আলেম হবে, হাফেজ হবে। আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে। আমানের পিতা তার মাতাকে বলতো নামাজ পড়ে ছেলের জন্যে দোয়া করো। আমাদের আমান যেন ভালভাবে ইসলামী ভাবধারায় গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু সকল স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ে লাশ হয়ে ফিরলো আমান বিধবা মায়ের কাছে। সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানার অন্তর্গত দরগাহপুর গ্রামে জন্ম নেয় আমান। এ গ্রামে মাদ্রাসার পার্শ্বে একটু ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে গোলপাতার ছাউনি মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছোট একখানা ঘর। সেখানে বাস করত বিধবা মা, আমান ও তার ছোট ভাই আব্দুর রহমান ও বোন রেশমা। আমান যখন ২য় শ্রেণীর ছাত্র তখন তার পিতা মারা যায়। আশৈশব পিতৃহারা আমান বিধবা মায়ের অকৃত্রিম ভালবাসা ও স্নেহে লালিত হতে লাগলেন নিজ গ্রাম দরগাহপুরেই। মায়ের কাছে থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। পরে খুলনা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে। শাহাদাতের সময় ৮ম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন আমান।

অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও বোডিং সুপারের নিকট থেকে ছুটি নিয়েছে। বাড়িতে যাবে মায়ের সাথে দেখা করবে তাই। সবেমাত্র ক্লাস শেষ হয়েছে। মসজিদে নামাজ আদায় করে রুমে এসেছে। সকলেই খাবার গ্রহণে ব্যস্ত। খাওয়া শেষ করতে পারেনি কেউ। এমন সময় ছাত্রদলের এলোপাথাড়ি গুলি ও বোমার মুর্হুমুহূ শব্দে সকলেই হতবিহ্বল। ছাত্র, শিক্ষক ও এতিমরা প্রাণ ভয়ে ছুটাছুটি করতে লাগলো। মাদ্রাসা ক্যাম্পাসে নেমে এলো বিভীষিকা। অনেকেরই খাওয়া হয়নি। পানিও খেতে পারেনি অনেকে। আমান দৌড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে দো'তালায় উঠছিলেন। আমানকে লক্ষ করে গুলি ছোড়া হলো কাটা রাইফেল দিয়ে। বুলেটবিদ্ধ হলো আমান। মা বলে এক চিৎকার দিয়ে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। পিতৃহীন এই ইয়াতিমের একমাত্র সম্বল ও ভরসা ছিল মা। কিন্তু মা বলে চিৎকার হায়েনাদের রক্ত পিপাসু মনকে নরম করতে পারেনি। দ্বিতীয়বার গুলি করে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয় শহীদ আমানকে। শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিল আমান। গাছপালা ও পশুরা নির্বাক তাকিয়ে দেখলো সভ্য যুগের নব্য বর্বরদের মানবতার মুখোশধারী এ যুগের কসাইদের।

লাশ বাড়িতে পৌঁছালে শহীদের শোকাহত সাথীরা ভিড় জমাতে থাকে শহীদের বাড়িতে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে পড়শিরা। মুষড়ে পড়েন শহীদের বিধবা মা। বোন রেশমা ও ছোট ভাই আব্দুর রহমানের গগনবিদারি কান্নায় সবকিছু যেন উল্টো পাল্টা হয়ে গেল। মানুষ পশু গাছপালা সকলেই যেন শোকে মুহ্যমান। বিধবা মা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দিয়ে বলতে লাগলেন- "আমানের পিতা বড় আশা করত আমান বড় আলেম হবে। আমিও আশা করতাম অনেক কিছু। ওর পিতার মৃত্যুর পর ওর দিকে তাকিয়েই আমি বেঁচে আছি। ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখতাম। আমান লেখাপড়া শিখবে। বড় হয়ে পরিবারের হাল ধরবে। ছোট ভাইকে লেখা পড়া শিখাবে। বাকি জীবন স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাবো। সবই যে শেষ হয়ে গেল।

www.icsbook.info

শহীদের মায়ের সাথে কথা বলতে যেয়ে আমি আবেগকে ধরে রাখতে পারিনি। সান্ত্বনা আর জবাব সবই হারিয়ে গিয়েছিল। দরিদ্র পরিবারের সন্তান পিতৃহীন বালক এতিম আমান কষ্ট করে লেখাপড়া করত। নিজের খরচ নিজেকেই জোগাড় করতে হতো। তাই মাদ্রাসার ভকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে আসরের নামাজের পর দর্জির কাজ করত। গ্রামের লোক ও চাচাদের সহযোগিতায় তার পরিবার চলতো।

আমান বৎসরে ২/৩ বার বাড়িতে যেত। মা আমানকে শাহাদাতের পূর্বে মাদ্রাসায় এগিয়ে দিতে গিয়েছিলেন। বিদায় নেবার সময় মা বলেছিলেন, আমান বাইরে যেওনা। রাজনীতি করো না। তুমি মারা গেলে আমি কি করে বাঁচবো। সব শেষ হয়ে যাবে। জবাবে আমান বলেছিল- "মা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে যদি শহীদ হতে হয় তাহলেও শহীদ হবো। তুমি শহীদের মা হবে। দোয়া করো।" লাশ বাড়িতে গেলে মা বললেন- আমি অশিক্ষিত তখন বুঝতে পারিনি আমান কি বলতে চেয়েছে। এখন বুঝতে পেরেছি আমান শহীদ হতে চেয়েছিল। আমানের লোভ ছিলনা কোন জিনিসের উপর। বিধবা মাকে অযথা বিরক্ত করত না। ভাইবোনদের সাথে তার ব্যবহার ছিল অমায়িক। টাইফুন শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য আমান ছিল বন্ধুদের উত্তম সাথী। শহীদ আমান উল্লাহর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা মোনাওয়ার হোসাইন বললেন, ইয়াতিম আমান আর আমাদের মাঝে নেই। বুলেটের নির্মম আঘাতে শাহাদাতের অমিয়সুধা পান করে আমান।

হোস্টেল সুপার মাওলানা ইকরামুল হক বললেন, আমান ছিল সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। খুব শান্তশিষ্ট ও অত্যন্ত অনুগত। দীর্ঘ ৬ বৎসরের মধ্যে তাকে মাদ্রাসার সকল শিক্ষক ও হল সুপার একজন ভাল ছাত্র হিসেবে পেয়েছিল। তার চেহারায় স্বর্গীয় আভা প্রস্ফুটিত হতো। বিবেকবান ঈমানদার প্রতিটি মানুষ এধরনের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে ব্যথিত ও মর্মাহত না হয়ে পারে না। আলীয়া মাদ্রাসায় লাশের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বেলাল ভাইয়ের সাথে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ করছি। খবর এলো বি.এল.কলেজে হামলা হয়েছে। হালিম ভাই আটকা পড়েছে। সেক্রেটারি ওয়াছিয়ার রহমান মন্টু ভাইকে রেখে ত্বরিত ছুটে গেলাম বি.এল. কলেজের পার্শ্ববর্তী শ্রমিক কল্যাণ অফিসে। সকলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। বলতে লাগলেন, হালিম ভাই ও রহমত ভাই হয়তো আর নেই।

দ্রুত ছুটে গেলাম হাসপাতালে। আহতদের ভিড়ে অনেকেই কাতরাচ্ছে। আবার কেউ নীরব ও নিথর হয়ে পড়ে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম হালিম ও রহমত ভাইয়ের কথা। হাসপাতালের মেঝেতে আব্দুর রহিম, শফিকুল ইসলাম, হাফিজ, রহমত, মিঠু, দেলোয়ার, মাহফুজ ও মুন্সী আব্দুল হালিম ভাই সকলেই পর পর অবস্থান করছেন। নীরব রহমত ভাইয়ের মাথায় হাত রাখলাম। একে একে সকলের নিকট

www.icsbook.info

থেকে বিদায় নিয়ে হালিম ভাইয়ের নিকটে গেলাম। স্যালাইন লাগানো। মাথায় ও বুকে হাত রাখতে চমকে উঠলাম। মন্টু ভাইকে বললাম, হালিম ভাই আর নেই। বলতেই মন্টু ভাই কেঁদে ফেললেন। আমিও সামলাতে পারিনি। কিন্তু দায়িত্বশীল হিসেবে সামলিয়ে নিয়ে দ্রুত সরে পড়লাম। কর্মীরা টের পেল। হঠাৎ সকলেই চিৎকার দিয়ে উঠলো হালিম ভাই শহীদ হয়েছে বলে। করুণ দৃশ্যের অবতারণা হলো হাসপাতালে। সকলে নির্বাক তাকিয়ে দেখছে শহীদদের শোকাহত সাথীদের। তারাও বেদনার ভাগী হয়ে চোখের পানি ফেলছে। বেলাল ভাইয়ের ভাগ্নে জুনায়েদের কান্না আমি আজও ভুলতে পারিনি। একে একে অনেকেই এলো। বেলাল ভাই, জাকির ভাই প্রত্যেকেই। কেউ কাউকে ঠেকাতে পারছেনা। গলা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে সকলেই। এই ভাবে কেটে গেল সন্ধ্যা। শাফায়াত ভাই, শহীদ ভাই, মতিন ভাই, পরোয়ার ভাই, ইলিয়াস ভাই, বেলাল ভাই, সকলেই যেন থমকে গেল। সান্ত্বনা দিতে পারছে না কেউ কাউকে।

যাই হোক, হালিম ভাইকে একবার দেখলাম। সারা শরীর রামদা আর গুপ্তির কোপে ক্ষত-বিক্ষত। কোন কঠিন পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী কেউ যদি হালিম ভাইয়ের ক্ষত-বিক্ষত চেহারাকে দেখতো তাহলে তার হৃদয় কেঁপে উঠত। এইভাবে একজন মানুষকে জবাই করা যায়! কাটা যায়?

হালিম ভাই ছিলেন মিষ্টভাষী আনুগত্যপরায়ণ সাহসী সংগঠক। কখনও চোখে চোখ রেখে কথা বলতে দেখিনি। পরামর্শ করে কাজ করাই ছিল তার স্বভাব। যাকে নিয়ে আমাদের অনেক চিন্তা তার কুরআন তেলওয়াত ও মুচকি হাসি আজও আমাদেরকে অনুপ্রেরণা যোগায়। শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম, রহমত আলী, আমিনুল ইসলাম বিমান ও আমানুল্লাহর শাহাদাতের ঘটনা আজও ভুলতে পারিনি। মনে পড়লে থমকে দাঁড়াই। আজও যেন সেই রমজান মাসের ইফতারীর পরবর্তী সময়-যখন বিমান ভাই সহ অফিসে মুড়ি ও ছোলা খাচ্ছিলাম। আর হামলা হলো ঘাদানিকের পক্ষ থেকে। অথচ আমাদের পানি খাওয়া হয়নি। আঘাতের পর আঘাতে বিমান ভাইয়ের শাহাদাতের ঘটনা মনে পড়ে। চেতনা ও অনুভূতিতে নাড়া দেয়। তাহলে এইভাবেই আমাদের ভাইয়েরা শুধু জীবন দেবে। না আজ আর শোক নয়, শোককে শক্তিতে পরিণত করতে হবে। হত্যার বদলা নিতে হবে হত্যার মাধ্যমে নয়, ইসলামী বিপ্লব ঘটিয়ে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের মাধ্যমে।

শহীদ আবুল কাশেম পাঠান আমার শ্রেষ্ঠ সহযোগী

"জীবন যখন আল্লাহ দিয়েছেন তখনতো মরতেই হবে। হয়তো অসুখে বা দুর্ঘটনায় বা অন্য কোন অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। তবে এ মৃত্যু শহীদি মৃত্যুই হোক। আল্লাহ পাক কি আমার এ উদ্দেশ্য পূরণ করবেন? আশা কি বিফল হবে আমার? আমি তো প্রায়ই নামাজের পরে দোয়া চাই তুমি আমাকে শহীদি মৃত্যু দাও।

www.icsbook.info

তোমার দ্বীন কায়েম করতেই যেন আমার মৃত্যু হয়।" কথাগুলো শহীদ আবুল কাশেম পাঠানের। লিখেছিলেন তার ডায়েরিতে। শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা ছিল তার অনেক পূর্ব থেকে। আমরা জানতাম না শহীদ আবুল কাশেম পাঠানের এ আকাঙ্খার কথা। শহীদ হবার কথা, নামাজের পর তার দোয়ার কথা।

নিয়তির কি নির্মম পরিহাস, যে কাশেম পাঠান শহীদ বিমান, হালিম, রহমত ও আমানের মাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। ১১ মাস পরে কাশেম ভাইয়ের মাকে সান্ত্বনা দিতে হচ্ছে আমাদের। হয়তবা আমাদের মাকেও একদিন সান্ত্বনা দিতে হবে। ৯৪ এর সেপ্টেম্বরে যখন শহীদ আমান, হালিমকে নিয়ে লিখতে বসেছিলাম। তখনতো ভাবিনি কাশেম পাঠানকে নিয়ে লিখতে হবে এভাবে। সান্ত্বনা দিতে হবে তার সাথীদের। মনে পড়লে চমকে উঠি, নির্বাক তাকিয়ে থাকি, থমকে দাঁড়াই। প্রচণ্ড বেদনায় হতবাক হই। দুমড়ে মুচড়ে যায় হৃদয়। এভাবে একে একে বিমান, হালিম, রহমত, আমান ও কাশেমকে দাফন করেছি। নীরবে চোখের পানি ফেলেছি। কিন্তু শহীদ হতে পারিনি। শাহাদাত নসিব হয়নি। ইচ্ছা করলে শহীদ হওয়া যায় না আবার বেঁচে থাকাও যায় না। জীবন মৃত্যু সবই আল্লাহর হাতে।

পৃথিবীতে কত মানুষ আসে, কত মানুষ চলে যায়। কালের চাকার উপর ভর করে আসা যাওয়ার পালা চলছে। কিন্তু মানুষ ক'জনকে স্মরণ রাখে, চোখের পানি ফেলে। মানুষ মরে, পানিতে ডুবে, সড়ক দুর্ঘটনায়, পেটের পীড়ায়, রোগে-শোকে আবার সাধারণ ভাবেও। কৈ? কেউতো তাদের স্মরণ করেনা। কিন্তু শহীদেরা অমর। তারা মরে না। বেঁচে থাকে আন্দোলনের কর্মীদের হৃদয়ে। শহীদের তাজা খুন প্রেরণা যোগায় অনাগত ভবিষ্যৎ কর্মীদেরকে। শহীদ আব্দুল মালেক, সাব্বির, হামিদ, আইয়ুব, জব্বার তার প্রমাণ, অন্যরাও আছে বেঁচে আমাদের মাঝে।

গাছ-পালা, তরুলতা আর পশু-পক্ষী সবই যেন পলকহীন নেত্রে তাকিয়ে দেখলো কারবালার আর এক হুসাইনকে। আর দেখলো সভ্য যুগের নব্য বর্বরদের মানবতার মুখোশধারী ঐ যুগের কসাইদের। বোনের ধোয়া জামা কাপড় আর তার পরা হলো না ঘরে ফেরা হলো না এভাবে ঝরে গেল সাজানো ফুলের বাগান থেকে একটি গোলাপ।

www.icsbook.info

আল্লাহর ঘোষণা, "ওদেরকে তোমরা মৃত বলোনা, ওরা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারনা।" সংগঠন যতদিন থাকবে, দায়িত্বশীল ভাইয়েরা ততদিন শাহাদাতের ঘটনা কর্মীদের শুনাবেন। কর্মীরা অঝোরে থেকে থেকে কেঁদে উঠবে। চোখের উদগত অশ্রু ধরে রাখতে পারবে না। এভাবে কবর জিয়ারতে, শহীদের বাড়িতে আপনজনের সাথে সাক্ষাতে, দোয়ার মাহফিলে, স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে, শাহাদাত বার্ষিকীতে সকলেই স্মরণ করে শহীদদের। প্রেরণা নিয়ে কাজ করে দ্বিগুণ তিনগুণ উৎসাহে। এ পথ ধরে বেঁচে থাকে শহীদেরা।

শহীদেরা যেন জীবন্ত ইসলাম। ইসলামের কোন রূপ নেই, চেহারা নেই, মানুষের মধ্যেই তার পরিপূর্ণতা। শহীদ হওয়ার পর মানুষ তাদের মধ্যে ইসলামকে খুঁজে পায়। ইসলামকে চিনতে পারে। শহীদ শব্দের অর্থ বাস্তব সাক্ষী জীবন্ত সাক্ষী। অর্থের মধ্যেই-এর সার্থকতা।

আমার এখনও মনে হয় কাশেম পাঠান জীবিত আছে আমাদের মাঝে। তার মিষ্টি সরল হাসি যেন আমি দেখতে পাই। কাশেম পাঠান যেন আমার সামনে বসে পরামর্শ দিচ্ছে। হালিম যেন দূরে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাত এগিয়ে দিচ্ছে করমর্দন করবে তাই। আর রহমত ভাই যেন আমাকে বলছে, "ওয়াদুদ ভাই আমি কি সদস্য হতে পারবো না? আমাকে সদস্য বানাবেন না?" এভাবেই বেঁচে থাকে শহীদেরা। মরে না কখনও।

২৩শে অক্টোবরের'৯৪ সকাল বেলা। জামায়াত অফিসে অপেক্ষা করছি। সিটি কলেজে নবাগতদের শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে সকল দলের পক্ষ থেকে। মহানগরী শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ভাইয়ের নেতৃত্বে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা জানিয়ে ফিরে এসেছে আমাদের ভাইয়েরা। কলেজে উত্তেজনা। কাশেম পাঠান ভাই এলেন বি.এল. কলেজ থেকে। সাথে সাখাওয়াত ভাইসহ কয়েকজন পরামর্শ করে গেলাম সিটি কলেজে। ঢুকতেই ব্যারিকেড দেয়া হলো মিছিলের সামনে। রিভলভার উঁচিয়ে গুলি করা হলো আমাদের দিকে। শুরু হলো সংঘর্ষ। ফাঁকা হয়ে গেল কলেজ গেটসহ আশপাশ এলাকা। কাশেম ভাই বসে থাকতে পারেননি। ছুটে এসেছিলেন আমাদের মাঝে। ঘাপটি মেরে থাকা মানবরূপী হিংস্র কালসর্প ছাত্রলীগের খুনীদের ঘাতক বুলেট বিদ্ধ হলো কাশেম ভাইয়ের বুকে। লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। ক্লিনিকে নেয়া হলো। কিন্তু তখন আর বেঁচে নেই আবুল কাশেম পাঠান। গাছ-পালা, তরুলতা আর পশু-পক্ষী সবই যেন পলকহীন নেত্রে তাকিয়ে দেখলো কারবালার আর এক হুসাইনকে। আর দেখলো সভ্য যুগের নব্য বর্বরদের মানবতার মুখোশধারী ঐ যুগের কসাইদের। বোনের ধোয়া জামা কাপড় আর তার পরা হলো না ঘরে ফেরা হলো না এভাবে ঝরে গেল সাজানো ফুলের বাগান থেকে একটি গোলাপ। হালিম ভাইয়ের শাহাদাতের পর কাশেম পাঠান ভাই

www.icsbook.info

হয়ে উঠলেন বি.এল. কলেজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী একক নেতা। ইতঃপূর্বে নির্বাচনগুলোতে রেকর্ড পরিমাণ ভোট পেয়ে চমকে দিয়েছিলেন বিরোধীদের। বি.এল. কলেজ নিয়ে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের ষড়যন্ত্র অনেক দিনের। যে কোন মূল্যে দখল করতে হবে এ কলেজকে। হালিম ভাইকে হত্যা করা হলো। বাকি আছে কাশেম পাঠানসহ কয়েকজন। ওদেরকে ফেলতে হবে। পথের কাঁটা সরাতে হবে। তাই পরিকল্পনা নিলেন ছাত্রনামধারী সন্ত্রাসীরা। কিন্তু ওরা কি পেরেছে হালিম-রহমত-কাশেমকে হত্যা করে বি.এল. কলেজকে দখল করতে? বাস্তবায়িত হয়নি ওদের পরিকল্পনা বরং শহীদদের রক্তের প্রতি ফোঁটা হয়ে উঠেছে অজেয় শক্তি, জন্ম দিচ্ছে আরও অনেক জিন্দাদিল কর্মীকে। তারা হচ্ছে আরো সাহসী, ত্যাগী ও নিবেদিত। তাইতো এখন বি.এল. কলেজ ইসলামী আন্দোলনের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি। কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে হয়।

"আমাদের শহীদেরা সবচেয়ে বড় সম্পদ
গড়ে গেছে সাহসের দ্বিধাহীন সোজা রাজপথ"

আমি কাশেম ভাইকে একা ঘুরতে নিষেধ করেছি। পরামর্শ দিয়েছি বারবার। চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করেছি। কলেজ নেতৃবৃন্দকে সর্বদা তার সাথে থাকতে বলেছি। একা ঘুরলে তাকে শাসিয়েছি বারবার। ওদিনও তাকে নিতে চায়নি সিটি কলেজে। তাই রেখে গিয়েছিলাম। কাশেম ভাইকে নিয়ে আমাদের ছিল অনেক আশা। কিন্তু আল্লাহর চিন্তা ভিন্ন। তুলে নিলেন তাকে।

হালিম ভাই ও কাশেম ভাইয়ের মধ্যে যেন মিল খুঁজে পাই। ১৯৯২তে হালিম ভাই ছিলেন বি.এল. কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক। রহিম ভাই সভাপতি, মিলন ভাই সেক্রেটারি। ৯৩ তে কলেজ সেট-আপের সময় চিন্তায় পড়ে গেলাম। বি.এল. কলেজের মত প্রতিষ্ঠানে কাকে নেতৃত্বে আনা যায়। হালিম ভাই তখনও অপরিচিত। সাহস হচ্ছিল না। তবুও সভাপতি করা হলো হালিম ভাইকে, সেক্রেটারি করা হলো মাহফুজ ভাইকে। পরামর্শ সভার সদস্য নির্বাচিত হলেন মাহফুজ ভাই কিন্তু হালিম ভাই হননি। তবুও তাকে মনোনয়ন দেয়া হয়, যা কেউই জানত না। কিন্তু ৪/৫ মাস যেতে না যেতেই হালিম ভাই হয়ে উঠলেন বি.এল. কলেজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। পরিচিত মুখ সফল সংগঠক। যা ঘটেছিল কাশেম ভাইয়ের ক্ষেত্রেও। ৯৩ তে শহীদ হলেন হালিম ভাই, বন্ধ হয়ে গেল বি.এল. কলেজ। কেটে গেল ৬টি মাস। ৯৪-এর সেটআপ। কাশেম ভাই রাজনৈতিক ফিগার হলেও তিনি তখনও সাংগঠনিক সম্পাদক। অনেক হিমসিম খেতে হয়েছে নেতৃত্বে আনার ব্যাপারে। তবুও সভাপতি করা হলো তাকে। সেক্রেটারি করা হলো সাখাওয়াত ভাইকে। পরামর্শ সভার সদস্য নির্বাচিত হলেন সাখাওয়াত ভাই। কাশেম ভাই নির্বাচিত হয়নি। অথচ তিনি সভাপতি, মনোনয়ন দেয়া হলো কাশেম ভাইকে যা কারো জানার কথা নয়। কিন্তু স্বল্প

www.icsbook.info

দিনের ব্যবধানে আমাদের সকলের চিন্তাকে হারিয়ে দিয়ে কাশেম ভাই হয়ে উঠলেন এক কিংবদন্তির নায়ক। সকলের কাশেম ভাই, পাঠান ভাই। হালিম ভাই এবং কাশেম ভাই কেহই বি.এল. কলেজের সেক্রেটারি হননি সরাসরি সভাপতি ছিলেন।

তার মিষ্টি হাসি সদালাপ, অমায়িক ব্যবহার দলমত নির্বিশেষে সকলের কাছে ভালবাসার পাত্র হিসাবে গড়ে তুলেছিল। কাশেম পাঠান ছিলেন মেধাবী ও স্বাস্থ্যবান। বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়াতেন সর্বদা। প্রতিপক্ষকে বন্ধু সংগঠনের ভাই বলে সম্বোধন করতেন। তাই তার অকস্মাৎ শাহাদাতে নগরীতে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। দারুণভাবে মর্মাহত হয়েছিল অসংখ্য মানুষ। ভিড় জমিয়েছিল হাসপাতালে। জানাজার নামাজে।

আবুল কাশেম পাঠান সম্পর্ক সৃষ্টিতে অনন্য প্রতিভা। যখন তাকে দেখলাম পিকচার প্যালেস মোড়ে, কলেজ ক্যাম্পাসে পিছনে দেখতাম অসংখ্য তরুণকে। তার ছিল এক সম্মোহনী জাদুকরী শক্তি। স্বল্প সময়ে একজন মানুষকে আপন করতে পারতেন তিনি। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের দেখলেই জড়িয়ে ধরতেন, কিছু খাওয়াতেন। চানাচুর ও চটপটি ছিল তার প্রিয় খাবার।

চকলেট দেখলেই তাকে মনে পড়ে। পকেট ভর্তি থাকতো চকলেটে। তার চকলেট খায়নি এমন সাথীদের সংখ্যা খুবই কম আছে। কাশেম ভাই লেখাপড়ায় যেমন ছিলেন মেধাবী তেমনি খেলাধুলাতেও। প্রায় সময় তাকে খেলাধুলায় জড়িত থাকতে দেখা গেছে। তিনি ছিলেন সফল এক ক্রীড়া সংগঠক। শহীদ বিমান স্মৃতি টুর্নামেন্ট তার অন্যতম প্রমাণ।

শহীদ আবুল কাশেম পাঠান যেমন ছিলেন একজন প্রতিভাবান ছাত্র, বিশিষ্ট ছাত্রনেতা তেমনি তার মধ্যে লুকিয়েছিল এক বিরাট সাংবাদিক প্রতিভার। একজন প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিকের মধ্যে যে ধরনের যোগ্যতা প্রতিভা জ্ঞানের গভীরতা দৃষ্টি স্বচ্ছতা ও বিষয়বস্তু উপস্থাপনের দক্ষতা প্রয়োজন ছিল তা তার মধ্যে ছিল। আবুল কাশেম পাঠান তার চিন্তা পরামর্শ ও শ্রমের হাতকে প্রসারিত করে আমাকে সংগঠন পরিচালনায় যেভাবে সহযোগিতা করতেন তা আজীবন মনে রাখার মত।

একাধারে বহুগুণের সমাহার আবুল কাশেম পাঠান শুধু খুলনার নয়, এ দেশের অন্যতম সেরা সন্তান। বিশ শতকের ইসলামী আন্দোলনের এক অমূল্য উপহার।

লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, খুলনা মহানগরী।

www.icsbook.info

রক্তাক্ত ২০ সেপ্টেম্বর
একটি মূল্যায়ন

মিয়া গোলাম কুদ্দুস

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৩। দৈনিক সংগ্রামের তৎকালীন নির্বাহী সম্পাদক মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ভাইয়ের অফিস। তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি হামিদ হুসাইন আযাদ ভাই, শেখ কামরুল আলম ভাইসহ আমরা একটি সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য তৈরি করছি। বিকাল ৫টায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশব্যাপী শিক্ষাঙ্গনসমূহে সরকারি ছাত্র সংগঠনের পরিচালিত সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের বক্তব্য তৈরির কাজ প্রায় শেষ। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। সবাই উদ্বিগ্ন কারণ তখন একেরপর এক সংবাদ আসছে বিভিন্ন জায়গায় শিবিরের উপর আক্রমণের। আবার কোথায় কী ঘটলো, এমন উৎকণ্ঠা সবার চোখে মুখে। শেখ কামরুল আলম ভাই ফোনের রিসিভার রেখে চেহারায় এক উদ্বিগ্নতার ছাপ এঁকে বললেন বি.এল. কলেজে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়েছে। হালিম, রহমত, মিলন ভাই গুরুতর আহত। খুলনা আলিয়া মাদ্রাসায় ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে আমান শহীদ হয়েছে। আমাকে বলা হলো সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্যে এ ঘটনা যোগ করতে। সংগ্রামের কম্পিউটার কক্ষে কাজ করছি। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর তীব্র উত্তেজনা নিয়ে আরও কোন শহীদের খবরের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছি।

এমনি ভারাক্রান্ত আবেগাকুল উদ্বিগ্নতা নিয়ে শিবিরের কেন্দ্রীয় অফিসের সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই একটি খবর যেন বুকের ভেতর শেলবিদ্ধ করলো। আমাদের গাড়িচালক সাত্তার ভাই জানালো বি.এল. কলেজের জি.এস. মুন্সী আব্দুল হালিম ভাই আর নেই। সেদিন বুকের ভেতর কান্না ধরে রাখতে পারিনি। শহীদ হালিম পরে এসে সবার আগে জান্নাতে চলে গেলেন। আর পেছনে রেখে গেলেন তার গোনাহগার দায়িত্বশীলদের। কতবার শহীদ হওয়ার মওকা পেয়েছি। কিন্তু শহীদ হওয়ার

www.icsbook.info

সুযোগ হয়নি। আল্লাহ যাকে কবুল করেন শুধু সেই শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ঢাকায় শহীদের সাথীরা প্রকম্পিত করে তোলে রাজপথ। মিছিলে কান্নায় ফেটে পড়ে শিবির কর্মীরা। মিছিল শেষে কেন্দ্রীয় সভাপতির নির্দেশে কামরুল ভাই এবং আমি রাতেই শহীদি জনপদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। সেদিন রাতে চলন্ত বাসে শহীদের দু'জন দায়িত্বশীল এক অজানা উৎকণ্ঠা আর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে রাতভর অনেক আলোচনা করেছি। পরামর্শ করেছিলাম কিভাবে আমরা এ কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করবো। কেমন করে শহীদদের এ মূল্যবান রক্তে গড়ে তুলবো এ সবুজ জমিনকে। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম শহীদ হালিম, আমাদের স্বপ্নের খুলনাকে গাঢ় লাল রক্তের মূল্যে সাজিয়ে তুলবো। বাতিলের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলবো। বি.এল. কলেজকে ইসলামী আন্দোলনের স্থায়ী ঘাঁটিতে পরিণত করবো।

কিন্তু আমরা শহীদের রক্তে যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম। যে প্রত্যয় আর প্রত্যাশায় বুক বেঁধেছিলাম, "শাহাদোত্তর দুর্বার আন্দোলনের কাঠিন্যতা আর শহীদ আত্মার প্রার্থিত পরাকাষ্ঠা প্রমাণ করতে পেরেছি।" এ দাবী করার সাহস অন্তত আমার নেই। সামগ্রিকভাবে আজ আমাদের মূল্যায়নের সময় এসেছে। ২০শে সেপ্টেম্বরের পূর্বাপর পরিস্থিতির মোকাবেলা, সদর হাসপাতাল মর্গে শহীদের লাশের জিম্মাদারি, জানাজা এবং দাফনোত্তর পর্বতময় সর্বগ্রাসী আন্দোলনের উত্তাল শহীদি কর্মসূচিতে শহীদের ত্যাগসম ভূমিকা তো দূরে থাক বরং প্রতি পদে পদে ভীরুতা, মৃত্যুভয়, দায়িত্বহীনতা আর দুর্বলচিত্ততাই আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল। এ উপলব্ধি আজও আমাকে শহীদের আত্মার কাছে অপরাধী হিসেবে তাড়িত করে প্রতিমূহূর্তে। কিঞ্চিত হলেও সে মূল্যায়ন হয়তো অতীতকে শুধরাবার কাজে লাগতে পারে।

আমি যখন একান্ত একাকী হই মনে পড়ে শহীদদের স্মৃতিকথা। শহীদ হালিম, রহমত, বিমান, আমানের আত্মা যেন তার সাথীদের আহবান করছে। কাছে ডাকছে। চিরমুক্তির জন্য তাদের সঙ্গী হবার।

শহীদ হালিমকেই বেশি কাছে থেকে উপলব্ধি করার জানার সুযোগ হয়েছে আমার। তার জীবদ্দশায় তাকে মূল্যায়নের অবকাশ না পাওয়ার আপশোস, হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করছে। তিনি শুধু শিবিরের নেতা ছিলেন না। তাকে কি কিশোর কি যুবক কি বয়সী দলমত ধর্ম পেশা নির্বিশেষে সকলকেই তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। তার প্রমাণ মেলে শাহাদাতের পরের ঘটনা প্রবাহ। শহীদ হালিমের কফিন তার বাড়িতে পৌঁছালে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। তার নিজের স্কুলসহ পার্শ্ববর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বতঃস্ফুর্ত ছুটি হয়ে যায়। ছাত্র শিক্ষকরা তাদের প্রিয় হালিমকে এক নজর দেখার জন্য ছুটে আসেন। হিন্দু মহিলা পুরুষেরা তার লাশ দেখে কেঁদে কেঁদে বলেছিল, আমাদের সাথে রাস্তায় দেখা হলে খোঁজ খবর নিতেন। সাহায্য করতেন, তারমত ভালো ছেলে আর হয় না। শহীদ হালিমের থানায় সকল রাজনৈতিক দলের নেতারাও সেদিন সমবেদনা প্রকাশ করতে

www.icsbook.info

এসেছিলেন। শহীদ হালিম তার শত সাংগঠনিক ব্যস্ততার মাঝেও, পরিবারের, ভাইবোনদের প্রতি তার দায়িত্ব এক মুহূর্ত ভুলে যাননি। হালিম ভাই নিজে এক দিকে বি.এল. কলেজের সভাপতি ও ছাত্র সংসদের জি.এস.এর সুকঠিন দায়িত্ব পালন করতেন আর হলের খরচ ও পরিবারকে সাহায্য করার জন্য কলেজ থেকে ৪/৫ মাইল দূরে নুরনগর গিয়ে টিউশনি করতেন।

শহাদাতের কয়েকদিন আগে তিনি টিউশনির টাকা দিয়ে বোনদের জন্য স্নো, ক্রিম, শ্যাম্পু ইত্যাদি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি নির্মল চরিত্রের ছিলেন। তার চরিত্রের নির্মলতার প্রতি কেউ কোনদিন টুঁ শব্দটি করতে পারেনি। তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তেলাওয়াত করতেন। আমরা অভিভূত হতাম। এমন আখলাক যাদের তারাই শুধু শহীদ হতে পারে। শহীদ হালিম ছোটদের খুব আদর করতেন। ঈদসহ বিভিন্ন উপলক্ষে কার্ড পাঠাতেন। তাদের মাঝে তিনি ছিলেন প্রিয় হালিম ভাই। তার হাস্যোজ্জ্বল মিষ্টি হাসি আর অমায়িক ব্যবহারই তাকে সবার প্রিয় পাত্রে পরিণত করেছিল। আর তাই তো এত অল্প সময়ে বিএল কলেজের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর প্রাণপ্রিয় নেতা হতে পেরেছিলেন। হালিম ভাই দায়িত্বশীলদের যে কোন আনুগত্য পালনে ছিলেন সদা সজাগ। সুকঠিন দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন হাসি মুখে। আনুগত্যের প্রতি তার এই অবিচলতা তাকে বড় বড় দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত করছিল। খুলনা মহানগরীর সভাপতি আঃ ওয়াদুদ ভাই, হালিম ভায়ের শাহাদতের পর বলেছিলেন, তাকে আমি খুলনা মহানগরীর ভবিষ্যৎ দায়িত্বশীল হিসেবে নির্বাচন করেছিলাম। কিন্তু প্রভু তাকে কবুল করে নিলেন।

হালিম ভাই কম কথা বলতেন, বেশি চিন্তা করতেন, গভীরভাবে ভাবতেন। শাহাদতের পূর্বে বেশ কিছুদিন থেকে এ ভাবান্তর যেন আরও গভীরতা পায়। এখন বুঝি শহীদ হওয়ার আকাংখা, শহীদ হওয়ার ভাবনা তাকে আচ্ছন্ন করতো। ২০শে সেপ্টেম্বর ঘটনার দিন সকালে বিএল কলেজের সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর ভাই তার রুমে গিয়ে তাকে মুখে হাত দিয়ে এক গভীর ভাবনার নিমজ্জিত দেখেছিলেন। হয়তো তিনি শহীদ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাকে দেখেছি তার নিজের এলাকায় তিনি কিভাবে সংগঠন গড়েছিলেন। দ্বীনের পাগল ছিলেন যেন। সারাক্ষণ দাওয়াতী কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। প্রভাবশালী পরিবারের সন্তানরাই ছিল তার প্রথম টার্গেট। অল্প সময়ের মধ্যে এলাকাটি একটি আদর্শ সংগঠনে পরিণত করেছিলেন। আজকে আমরা দাওয়াতী কাজ ভুলে গেছি। হালিম ভাইয়ের মত দায়িত্বের সেই পেরেশানী নেই। নেই কঠোর পরিশ্রম। নিজের সমস্যার কথা তেমন বলতেন না। ওজর আপত্তি কাকে বলে জানতেন না। তার ছিল এক দুর্জয় আকাংখা নিজকে সবদিক থেকে গড়ে তোলার ব্যাপারে তার অদম্য স্পৃহা তাকে সাফল্যের পানে ধাবিত করেছিল। আমার চোখে দেখা হাতে গোনা কয়েকজন অসম সাহসী জিন্দাদিল আমাকে আত্মত্যাগের প্রতি বেশী অনুপ্রাণিত করেছে। আত্মপ্রত্যয়ী করেছে। আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দেয়ার লোভ সৃষ্টি করেছে। শহীদ হালিম তাদের

www.icsbook.info

অন্যতম। ইসলাম বিরোধীদের রক্ত চক্ষুকে তিনি কখনো পরোয়া করেননি। যতবার আমার উপস্থিতিতে সংঘর্ষের ময়দানে তাকে দেখেছি প্রচন্ড ক্ষিপ্রতায় এবং বীরত্বপূর্ণ ভূমিকায় তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ২০শে সেপ্টেম্বর শহীদ হওয়ার কিছু আগে ক্ষুধা আর ক্লান্ত শরীর নিয়ে মসজিদে আল্লাহর সান্নিধ্যে হাজির হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে লড়ে গিয়েছেন। শেষ মুহূর্তে তিনি মসজিদে পাষণ্ডদের সশস্ত্র আক্রমণের চূড়ান্ত মুকাবেলা করেছেন। তিনি নিজের আত্মরক্ষার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তো শহীদ হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। খুনিরা তার জান্নাত পাওয়ার অদৃশ্য ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করলো নির্মম হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। অনেকেই তো শহীদ হওয়ার আকাংখা পোষণ করেন। কিন্তু ক'জন শহীদ হতে পারেন। আল্লাহ শুধু তার প্রিয় বান্দাদেরকেই কবুল করে থাকেন।

১৯৯২ সালে ঘাদানিকের হাতে শহীদ হয়েছিলেন শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান। ইসলাম বিরোধীদের দম্ভ তিনি সহ্য করতেন না। বিমান ভাই সব সময় চাইতেন বাতিল মতাদর্শ উৎখাত করে ইসলামী আন্দোলনকে তার জমীনে একক আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে। তাই সব সময় তিনি জীবনকে ঝুঁকি এবং সংঘাতের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন। শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত সংগ্রাম আর বাতিলের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। শহীদ হালিম, রহমত, বিমান, আমান এর শাহাদাত বার্ষিকীতে আজ আমার অনুভূতিকে তীব্র দোলা দিচ্ছে। মনের কোন অজানা তন্দ্রীতে গভীর ক্ষেভোর সৃষ্টি করেছে। আত্ম উপলব্ধি আর আত্মসমালোচনার এক অপরিহার্য তাগিদ একথাই বার বার ডেকে বলছে। শহীদি রক্তে সিক্ত খুলনায় এ উর্বর জমীন। সে জমীনকে শহীদ হালিম, রহমত, বিমান, আমান তাদের প্রিয় জীবন নিংড়ানো তাজা খুন ঢেলে রক্তাক্ত করেছে। এখনো যেখানের তাজা রক্ত শুকায়নি। রক্তাভ লেগে আছে সবুজ ঘাসের আশায়। সে শহীদি জনপদের জিম্মাদারি আমরা কি পালন করতে পারছি? শহীদদের স্বপ্নীল সে স্বপ্নকে ধারণ করে শহীদ হওয়ার তীব্র বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে শহীদদের প্রিয় সাথীদের। সকল ভীরুতা, জড়তাকে পরিহার করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে আরও বেগবান করতে হবে। আল্লাহ শহীদ হালিম, বিমান, রহমত, আমানের শাহাদাতকে কবুল করুন, আমাদেরকেও শহীদ হওয়ার তীব্র বাসনা নিয়ে শহীদদের অসমাপ্ত দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসার তৌফিক দিন। আমীন!

লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, খুলনা মহানগরী।

www.icsbook.info

সে ছিল সকলের প্রিয় গোলাপ

মু. গোলাম মোস্তফা আল মুজাহিদ

পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ মৃত্যুর পরও চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, থাকবেও চিরদিন- শহীদ আবুল কাশেম পাঠান তাদের একজন। অল্প সময়ের ব্যবধানে মানুষের মাঝে ব্যাপক পরিচিতি, মানুষের ভালবাসা... সকল মহলে আপন হয়ে যাওয়ার স্বর্গীয় গুণাবলী ছিল তার মধ্যে প্রবল। সুঠাম দেহের অধিকারী, সদা হাস্যোজ্জ্বল কোমল হৃদয়ের এ মানুষটির ব্যক্তিগত কোন দুশমন ছিল বলে কোন প্রমাণ আজও মেলেনি। শুধু ছিল আদর্শিক দ্বন্দ্ব বাতিলের সাথে। সকল এলাকার সকল মহলের এমনকি ভিন্ন আদর্শের নেতা কর্মীরাও কাশেম পাঠানকে একান্ত আপন বলেই জানত। যার সাথে একবার পরিচয় হত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হলে কাশেম ভাইয়ের সাথে কুশলাদি জিজ্ঞাসা না করে এক কদমও অগ্রসর হতে যেন ভাল লাগত না কারো। তার সাথে পথ চলতে গেলে মাঝে মাঝে যেন একটু বিরক্ত হয়ে যেতে হত যার সঙ্গে দেখা হত সেই যেন কিছু সময় কাশেম পাঠানের সাথে কাটাতে চাইত। সকলে যে তার পরিচিত একান্ত আত্মীয়। কিছু সময় তার সাথে কথা বলতে পারলে যেন অনাবিল আনন্দ খুঁজে পেত, অনেক জটিল সমস্যার সমাধান খুঁজে পেত। ছাত্র-শিক্ষক, বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের একান্ত কাছের মানুষ ছিলেন কাশেম পাঠান। বিএল কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে দু'দুবার সর্বাধিক ভোট পেয়ে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তার শাহাদাতের পর বৃহৎ খুলনা যেন বেদনার নগরীতে পরিণত হয়ে যায়। স্থানীয় পত্রিকার ভাষ্যমতে শহীদ কাশেম পাঠানের শোক মিছিল খুলনার ইতিহাসে সর্ববৃহৎ মিছিল। তাকে হারানো বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল সর্বস্তরের মানুষ। তিনি ছিলেন সকলের আত্মার একান্ত আত্মীয়। জানাযা নামাজের পর

www.icsbook.info

দেখলাম একজন পুলিশ কর্মকর্তার চোখে পানি। তিনি বললেন, 'যদি আমাদের শরীরে পুলিশের পোশাক না থাকত তবে কাশেম পাঠানকে হারানোর বেদনায় চিৎকার করে কান্নাকাটি করতাম।' কিন্তু আমরা তো চাকুরী করি তাই বেদনা ঠেকাতে না পেরে মনের অজান্তে নীরবে চোখ দিয়ে পানি গড়িয়েই চলেছে নিজেকে সামলাতে পারছিনা। একজন সাংবাদিক বললেন, 'কাশেম ছিল খুলনার একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, আজ সে নক্ষত্রের পতন হয়ে গেল।' একজন শিক্ষক বললেন বাতিলরা কাশেম পাঠানের যোগ্য নেতৃত্বকে ভয় করত কারণ দিন দিন তার জনপ্রিয়তা বেড়েই চলছিল। পরিকল্পিতভাবে ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিল। একাদশ শ্রেণীতে একজন ভর্তিচ্ছু ছাত্রের পিতা আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, "কাশেম যে কত ভাল ছেলে ছিল শহীদ হবার পূর্বে মাত্র একদিন তার সাথে পরিচয় হল, অল্প সময়ের আলাপে সে যে আমাকে আপন করে নিল, আমি যেন তাকে একটু মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারছি না'। একথা বলতে বলতে লোকটির দু'টি চক্ষু থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল বেদনার শীতল বারি। তার শাহাদাতের বেশ কয়েকদিন পর একজন আইনজীবীর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম বিভিন্ন আলাপ হচ্ছে হঠাৎ তার দু'টি চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে পানি। তিনি বললেন-মুস্তফা যখন কাশেমের কথা মনে পড়ে তখন আমি সহ্য করতে পারি না। ওর হাস্যোজ্জ্বল চেহারাটা যেন সব সময় আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমি ওকে ভুলতে পারছি না। এভাবে অসংখ্য মানুষ কাশেম পাঠানের শাহাদাতের বেদনায় মুষড়ে পড়েছেন। একটি বৎসর অতিক্রান্ত হতে চলেছে এ ধরায় নেই তার পদচারণা। কিন্তু অসংখ্য মানুষের হৃদয় আকাশে তিনি যেন সদা জীবন্ত আপনজন। আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী শহীদরা মরে না কাশেম পাঠান এর একটি বাস্তব সাক্ষী। সর্বস্তরের মানুষের হৃদয় আকাশে কাশেম পাঠান একটি সৌরভমণ্ডিত ফুটন্ত গোলাপ। অকালে যারা ঝরিয়ে দিল এ গোলাপ চিরদিন অম্লান হয়ে রবে মানুষের কাছে। এ গোলাপের অবর্তমানে শুধু বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়লে তার প্রতি গভীর ভালবাসার হক আদায় হবে না বরং তার প্রিয় শ্লোগান এবং স্বপ্ন, 'বিপ্লব-ইসলামী বিপ্লব'-এ শ্লোগানে সকলকে শামিল হতে হবে আর যারা শামিল আছি তাদেরকে কাশেম পাঠানের মত দুর্বার নির্ভীকভাবে এগিয়ে যেতে হবে মঞ্জিল পানে।

লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, খুলনা মহানগরী।

www.icsbook.info

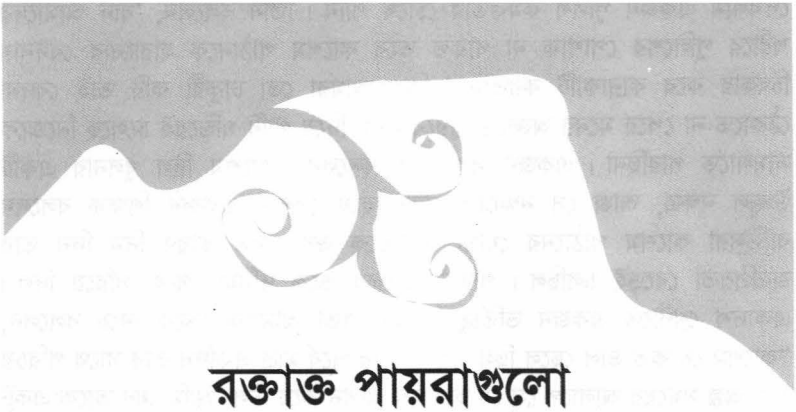

রক্তাক্ত পায়রাগুলো ক্ষতবিক্ষত ভুলুণ্ঠিত

এ্যাডঃ শেখ জাহাঙ্গীর হুসাইন হেলাল

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন মসৃণ, কণ্টকমুক্ত, কুসুমাস্তীর্ণ পথ নয়। যুগে যুগে বিভিন্ন জনপদে পৃথিবীর একথা অকপটে বলে। আল্লাহর সৃষ্টি এ সুন্দর পৃথিবীতে সত্য মিথ্যা দ্বন্দ্বের ইতিহাস অতি প্রাচীন। যুগে যুগে রিসালাত ও আল্লাহর অনুগত বান্দারা সব সময়ই চেষ্টা করেছে সত্যকে উর্দ্ধে তুলে ধরতে। অন্যদিকে মিথ্যা ধ্বজাধারীরা সত্যের টুঁটি চেপে ধরতে চেয়েছে, ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চেয়েছে সত্যের উজ্জ্বল আলোক শিখাকে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী তারা ব্যর্থ হয়েছে। সত্যের এ আলোকে তারা নিভাতে পারেনি বরং সত্যের এ আলো সীমাবদ্ধ এলাকা থেকে বিস্তৃত প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। ছড়িয়ে পড়া সেই সত্যের আলোকবর্তিকার দীপ্তিমান জ্যোতি এবং রিসালাতের পর ইসলাম প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ আন্দোলনে অঞ্চলভেদে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। সত্য মিথ্যার লড়াই পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে মুছে যায় নাই। আজও সে লড়াই চলছে এবং চলতেই থাকবে। সে লড়াইয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের পক্ষ থেকে শিবির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই হত্যা, অপপ্রচার ও তথ্য সন্ত্রাসের শিকার। রক্তস্নাত খুলনার জনপথ এর ব্যতিক্রম নয়। বাতিলের আঘাতে সত্যের সেনানীরা আক্রান্ত, ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আজ খুলনা শহর পরিণত হয়েছে ৫ শহীদের রক্ত পিচ্ছিল নগরীতে। শহীদের তাজা খুন সত্যের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। শহীদের রক্তের স্রোতধারা স্মৃতির সাগরে প্রবাহিত ঈমানী চেতনা। সেই চেতনায় খুলনার ইসলামী আন্দোলনের গতিধারা আরও বেগমান করতে শহীদদের জীবনী ও স্মৃতিকথা আমাদের অনুপ্রেরণা। কারণ ওরা মরেনি, ওরা জীবন্ত প্রতিদিন আমাদের চারপাশে আমাদের আন্দোলনে, আমাদের কর্মে, আমাদের সফলতায়।

www.icsbook.info

শহীদদের জীবনের যে অংশের সাথে আমি পরিচিত ছিলাম তাকে প্রকাশ বা প্রচার করার মনোবৃত্তি আমার নেই। শুধুমাত্র কিছু কথা ছিটেফোঁটা স্মৃতি কিয়াদংশ বলার চেষ্টা যে আবেগের ছিন্নমালা। আমি ১৯৮৮ সালের ০১ জানুয়ারি শিবিরে যোগদান করি এবং ১৫ জানুয়ারি কর্মী হিসাবে ঘোষিত হই। তখন আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। সাংগঠনিক জীবনে আমি প্রথম শহীদের নাম শুনি ১৯৮৮ সালের ০৭ এপ্রিল শহীদ নাসিম উদ্দীন চৌধুরীর শাহাদাতের খবর। শহীদ নাসিম উদ্দীন চৌধুরীর শাহাদাত আমাকে খুব বেশি আন্দোলিত করেছিল। আবেগাপ্লুত কান্না মিশ্রিত প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিয়েছি। কেন যেন আমি বার বার কেঁদেছি। এক অদৃশ্য অজানা বন্ধন আমাকে বারবার কাঁদিয়েছে। কষ্ট পেয়েছি ভাই হারানোর বেদনায়, কিন্তু অনুপ্রাণিত হয়েছি দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এগিয়ে যাবার জন্য। এরপর সাংগঠনিক জীবনে বারবার শাহাদাতের খবর আসে, শহীদের মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়, বেদনায় আত্মা রক্তাক্ত হয়। প্রতিবাদ করি, পোষ্টারিং করি, বুলেটিং বিলি করি নীরবে কান্নাও পেত আবার থেমেও যেত। কিন্তু শহীদ হালিমের শাহাদাত, শহীদ আবুল কাশেম পাঠানোর শাহাদত, শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীনের শাহাদাত আমাকে নীরবে নিভৃতে আজও কাঁদায়। কারণ ওদের সাথে অনেকের মত আমারও আছে অতি নিকট থেকে কিছু স্মৃতি জড়িত। ওরা নেই আছে শুধু ওদের স্মৃতি সকল কাজে স্পর্শিত হয়ে।

শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান খুলনার প্রথম শহীদ। তাঁর শাহাদাতের দিন আমার তাঁর পাশে থাকার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছিল। সেদিন ছিল ১৯৯২ সালের ২৫ মার্চ ২০ রমজান। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নামে একটি বিশাল মশাল মিছিল আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় তারেরপুকুরস্থ মহানগর শিবিরের কার্যালয়ে হামলা করে। আমরা ২০/২৫ জন জনশক্তি ইফতারের পর আমাদের অফিসে অবস্থান করছিলাম। মহানগরী সেক্রেটারি মিয়া গোলাম কুদ্দুস ভাই আমাদের মধ্য থেকে শেখ আবদুল ওয়াদুদ ভাইয়ের নেতৃত্বে আমিসহ আমিনুল ইসলাম বিমান ভাই, আবুল হোসেন ভাই, রফিকুল ইসলাম (এক জনের নাম জানা নেই) মোট ৬ জনের একটি গ্রুপ অফিসের সিঁড়ি নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমরা দোতলা অফিসের নিচে অপর দিকে অবস্থান করছিলাম। এমন সময় মশাল মিছিলটি আমাদের অফিসকে চারিদিক ঘিরে আক্রমণ শুরু করে। মিছিলের সম্মুখ ভাগ অফিসের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে এলে শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান ভাই তাকবির ধ্বনি তুলে প্রতিরোধে এগিয়ে এলেন। আমরাও মাত্র ৬ জন হাজার লোকের মিছিলের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তুলি। আমার বাম দিকে ছিল শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান। নাস্তিক্যবাদীদের মশালের আঘাতে প্রথমেই আমিনুল ইসলাম বিমান মাটিতে পড়ে যায়। হঠাৎ আমার মাথায় মশালের লাঠি দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হই। হাতে এলোপাতাড়ি আঘাত লেগে হাত থেকে লাঠি ছিটকে পড়ে আমি পড়ে যাই মাটিতে, তারপর আঘাতের পর আঘাত। মিছিলকারীরা মূলত আমাদের

www.icsbook.info

অফিসকে দেশের বিভিন্ন জায়গার ন্যায় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে অগ্নি সংযোগ করতে চেয়েছিল। অথচ মাত্র ৬ জনের প্রতিরোধে মিছিল অফিসের সিঁড়ি থেকে প্রায় ২০ গজ দূরে আটকে যায়। আমাদের অফিস ভাঙ্গার ওদের স্বপ্ন তছনছ হয়ে যায়। ওরা সামনে এগুতে পারেনি। এটি নিছক মহান আল্লাহর সাহায্য। আমি আহত হয়ে পড়েছিলাম মিছিলের সামনে যেখানে আমাকে আঘাতের পর আঘাত করতে ছিল কিন্তু সামান্য সময়ের জন্য জ্ঞান হারায়নি। অথচ কিছু সময় পর আমি আমার অস্তিত্ব অনুভব করি আমাদের অফিসের সিঁড়ির নিচে। আমি বসে আছি আর ঝর্না ধারার মত আমার মাথা থেকে রক্ত পড়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। আমি আজও হিসাব মিলাতে পারিনা কিভাবে ঘটনাস্থলে পড়ে থাকা অবস্থা হতে ২০ গজ পিছনে সিঁড়ির নিচে আমি বসে থাকলাম? মহানগরীর সভাপতি ইলিয়াছ ভাই কয়েজনকে সাথে করে প্রতিরোধে এগিয়ে আসলেন এবং আমাকে সিঁড়ির নিচে বসে থাকতে দেখে আমাকে হাসপাতালে যেতে বললেন। আমি জামায়াত অফিসে পৌঁছালে অফিস থেকে কেউ একজন রিক্সাযোগে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওখানে আমিনুল ইসলাম বিমান ভাইকে আমি দেখেছি আহত অবস্থায় গোঙড়াচ্ছে। তাঁর মাথার ভেতরে রক্তক্ষরণ হওয়ায় তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। তাঁকে আল্লাহ শহীদ হিসেবে কবুল করেছেন। আর আমি বেঁচে আছি সেই স্মৃতির গভীর রহস্য নিয়ে। কিভাবে ঘটনাস্থল থেকে ২০ গজ দূরে আমি অবস্থান করছিলাম সে হিসাব আজও মিলাতে পারিনি। ঘটনাস্থলেও-সিঁড়ির নিচে যে জমাট বাঁধা রক্ত পড়েছিল সেই রক্ত আমার মাথা থেকে প্রবাহিত। কিন্তু অনেকের ধারণা ছিল হয়ত আজও সেই ধারণা আছে অফিসের সিঁড়ি চত্বরে শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান ভাইয়ের রক্ত জমাট বাঁধা ছিল। মস্তক অবনত করি সেই মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে যিনি বদরের সাহায্য আজও পাঠান এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা যদি আমাদের সাধ্য সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করতে থাকি তাহলে আল্লাহ সাহায্য পাঠাতে থাকবেন।

১৯৮৯ সালের ১৮ আগষ্ট তা'লিমুল মিল্লাত মাদ্রাসার মসজিদের রাত ৯টায় সাথী শববেদারি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আমি তখন সাথী প্রার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। শেষ রাতের প্রোগ্রামের শুরুতে আমি সহ ৮ জন সাথী প্রার্থীকে শপথ পড়ানো হয়। সকলের নাম এই মূহূর্তে স্মরণ নেই। শুধু মনে আছে মনে থাকতে হবে সেই নামটি যিনি শপথ অনুষ্ঠানে শুরুতে সুললিত মধুর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করেছিলেন শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম। শপথের পর তখন পরস্পর কোলাকুলি করতেন একটি আবেগঘন পরিবেশে। আমি ও মুন্সী আব্দুল হালিম আলিঙ্গনাবদ্ধ হলাম। তিঁনি তখন আমার চেয়ে একটু লম্বা ছিলেন। তাই খানিকটা ঝুঁকে এসে পড়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। পরস্পরের চোখে পানি, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না তারপর ছেড়ে দিলেন আমার হৃদয়ে ভালবাসা ছড়িয়ে। এই স্মৃতি কি ভোলা যায়, কখনও ভুলতে পারিনি। আমি একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অবস্থায় ১৯৯০ সালে সদস্য শপথ নিয়েছিলাম। শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম দু'বছর পর সদস্য

www.icsbook.info

হয়েছিলেন। সদস্য বৈঠকে তার তেলাওয়াত সকলকে মুগ্ধ করতো। তিনি দায়িত্বশীলদের সাথে সকল সময় অনুকরণীয় আচার আচরণ করতেন। ১৯৯৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর খুলনা আলিয়া মাদ্রাসায় শহীদ আমানের শাহাদাতের খবর শুনে ছুটে গেলাম সেখানে। তখন মোবাইল ফোন ছিল না মুখে মুখে সংবাদ ছড়াতো। শহীদ আমানের কফিনের কাছে জি.এম. শফিক ভাই দাঁড়ানো ছিল। আমাকে দেখে এগিয়ে এসে অশ্রুসজল নয়নে বললেন বি.এল. কলেজে হালিম ভাই শহীদ হয়েছেন শুনে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি, আজও বিশ্বাস করি না। শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম বেঁচে আছে আমার হৃদয়ে, আমাদের হৃদয়ে। আজও তার কুরআন তেলাওয়াত হৃদয়ের গহিনে শুনতে পাই।

শহীদ আবুল কাশেম পাঠানের পদধ্বনি আজও আমি শুনি। সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখ আজও স্বপ্ন ছড়ায়। নেতৃত্বের এক দৃঢ় ব্যক্তিত্ব। গোলাপের সুভাস ছড়িয়ে কাছে টানে অগণিত হৃদয়। অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতির কর্মদক্ষতা অতি নিবিড়ে কাছে টেনে নিত সকলকে। ত্যাগ এবং উদারতার এক অনমনীয় দৃষ্টান্ত। একদিন তাঁর কাছে সুন্দর একটি কলম দেখলাম। আমি তাঁকে শুধুমাত্র বললাম কাশেম ভাই আপনার কলমটা তো বেশ সুন্দর। তিঁনি সাথে সাথে আমাকে কলমটি দিয়ে দিলেন। আমি কলমটি পকেটে নিয়ে পরের দিন সুন্দরবন কলেজে গেলাম। কলেজের ছাত্রদলের কর্মী মিরাজ আমার নিকট থেকে কলমটি নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললো কলমটি আমার ভাল লেগেছে। আমি তাকে বললাম কলমটি আমাকে যিনি দিয়েছেন তাকেও তোমার ভাল লাগবে। আমাকে জিজ্ঞাসা করল কে দিয়েছেন। আমি বললাম কলমটি আমাকে বি.এল. কলেজের ভারপ্রাপ্ত জি.এস. আবুল কাশেম পাঠান ভাই দিয়েছেন। তারপর কলমটি আমি মিরাজকে দিয়ে দিলাম। কয়েকদিন পর ১৯৯৪ সালের ২৩ অক্টোবর খুলনা সিটি কলেজের সামনে সন্ত্রাসীরা আবুল কাশেম পাঠানকে গুলি করে বুক ঝাঁজরা করে দেয়। শহীদ আবুল কাশেম পাঠান শাহাদাত বরণ করেন। শুরু হয় উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। কোন এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীদের মধ্যে আমি মিরাজকে দেখতে পাই। পকেটে ওর সেই কলম আছে কিন্তু কলমটিতে যার স্পর্শ লেগেছিল সে নেই। একটু আগে সে সবাইকে ছেড়ে ভালবাসা ছড়িয়ে জান্নাতের টানে চলে গেছেন ওপারে সকলকে কাঁদিয়ে। আজও কাঁদে বি.এল. কলেজ, যেখানে হালিম ও কাশেমকে দেখা যেত হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালাদের মত। যে দিকে তাঁরা যেত শত শত ছাত্রছাত্রী ছুটে যেত পিছু পিছু। যেন ফুটন্ত গোলাপ সুগন্ধি ছড়ায়, ছুটে যায় সবাই সেদিকে। বি.এল. কলেজের গাছে গাছে আজ আর সবুজ নেই ঝলসে গেছে সব। কলেজের প্রকৃতি অপেক্ষমাণ যেন শহীদ হালিম, শহীদ কাশেম পাঠানকে ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। কিন্তু সূর্য ফিরে, আকাশের চাঁদ ফিরে, শুধু ওরা ফিরে না, ফিরবে না কোন দিন।

২০০০ সালের কোন একদিন তারিখ মনে নেই। আমি তখন শিবিরের মহানগরী সভাপতি ছিলাম। আমাদের একটি বিশাল মিছিল পিকচার প্যালেস মোড় ঘুরে প্রেস

www.icsbook.info

ক্লাব হয়ে তারের পুকুরের দিকে আসছিল। হঠাৎ মিছিলের পিছন ভাগে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়। মিনিট পনের সংঘর্ষ চলে। এক পর্যায়ে আমাদের মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পুলিশ বেধড়ক লাঠি পেটা করে। সবাই এদিক সেদিক আশ্রয় নেয়। মহানগর জামায়াতের নেতৃবৃন্দ তারের পুকুর মসজিদে অবস্থান নেয়। আমি ঘটনার আকস্মিকতায় একটি দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকি। হঠাৎ করে আমার মোবাইল ফোন বেজে ওঠে। তখন হাতে গোনা মাত্র দু-চারটি মোবাইল ফোন দায়িত্বশীলদের কাছে। ফোন রিসিভ করে শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন ভাইয়ের কণ্ঠ শুনতে পাই। তিনি আমার অবস্থান সম্পর্কে জানতে চান এবং আমি নিরাপদে আছি কিনা জানতে চান। আমি অবাক হয়ে যাই তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলী দেখে। একটা হইচই পরিবেশে শহীদ বেলাল ভাই শিবিরের সভাপতির খোঁজ রাখে। কি অদ্ভুত সে নেতা! সংগঠনের যে কোন সমস্যা শুনলে তিনি ছুটে আসতেন সুশীতল ছায়া হয়ে। আজকের দুর্দিনে আজ সে নেই উল্কার মত আর ছুটে আসবে না কোন দিন। আমাদের কাজের বাঁকে বাঁকে শহীদ বেলাল ভাইয়ের শূন্যতা অনুভব করি। তাঁর শূন্যতা পূরণ হওয়ার মত নয়। নির্ভীক এক চরিত্রে সকলকে সাহসী করে তুলতেন। কিন্তু, আজ সাহস দিতে তিঁনি নেই, নেই কারো সমস্যার সমাধানে কারো পাশে। সবাইকে অসহায় করে হারিয়ে গেছেন চিরদিনের জন্য। তাঁর প্রিয় "ঝড় যদি ওঠে.... মাঝ দরিয়ায়, ভয় করি না তাতে...., নবী মোর..... আছেন তরীতে, কাণ্ডারী হয়ে রক্ত মশাল জ্বেলে...." গানটিতে আজও তাঁর কণ্ঠ শুনতে পাই। শহীদ বেলাল ভাইকে আমরা খুঁজে পাবো তাঁর প্রিয় গাণের মাঝে, বেঁচে থাকবেন তিঁনি গানের টানে।

খুলনার আন্দোলনে সংগ্রামে শহীদদের রক্ত উর্বর করেছে ময়দানকে। সে ময়দানকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্ফুটিত হয়েছিল কিছু গোলাপ। ইসলামী আন্দোলনের জন্য ফোটা সে গোলাপগুলো অকালে ঝরে গেল। যাঁরা ছিল শান্তির কপোত তারা আজ শান্ত ঘুমন্ত। রক্তাক্ত পায়রাগুলো আজ ক্ষতবিক্ষত ভূলুণ্ঠিত চির নিদ্রায় শায়িত।

লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, খুলনা মহানগরী।

www.icsbook.info

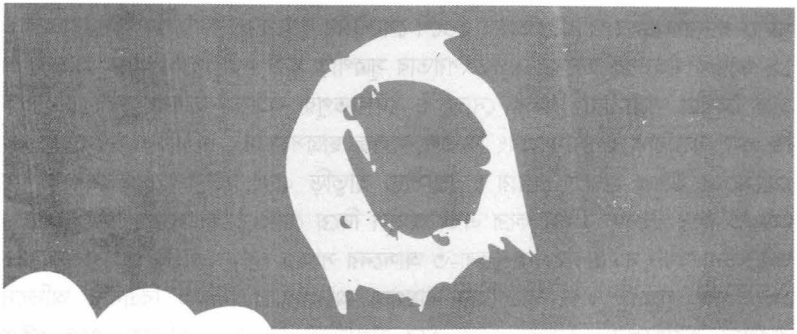

বুকের রুধিরে লেখা সেই ইতিহাস

মাকসুদুর রহমান মিলন

প্রলয়ঙ্করী ঝড় আর বজ্র যদি ফুলে ফুলে সুশোভিত একটি সাজানো বাগানে উপর্যুপরি আঘাত হানতে থাকে তাহলে মুহূর্তেই ফুলের পাঁপড়িরা যেমন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ধূলিতে গড়াগড়ি যায়, স্বর্ণালি ডানার পাখিরা যখন ঝলসানো কাবাব হয়ে ছিটকে পড়ে মাটিতে, বন্ধ হয়ে যায় তাদের সুললিত কণ্ঠের গান, ২০শে সেপ্টেম্বর '৯৩ সন্ত্রাসীদের পৈশাচিক ছোবল ঠিক একইভাবে হাজারো ছাত্র-ছাত্রীর তারুণ্যদীপ্ত পদচারণায় মুখরিত বি.এল. কলেজের পরিবেশকে বিধ্বস্ত ও ক্ষত বিক্ষত করে পরিণত করে একটি সাক্ষাৎ ধ্বংসস্তুপে। দীর্ঘদিন সেখানকার সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখগুলো ছিল স্বজন হারানোর বেদনায় কাতর। প্রতিটি প্রাণই আশংকিত ছিল সন্ত্রাসীরা আবার না জানি কখন নারকীয় তাণ্ডব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শান্তিপ্রিয় শিক্ষার্থীদের উপর। একই পরিবেশ বিরাজমান ছিল দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান খুলনা আলিয়া মাদ্রাসাতেও।

১৯৯৩-এর ২০শে সেপ্টেম্বর ক্ষমতাসীন বিএনপি মদদপুষ্ট জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও তাদের দোসররা সারা মহানগরীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোকে সন্ত্রাসের লীলাভূমিতে পরিণত করে। সন্ত্রাসীরা বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদের জি.এস. এবং শিবিরের কলেজ সভাপতি মুন্সী আব্দুল হালিম, সাহিত্য সম্পাদক ও ক্যাম্পাস সেক্রেটারি শেখ রহমত আলী এবং খুলনা আলিয়া মাদ্রাসার ইয়াতীম ছাত্র আমানুল্লাহ আমানকে প্রকাশ্য দিবালোকে বর্বরোচিতভাবে খুন করে হত্যা ও সন্ত্রাসের এক কলংকজনক অধ্যায় রচনা করে। ঘটনার আবেগহীন বর্ণনাই প্রমাণ করবে কত জঘন্য ছিল খুনিদের সেই খুন পিপাসা। পক্ষান্তরে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী শিবির কর্মীরা কতখানি উজ্জীবিত ছিল শাহাদাতের তামান্নায়।

www.icsbook.info

খুনিদের নরক গুলজার করা তাণ্ডব ২০শে সেপ্টেম্বর দুপুরে চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করলেও ১৯ তারিখ সন্ধ্যায়ই তাদের অপতৎপরতার সূত্রপাত ঘটে। ঐ দিন সন্ধ্যায় ছাত্রদল ও ছাত্র মৈত্রীর সন্ত্রাসীরা শিবির নেতা ও দৌলতপুর কলেজ ছাত্রসংসদের নির্বাচিত জি.এস. কামরুল ইসলাম এবং বি.এল.কলেজ ছাত্রসংসদের নির্বাচিত সদস্য আব্দুল মোমেনের উপর হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা হাতুড়ি এবং ইট দিয়ে তাদের মাথায় আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে এবং আঙ্গুল দিয়ে চোখ তুলে নেয়ার চেষ্টা চালায়। এই ঘটনা যখন ঘটছিল তখন খুলনা-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও হুইপ আশরাফ মাত্র ১০০ গজ দূরে বি.এল. কলেজের যায়গায় অবৈধভাবে নির্মিত বিএনপি অফিসে অবস্থান করছিলেন। হামলা শেষ করে সন্ত্রাসীরা বিএনপি অফিসে এলে হুইপ তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে অফিস ত্যাগ করেন।

পরের দিন ২০শে সেপ্টেম্বর '৯৩ দিনটি অন্যান্য দিনের মতই শান্ত ছিল। তবে কলেজ বন্ধ থাকায় ছাত্রছাত্রীদের সমাগম ছিল অপেক্ষাকৃত কম। তারপরও অফিসের কাজে যারা এসেছিলেন তারাও দুপুর দেড়টার মধ্যে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যায়। ছাত্র সংসদের কর্মকর্তা এবং হাতে গোনা কয়েকজন পরীক্ষার্থী ছাড়া হোস্টেলও ছিল প্রায় ফাঁকা। দুপুর আড়াইটার দিকে হলে অবস্থানরত ছাত্ররা কেউ কেউ হলের মসজিদে জোহরের নামাজ আদায় করছিলেন। কয়েকজন ডাইনিং-এ দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। আমি নিজেও ঐ সময় খাবার খাচ্ছিলাম। অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ জি.এস. মুন্সী আব্দুল হালিম তখনও আহারের সুযোগ পাননি। তিনি অধ্যক্ষের কার্যালয়ে সংসদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন।

> "আমি আপনাকে সেফ করার জন্যে আপনার পিছনে পিছনেই তো যাচ্ছিলাম। আমার কথা না শুনে ওদিকে কেন গেলেন? আমার কথা শুনে চললে তো আর এভাবে গুলি খেতে হতোনা। কত বড় মনের অধিকারী হলে একজন মৃত্যু পথযাত্রী মানুষ এভাবে অপরকে নিয়ে চিন্তা করতে পারে তা একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়।"

শিবিরের মহানগরী কলেজ জোনের পরিচালক ও ছাত্র সংসদের সাবেক জি.এস. আব্দুর রহিম ও সাহিত্য সম্পাদক শেখ রহমত আলী আহত আব্দুল মোমেন এবং কামরুল ইসলামকে দেখে হাসপাতাল থেকে ফিরছিলেন। হঠাৎ করেই খবর আসে ছাত্রদল, ছাত্র মৈত্রী, ছাত্র ইউনিয়ন ও যুবদলের আর্মস ক্যাডারসহ দুই তিনশ বহিরাগত পেশাদার গুন্ডা মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে বি.এল. কলেজ ঘিরে রেখেছে। মুন্সী আব্দুল হালিম খবর পেয়ে দৌড়ে ছুটে আসেন তিতুমীর হলে। মাত্র ৩৫-৪০

www.icsbook.info

জন জানবাজ শিবির কর্মীকে তিনি হল মসজিদে সমবেত করে জীবনে শেষ বারের মত হেদায়াত প্রদান করেন।

সংক্ষিপ্ত সেই সমাবেশে তিনি বলেন, সন্ত্রাসীরা বি.এল. কলেজ থেকে ইসলামের আলোকে নিভিয়ে দিতে চায়। আমাদের জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও বি.এল. কলেজে ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে চাই। এজন্য যদি কাউকে শাহাদাত বরণ করতে হয় তাহলে জেনে রাখবেন মুন্সী আব্দুল হালিমই হবে প্রথম শহীদ। সমাবেশ শেষ করে শিবির কর্মীরা হল থেকে নিচে নেমে আসেন। ইতোমধ্যেই পেশাদার সন্ত্রাসীরা ১ম গেট, ২য় গেট, প্রাইমারি স্কুল গেট, সুবোধচন্দ্র ছাত্রাবাস প্রভৃতি জায়গা থেকে একযোগে বৃষ্টির মতো বোমা ও গুলি বর্ষণ করতে করতে তিতুমীর হলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

এসময় শিবির কর্মীরা দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে জীবন বাজি রেখে ইট, পাথর এবং উদ্যানের বেড়া ভেঙ্গে লাঠি সংগ্রহ করে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। বোমার স্প্লিন্টার এবং গুলিকে উপেক্ষা করে এমনকি কেউ কেউ আহত হওয়া সত্ত্বেও খালি হাতে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করার আশায় সন্ত্রাসীদের দিকে ধেয়ে যাচ্ছিলেন। এই জানবাজ কর্মীদের প্রতিরোধের মুখে ২য় গেট এবং প্রাইমারি স্কুলের গেটের সন্ত্রাসীরা পলায়নে বাধ্য হয়। ১ম গেটেও একই অবস্থা বিরাজ করছিল। এ অবস্থায় আরও অধিক সংখ্যক সন্ত্রাসী আধুনিক অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ১ম গেটে পুনরায় হামলা চালায়। এখানে সংগঠনের মহানগরী ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক ও ছাত্রসংসদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক পায়ে উপর্যুপরি গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন।

তাকে ধরাধরি করে কলেজ মসজিদে নেয়া হয়। আহত ভাইকে একা ফেলে না গিয়ে হালিম ভাই এবং অপর কর্মী হাফিজুর রহমান মসজিদে প্রবেশ করেন। তাদের আশা ছিল আল্লাহর পবিত্র ঘর মসজিদ সকলের জন্যে নিরাপদ। খুনিরা মসজিদে অন্ততঃ রক্ত ঝরাবে না। কিন্তু আল্লাহর গোলামদের সে আশাকে নস্যাৎ করে দিয়ে খুনিরা মসজিদের ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা মসজিদের উত্তর দিকের জানালার কাচ ভেঙ্গে মসজিদের মধ্যে গুলি ও বোমা বর্ষণ করতে থাকে এবং রামদা দিয়ে জানালার গ্রিল কাটার চেষ্টা করে। এতে ব্যর্থ হয়ে তারা মসজিদের সামনের দিকে বারান্দায় উঠে আসে এবং বোমা মেরে আল্লাহর পবিত্র ঘরের দরজা উড়িয়ে দেয়।

এসময় ক্ষুধার্ত শ্রান্ত ক্লান্ত শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম খুনিদের নিবৃত্ত করার জন্য সর্বশেষ বারের মত চেষ্টা করেন। কিন্তু বর্বর পশুরা প্রথমে শিবির কর্মী হাফিজুর রহমানকে পেটে গুলি করে মসজিদের মেঝেতে ফেলে দেয়। তার শরীর থেকে বেরিয়ে আসা রক্তে মসজিদের মেঝে সয়লাব হয়ে যেতে থাকে। এসময় তারা বন্দুক, রামদা, গুপ্তি নিয়ে মুন্সী আব্দুল হালিমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রথমে গুলিবিদ্ধ হালিম ভাই মেঝেতে লুটিয়ে পড়লে রামদা এবং গুপ্তি দিয়ে তাকে নির্মমভাবে আঘাত হানতে থাকে। তিনি শহীদ হয়েছেন মনে করে খুনীরা তাকে

www.icsbook.info

মসজিদ থেকে বের করে মসজিদের সামনের পুকুরে নিক্ষেপ করে। পানিতে তার শরীর নড়াচড়া করতে দেখে হিংস্র হায়েনারা তাকে পুকুর থেকে তুলে আনে। এসময় তিনি ইশারায় পানি খেতে চান। কিন্তু মৃত্যু পথযাত্রী হালিম ভাইকে এক কাতরা পানি না দিয়ে মসজিদের সামনে ফেলে প্রকাশ্য দিবালোকে কসাইদের পশু জবাইয়ের মত জবাই করে খুনিরা তাদের খুন পিপাসা নিবারণ করে। জবাই করেই ক্ষান্ত হয়নি তাদের খুন পিপাসা, তার হাত এবং পায়ের রগও কেটে দেয় খুনিরা।

উন্মত্ত বিএনপি ও ছাত্রদলের ক্যাডাররা এরপর হামলা চালায় তিতুমীর হলে। সেখানে রহমত আলী ভাইকে গুলি করে ফেলে দেয়। তারপর রামদা, চাইনিজ কুড়াল এবং গুপ্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। শহীদ রহমতের শরীরে যখন খুনিরা এক একটি কোপ দিচ্ছিল, আল্লাহর খাস গোলাম রহমত ভাই কষ্ট লাঘবের জন্যে আল্লাহু আকবার বলে চিৎকার করছিলেন। একপর্যায়ে জাতীয়তাবাদী পশুরা তাকে উপুড় করে ফেলে ঘাড়ের দিক থেকে জবাই করতে থাকে। এতেই তার স্পাইনালকর্ড কেটে যায়। সারাদেহে ক্ষতবিক্ষত রহমত ভাইকে তারা মৃত মনে করে টেনেহিঁচড়ে তিতুমীর হলের দোতলা থেকে নীচে নামিয়ে আনে। রাস্তার উপর দিয়ে ছেচড়াতে ছেচড়াতে কমার্স বিল্ডিং-এর পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে রাস্তার উপর ফেলে রেখে যায়।

সন্ত্রাসীরা এরপর অন্যান্য হল গুলোতেও হামলা চালায়। তারা শিবির কর্মীদের কক্ষগুলোতে ব্যাপক লুঠতরাজ চালায় এবং বিছানা ও বইপত্র একত্রিত করে আগুন ধরিয়ে দেয়। দীর্ঘক্ষণ ধরে তান্ডব চালিয়ে তারা হলগুলোকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। ঘটনায় শিবির নেতা আব্দুর রহিম, মাকসুদুর রহমান মিলন, মাহফুজুর রহমান, হাফিজুর রহমান, মেহেদী মাসুদ, তৈয়বুর রহমান তোতা, মিঠু, দেলোয়ার, আবুল খায়ের লস্কর, হারুন আর রশিদ, রেজাউল ইসলাম রেজাসহ ঐ ঘটনার সময় উপস্থিত শিবিরের সকল নেতাকর্মী আহত হন।

মুমূর্ষু শেখ রহমত আলীকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার তিন দিন পরে চিকিৎসার জন্যে ঢাকা গেলে তার সঙ্গে দেখা হয়। সারা শরীর অবশ হয়ে গেলেও তিনি তখনও কথা বলতে পারছিলেন। ডাক্তাররাও তার আশা ছেড়ে দিয়ে বলছেন, তার মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই। এমতাবস্থায় রহমত ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলে তিনি আমাকে লক্ষ্য করে যে কথাটি বললেন তা হলো, আমি আপনাকে সেফ করার জন্যে আপনার পিছনে পিছনেই তো যাচ্ছিলাম। আমার কথা না শুনে ওদিকে কেন গেলেন? আমার কথা শুনে চললে তো আর এভাবে গুলি খেতে হতোনা।

কত বড় মনের অধিকারী হলে একজন মৃত্যু পথযাত্রী মানুষ এভাবে অপরকে নিয়ে চিন্তা করতে পারে তা একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়। অসাধারণ মানসিক শক্তির অধিকারী শিবির নেতা শেখ রহমত আলী ভাই তার বিধবা মা-সহ হাজারো

www.icsbook.info

শুভানুধ্যায়ীকে কাঁদিয়ে তার রফিকে আ'লার ডাকে সাড়া দিয়ে ২রা অক্টোবর '৯৩ জান্নাতের পথে পাড়ি জমান। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহি রাজিউন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল এবং তার অঙ্গ সংগঠনগুলি ২০শে সেপ্টেম্বর মহানগরীর প্রায় সবক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালায়। জোহরের নামাজ শেষে খুলনা আলিয়া মাদ্রাসার এতিমখানার ছাত্ররা যখন আহার করছিল তখন ছাত্রদলের খুনিরা মাদ্রাসায় হামলা চালায়। হামলায় ৯ম শ্রেণীর ইয়াতীম ছাত্র ও শিবির কর্মী আমানুল্লাহ শাহাদাত বরণ করেন। একই দিন বেলা ১১টায় ছাত্রদলের খুনিরা খুলনা এম এম সিটি কলেজ, আযম খান কমার্স কলেজ এবং ফুলতলা এমএম কলেজেও পাশবিক হিংস্রতা নিয়ে হামলা চালায়। পরবর্তীতে এই ঘটনার জন্য মামলা হলেও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। উপরন্তু শিবির কর্মীদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়েছে বহুগুণ।

আবুল কাশেম পাঠান: হ্যামিলনের আর এক বাঁশিওয়ালা

সরকারি বি.এল. কলেজের সবুজ অঙ্গনে এখনো হাজারো নবীনের সমাগম হয়। কিন্তু এই নবাগতদের সবার সামনে সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখের সুঠাম দেহী যে তরুণ নেতা তার দীর্ঘ পদক্ষেপ ফেলে ক্যাম্পাসের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো ছুটে বেড়াতেন তিনি আবুল কাশেম পাঠান ছাড়া আর কেই নন। মহানগরী শিবিরের প্রতিটি মিছিলে সবার কণ্ঠকে ছাড়িয়ে যে দরাজ কণ্ঠের শ্লোগান খুলনার রাজপথে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতো তিনিও আবুল কাশেম। ছাত্র-ছাত্রীসহ যে কোন দুস্থ মানুষের সমস্যায় যে তরুণ তার বিশাল দু'টি বাহু প্রসারিত করে এগিয়ে আসতেন। মহীরুহের মত প্রশান্তির স্নিগ্ধ ছায়া হয়ে যিনি মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। অনাবিল প্রশান্তির অনন্যসাধারণ প্রস্রবণ হয়ে তিনি আর কখনও পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসবেন না। তিনি পৌঁছে গেছেন তার প্রভুর একান্ত সান্নিধ্যে। হাজির হয়েছেন ফেরেদৌসের সেই দরজায় যেখানে অনেক আগেই পৌঁছে গেছেন তার পূর্বসূরি হালিম, রহমত, বিমান আর আমান। মহানগরীর ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, খুলনার লাখো জনতার কলিজার টুকরা, রাব্বুল আলামীনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণাকারী একজন শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ আবুল কাশেম পাঠানকে ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের বুলেট আমাদের মাঝ থেকে অনন্ত কালের জন্য কেড়ে নিয়ে গেছে।

সুবেহ সাদিকের পর তিমির বিদায়ী সূর্য পূর্ব আকাশে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার লগ্নেই যদি তা দপ করে নিভে যায় অথবা শিশিরে স্নাত একটি প্রস্ফুটিতপ্রায় পোলাপ কুঁড়ি গন্ধ বিলাতে শুরু করার সাথে সাথেই যদি তাকে কেউ বৃন্তচ্যুত করে তাহলে যে অবস্থা হয় তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের রক্ত পিপাসু খুনীদের হাতে শহীদ আবুল কাশেম পাঠানের হত্যাকাণ্ডকে কেবলমাত্র তার সাথেই তুলনা করা যায়। হৃদয়ের

www.icsbook.info

সকল অনুভূতিকে একসাথে করে ঘৃণা আর ধিক্কার জানালেও এই খুনীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা জানানো শেষ হবে না।

শহীদ আবুল কাশেম পাঠান ভাইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা শুরু হয় '৮৭ সাল থেকে। ঐ সময় তিনি বি এল কলেজে ভর্তি হন একাদশ শ্রেণীতে। আমি তখন অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্র। তখনই দেখতাম কলেজের ক্লাস রুম থেকে শুরু করে কমনরুম, ক্যান্টিন, খেলার মাঠ সর্বত্রই তার অবাধ পদচারণা। কখনই তাকে একা দেখা যায়নি। সঙ্গে একঝাঁক সহপাঠী। এসময় থেকেই সবাই বুঝে নিয়েছিল তিনি জীবনে অনেক দূর যাবেন। দেখতে দেখতে '৮৮-এর ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঘনিয়ে এলো। ইন্টারমিডিয়েটের সবচাইতে যোগ্য নবীন ছাত্রনেতা হিসেবে তাঁকে সংসদে মনোনয়ন দেয়া হলো। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের বিরুদ্ধে তিনি সে নির্বাচনে যে ভোট পান তা বিস্ময়কর। এইচ.এস.সি পাস করার পর ম্যানেজমেন্টে অনার্সে ভতি হন। শুরু হয় তার পরিপক্ব ছাত্র রাজনীতির বর্ণাঢ্য জীবন। একাধারে দক্ষ সংগঠক, অন্যদিকে গণমুখী নেতৃত্বের কারণে পরিণত হন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছাত্রনেতায়। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন বি.এল. কলেজের ছাত্র সমাজের সমস্যা সমাধানের সংগ্রামে এক অবিসংবাদিত রাহবার হিসেবে। সন্ত্রাসীদের রক্তচক্ষু, জাহেলী সমাজব্যবস্থার দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, নিজের পারিবারিক পিছুটান কিছুই তাঁকে রুখতে পারেনি। যেখানে সমস্যা সেখানেই কাশেম পাঠানের সরব উপস্থিতি। দল মত সকল কিছুর উর্ধে আপন মহিমায় প্রজ্জ্বল তাঁর মানবতাবোধ। প্রিয় নেতা কাশেম পাঠানের কাছে কেউ সমস্যা নিয়ে এসেছে অথচ কোন সহযোগিতা পায়নি এমন নজীর একটিও দেখানো যাবে না। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি কর্মচারী, হোষ্টেলের বয়-বাবুর্চি সকলেরই ভরসাস্থল কাশেম পাঠান। এমনও দেখা গেছে কলেজের অনেক শিক্ষক তার একান্ত পারিবারিক সমস্যা নিয়েও তাদের স্নেহভাজন ছাত্র কাশেম পাঠানের সঙ্গে আলোচনা করছেন। এসকল কিছুর স্বাভাবিক ফল হিসেবেই কাশেম ভাই প্যানেলের সর্বাধিক ভোট পেয়ে দু'বার সংসদে এ.জি.এস. হিসেবে নির্বাচিত হন। শিক্ষাঙ্গনের পরিসর ছাড়িয়ে তাঁর নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা সামাজিক পরিবেশকেও দারুণভাবে আলোড়িত করতে থাকে। তিনি যে সাধারণ মানুষের কত আপন ছিলেন তার প্রমাণ মেলে তাঁর শাহাদাতের পরে তাকে যখন কবরে শায়িত করা হচ্ছিল তখন একজন রিক্সাওয়ালা কবরের পাশে চিৎকার করে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন, আমার কাশেম ভাই আর নেই আমাকে দেখবে কে?

কাশেম ভাইয়ের শাহাদাতের পর থেকে প্রায় সারা দিনই টেলিফোনের কাছে ছিলাম। শাহাদাতের খবর তখনও সব জায়গায় পৌছায়নি। এমন সময় একজন মহিলার কাছ থেকে টেলিফোন পেলাম। নিজের পরিচয় দেওয়ার পরপরই কান্না জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা, "ও মিলন, কাশেমের নাকি গুলি লাগছে? কোন জায়গায় লাগছে বলতে পার বাবা?" আমার কণ্ঠও তখন বাকরুদ্ধ। কোনমতে বললাম- 'বুকের কাছে'।

www.icsbook.info

যদিও খুনীদের বুলেট কাশেম ভাইয়ের হৃদপিণ্ড ফুসফুস এবং কলিজা ভেদ করে তার জীবনটা নিয়েই বেরিয়ে গেছে। তারপরও তার এই হত্যাকাণ্ড একজন মায়ের কাছে লুকিয়ে রাখার এ ছিল এক ব্যর্থ প্রয়াস। কিছুক্ষণ পরেই আবার সেই মায়ের টেলিফোন পেলাম। আমি সাড়া দিতেই তিনি বিলাপ করে উঠলেন, "ও মিলন, ও বাবা, আমাদের কাশেম নাকি শহীদ হয়ে গেছে!" আমার পক্ষ থেকে এর কোন জবাব না পেয়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন। কাশেম ভাই যে তার মা-বাবা বোনকে শোকের অথই পাথারে রেখে গেছেন তাই নয়, বরং অনেক মা-বোনই তাকে হারিয়ে সন্তান ও ভাই হারানোর বেদনায় নির্বাক হয়ে গেছেন।

প্রায় প্রতিদিনই তাঁর বাড়িতে দুস্থ লোকদের ভিড় দেখা যেতো কারো হাতে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ঔষধ কেনার টাকা চাই, কারো ঘরে খাবার নাই বাজারের টাকা দাও, কেউ হয়ত কন্যাদায়গ্রস্ত মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য সাহায্য দরকার। সব মিলিয়ে ছাত্রনেতার গণ্ডি ছাড়িয়ে তিনি পৌঁছে যান জননেতার মর্যাদায়। এর মধ্যেই ঘটে যায় এক বর্বরতা। '৯৩-এর ২০শে সেপ্টেম্বর ছাত্রদলের খুনীদের বর্বর হামলার শিকার হয়ে শাহাদাৎ বরণ করেন বি.এল. কলেজের সভাপতি ছাত্র সংসদের জি.এস মুন্সী আঃ হালিম এবং সাহিত্য সম্পাদক শেখ রহমত আলী। তাদের সেই সকল গুরুদায়িত্ব তুলে নেন আপন স্কন্ধে। নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা, চারিত্রিক মাধুর্য এবং মানুষকে কাছে টানার মোহনীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে কাশেম ভাই সামনে চলতে থাকেন তার চার পাশ আলোয় উদ্ভাসিত করে। খুলনার ছাত্ররাজনীতির অংগনে তার এই অনবদ্য উত্তরণ বাতিলের জন্য এক স্থায়ী গাত্রদাহে পরিণত হয়। আর এ কারণেই আল্লাহর এই খাস গোলামকে ইসলামের দুশমনরা তাদের টার্গেট হিসেবে গ্রহণ করে। জীবনের প্রভাত বেলাতেই কাশেম ভাই যেভাবে পারিপার্শ্বিকতাকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তা মধ্যাহ্নের গনগনে সূর্যকেও ম্লান করে দেয়ার মত। সে কারণেই তার জীবনালেখ্য পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। তার জীবনের অনেক কথাই স্মৃতির মনিকোঠায় নক্ষত্রের মত জ্বল জ্বল করছে। একটি ঘটনা আমাকে প্রায়ই আবেগাকুল করে তোলে। তার শাহাদাতের মাস দেড়েক আগে শহীদ হালিম, রহমত আমান ও বিমানের শাহাদাৎ বার্ষিকীর পোস্টার ছাপাতে প্রেসে গিয়েছি। পোস্টারের ডিজাইনে শহীদদের ছবি দেখে বললেন "জানিনা পোস্টারের এরকম ছবি হওয়ার জন্য আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে।" দেরি তাকে বেশীদিন আর করতে হয়নি। দেড় মাসের ব্যবধানেই সকল ছবিকে ম্লান করে দিয়ে তিনি নিজেই খুলনার লাখো জনতার হৃদয়ে আপন ছবি একেবারে চিরতরে খোদাই করে নিয়েছেন।

তার চরিত্রে সবচেয়ে বড় গুণ ছিল যে কোন বিষয়েই সহযোগীদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়া। সংগঠনের চরম ক্রান্তিলগ্নে দেখা গেছে মাথা ঠাণ্ডা করে লক্ষ অর্জনে অটল রয়েছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তার চরিত্রের এ গুনটি অত্যন্ত

www.icsbook.info

আন্তরিকতার সাথে অনুসরণ করেছেন। তখন সবেমাত্র ছাত্রজীবন শেষ করেছি। ২২শে অক্টোবর বাড়ি থেকে খুলনা এসেছি নিজস্ব প্রয়োজনে। স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘ দিনের প্রিয় প্রাঙ্গণ বিএল কলেজে গিয়েছি। সময়টা ২৩শে অক্টোবরের সকাল দশটা। বাণিজ্য ভবনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। দেখলাম অফিস ভবনের দিক থেকে স্বভাবসুলভ দীর্ঘ পদক্ষেপ ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছেন। সাথে ৩০/৪০ জন ছাত্র প্রায় সবাই-ই নবীন। এগিয়ে এসেই বিশাল বাহু দিয়ে জাপটে ধরে কোলাকুলি করলেন। বললেন, "কি খবর ভাইজান চাকুরী পাইলেন, মিষ্টি খাওয়াইবেন না।" আনন্দঘন মুহূর্তে কেবল কাশেম ভাই তার অনুভূতি ব্যক্ত করার জন্য 'ভাইজান' শব্দটি ব্যবহার করতেন। আমি বললাম, 'হবে হবে, অসুবিধা নাই।' এর পর পরই কাজের কথায় এলেন। সব দায়িত্বশীলদের ডেকে সেখানে দাঁড়িয়েই জীবনের শেষ বারের মত পরামর্শ করলেন। সিদ্ধান্ত হলো দায়িত্বশীল ও কয়েকজন কর্মী বাদে সিটি কলেজে সবাই যাবেন। সেখানে নবাগতদের অভিনন্দন জানিয়ে মিছিল হবে। বললাম, "দায়িত্বশীল হিসেবে আপনাকে বি.এল. কলেজে থাকা দরকার।" কিন্তু তিনি যুক্তি দেখালেন, 'সিটি কলেজে যাওয়া দরকার।' আসলে তখন হয়ত ফেরেশ্‌তারা জান্নাতের দরজা খুলে দিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল তাদের সম্মানিত মেহমানকে। আর সেই অমোঘ আহবানে সাড়া দিতেই তার মনটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আমরা জনা ত্রিশেক ভাই একটা লোকাল বাসে উঠলাম। কাশেম ভাইও উঠলেন। ঐ দিন অত্যন্ত চমৎকার একটি সবুজ প্যান্ট পরে এসেছিলেন, যেটা জান্নাতেরই পোশাক। মাথার চুলগুলোও একেবারে পরিপাটি। শহীদ বিমান চত্বরে এসে লোকাল বাস থামলো। বাস থেকে নেমে জামায়াত অফিস পর্যন্ত এসে শুনলাম সিটি কলেজে সবাই মিছিলে যাবেন। মিছিল শুরু হলো। মিছিলের একেবারে পিছনে পিছনে দুজনে হাত ধরাধরি করে হাঁটছি। জিজ্ঞেস করলাম মিছিলে যাবেন কিনা। একটু আনমনাভাবেই বললেন, 'না'। হাঁটতে হাঁটতে হোটেল রয়্যাল-এর ১৫/২০ গজ উত্তরে থাকতেই শুরু হলো গুলি ও বোমা বর্ষণ। আমার ডান হাতটা তখনও তার বাঁ' হাতের মধ্যে ধরা, গুলি-বোমার শব্দ শুনেই সচকিত হয়ে উঠলেন এবং সাথে সাথেই আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে দৌড় দিলেন কলেজ গেটের দিকে। এক বছর আগে আহত হওয়ার পর তখনো দৌড়াতে পারিনা। অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলাম-দেখলাম আমার চির চেনা সবুজ প্যান্ট পরা কাশেম ভাই সবাইকে অতিক্রম করে সামনে চলে যাচ্ছেন। তিনি আসলে তখন জান্নাতের দিকেই ছুটে যাচ্ছিলেন। কাশেম ভাই দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলাম।

মুর্হুমুহূ গুলি ও বোমার শব্দে তখন সিটি কলেজ আর রয়্যাল চত্বর প্রকম্পিত। রিক্সা নিয়ে চলে গেলাম আরাফাত মঞ্জিলের মেসে। উদ্দেশ্য টেলিফোনে সংঘর্ষের খবর সব জায়গায় অবহিত করা। একটু পরে একজন ভাই মেসে এসে খবর দিলেন কাশেম ভাইয়ের গুলি লেগেছে। রিক্সা করে তারের পুকুর মসজিদের সামনে

www.icsbook.info

আসতেই মহানগরীর সদস্য আবুল খায়ের লস্কর কাছে এসে বললেন, "কাশেম ভাই শহীদ হয়েছেন।" ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহি রাজিউন। মুহূর্তের জন্য সারা দুনিয়া যেন থমকে দাঁড়াল। তারপরেই যেন মহানগরীর গাছ-পালা, ইট-কাঠ-পাথর সবাই-মিলে প্রতিবাদ জানাতে থাকলো-"না কাশেম পাঠান মরে নাই। কোন দিনও তার-মৃত্যু নাই।" আল্লাহর পথে যারা জীবন দিয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না।"

এরপরে বিকেলের দিকে আবার আমার কাশেম ভাইকে দেখলাম তারের পুকুর মসজিদের সামনে শায়িত। শরীর থেকে রুহ বেরিয়ে গেলেও মুখের মিষ্টি হাসিটুকু তখনও যেন লেগেই আছে। এ হাসি যেন আর কোন দিন ফুরাবে না।

আজ কাশেম, হালিম রহমত ভাইয়েরা আমাদের মাঝে নেই কিন্তু অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে আছে তাদের কর্মময় জীবন। তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু তাদের আদর্শকে খুনীরা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারেনি। আমাদের বুকের গহীনে তা আরও দৃঢ়ভাবে জায়গা করে নিয়েছে। এ আদর্শকে উৎখাত করতে হলে আমাদের প্রত্যেকের কলিজাকেই উপড়ে ফেলতে হবে। যা আল্লাহর দুশমনেরা কোনদিনই পারবে না। তাই আসুন ইস্পাত কঠিন শপথের বলীয়ান হয়ে সামনে এগিয়ে যাই। আমাদের ভাইদের শাহাদাতের পবিত্র রক্তের উপরই ইসলামী সমাজব্যবস্থার সুউচ্চ মিনার গড়ি।

লেখক : সাবেক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, খুলনা মহানগরী।

"উহারা প্রচার করুক হিংসা, বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ
আমরা বলিব সাম্য-শান্তি এক আল্লাহ জিন্দাবাদ"
-কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

www.icsbook.info

স্মৃতির পাতায় ২০ সেপ্টেম্বর ”৯৩

প্রিন্সিপাল শেখ জাহাঙ্গীর আলম

সেদিন ছিল ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ সাল। আমি তখন আলিম ২য় বর্ষের ছাত্র। ক্লাস করার জন্য প্রতিদিনের ন্যায় সকাল ৮টায় মাদ্রাসায় যাই। আমি মাদ্রাসার অতি নিকটে ভাড়া বাসায় থাকতাম। আমিসহ সংগঠনের আরও কয়েকজন ভাই একসাথে থাকতাম। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় আমার মনটা একটু ভার ভার ছিল। আমি তখন সংগঠনের সদস্য প্রার্থী। দায়িত্ব ছিল খুলনা আলিয়া মাদ্রাসার সেক্রেটারি। মাদ্রাসায় যাওয়ার পর ইনফরমেশন পেলাম, দক্ষিণ বাংলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ বি. এল. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাসে প্রচণ্ড টেনশন বিরাজ করছে। আমি তখনও ভাবিনি আজ কোন বড় অঘটন ঘটতে যাচ্ছে। কারণ দায়িত্বের তুলনায় বয়স ছিল খুবই কম। খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা ছিল এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখানে হামলা চালিয়ে আমাদের শিবির কর্মীদের জীবন কেড়ে নিবে তা কল্পনায়ও আসে নাই। ইতোমধ্যে ঘড়ির কাঁটায় ১টা বেজেছে। আলিয়া মাদ্রাসার মসজিদের মিনার থেকে আযানের সুর ভেসে আসছে। 'হাইয়ায়ালাস্ সালাহ' (নামাজের জন্য এসো), 'হাইয়ায়ালাল ফালাহ' (কল্যাণের জন্য এসো)। তখন মাদ্রাসার কর্মচারী আবুল হোসেন ছুটির ঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে। মাদ্রাসার ছাত্ররাও যার যার গন্তব্যে রওনা হয়েছে। ক্লাস চলাকালীন সময় মাদ্রাসার মেইন গেট বন্ধ রাখার নিয়ম ছিল, কোন ছাত্র ক্লাসের সময়ে বের হওয়ার সুযোগ পেত না। আযান হলে নামাজে যাওয়ার জন্য মেইন গেট খুলে দেওয়া হয়। সাধারণ মুসল্লিরাও নামাজের জন্য মসজিদে আসতে থাকেন। আমি মাদ্রাসা থেকে বাসায় এসে নামাজের প্রস্তুতি নিয়ে পাশেই রহমানিয়া মসজিদে যোহরের নামাজ আদায় করে বাসায় ফিরে যাই এবং যথারীতি খাবার গ্রহণের প্রস্তুতি নিই। আলিয়া মাদ্রাসার মসজিদেও নামাজ তখন শেষ

www.icsbook.info

হয়েছে। সাধারণ মুসল্লিরাও কেউ কেউ মেইন গেট দিয়ে বের হয়েছেন। কেউবা বের হওয়ার পথে, আর হোস্টেলের ছাত্ররা নামাজ শেষ করে ডাইনিং রুমে খাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কারো অর্ধেক খাওয়া হয়েছে। আবার অনেকেই খাবার প্লেট হাতে নিয়েছে। ঠিক এমন সময় আলিয়া মাদ্রাসার মেইন গেট দিয়ে ছাত্রদলের খুনিরা প্রবেশ করে। "ধর ধর শিবির ধর, শিবিরের চামড়া খুলে নিবো আমরা।" তাদের মুখে ছিল এধরনের শ্লোগান এবং হাতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র এবং বোমা। সাধারণ মুসল্লিরা এবং ছাত্ররা কিছু বুঝে উঠার আগেই তারা বোমা ফাটিয়ে গুলি ছুঁড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

সন্ত্রাসীরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে তাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি দল ডাইনিং এর দিকে এবং অন্যদলটি যায় ছাত্রাবাসের দিকে। গুলি আর বোমার বিকট শব্দে ছাত্ররা দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। খাবারের প্লেট রেখে যে যে দিক পারে প্রাণ বাঁচানোর জন্য দৌড়াতে থাকে। এতিম আমানও প্রাণ বাঁচানোর জন্য খাবারের প্লেট রেখে মাদ্রাসার ছাত্রাবাসের ২য় সিঁড়ি দিয়ে উপর তলায় উঠার চেষ্টা করছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি বুলেট এসে এতিম আমানের বুকে লাগে এবং সাথে সাথে সে সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়ে। সন্ত্রাসীরা সেখান থেকে ২য় তলায় যেয়ে ছাত্রাবাসে ব্যাপক ভাংচুর করে এবং পিটিয়ে আমাদের ভাইদের অনেককে আহত করে। তাদের মধ্যে মনির, আল আমিন, সাত্তার, শহিদ ও মাদ্রাসার কর্মচারী মোয়াজ্জেম গুরুতর যখম হয়। আল-আমিন এখনও তার ক্ষতচিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে। জি এম শফিক, আতাউর ভাই এবং আমি একই ছাত্রাবাসে থাকতাম। গুলির শব্দ শুনা মাত্রই আমরা আলিয়া মাদ্রাসার দিকে ছুটে গেলাম।

"সে ছিল আমার পূর্বপরিচিত। অত্যন্ত ভদ্র, সভ্য, শান্ত ও অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী ছিল সে। সুদূর সাতক্ষীরা জেলার দরগাহপুর গ্রামের নির্জন পল্লীতে তার জন্ম। জন্মের পরই সে তার বাবাকে হারিয়েছে। আমানের বিধবা মা অনেক বড় আশা করে আলিয়া মাদ্রাসায় পাঠিয়েছিলেন বড় আলিম বানানোর জন্য কিন্তু তার আগেই তিনি সকলকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে শহীদি মর্যাদা নিয়ে চলে গেলেন।"

সন্ত্রাসীরা তখনও আলিয়া মাদ্রাসার ক্যাম্পাসে ভাংচুর ও গোলাগুলি করছিল। আমরা আলিয়া মাদ্রাসার প্রধান গেট দিয়ে প্রবেশ করতে পারলাম না। মাদ্রাসার পেছন দিক দিয়ে ছোট একটা সরু পথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে দেখি সন্ত্রাসীরা তাদের কাজ সেরে পালিয়ে গেছে। এমন সময় দেখি আমাদের প্রিয় আমান সিঁড়িতে পড়ে আছে। তাকে আমরা তুলে হাসপাতালে নেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। কারণ তার দেহে তখন আর প্রাণ ছিল না।

www.icsbook.info

আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এধরনের কোন ঘটনা পূর্বে কখনই ঘটে নাই। শত শত ছাত্ররা আমানকে জড়িয়ে ধরে বিলাপ করছে আর বলছে, আমাদের প্রিয় ভাইকে কেন গুলি করে মারা হল। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা সালেহ সহ শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কারণ তারা কোনদিন ভাবে নাই, খুলনা আলিয়া মাদ্রাসার মত জায়গায় এভাবে একজন এতিম ছেলেকে জীবন দিতে হবে।

সেই সময় আলিয়া মাদ্রাসার ক্যাম্পাসে এসে উপস্থিত হলেন নগর শিবির সেক্রেটারি ওয়াসিয়ার রহমান মন্টু। আমি মন্টু ভাইকে ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিলাম ঠিক সেই মূহুর্তে সংবাদ আসলো সিটি কলেজে আমাদের ভাই আবুল কাশেম পাঠানকে আটক করে রেখেছে, বি.এল. কলেজে হামলা হয়েছে। মন্টু ভাই আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে ধৈর্যের সাথে সকল পরিস্থিতি মোকাবেলার পরামর্শ দিয়ে রওনা হলেন। এরই মধ্যে আবারও খবর আসলো বি.এল কলেজে হালিম ভাই, রহমত ভাই, মিলন ভাই গুরুতর আহত। তাদের খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

শহীদ এতিম আমান ছিল শিবির কর্মী। সে ছিল আমার পূর্বপরিচিত। অত্যন্ত ভদ্র, সভ্য, শান্ত ও অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী ছিল সে। সুদূর সাতক্ষীরা জেলার দরগাহপুর গ্রামের নির্জন পল্লীতে তার জন্ম। জন্মের পরই সে তার বাবাকে হারিয়েছে। আমানের বিধবা মা অনেক বড় আশা করে আলিয়া মাদ্রাসায় পাঠিয়েছিলেন বড় আলিম বানানোর জন্য কিন্তু তার আগেই তিনি সকলকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে শহীদি মর্যাদা নিয়ে চলে গেলেন। আল্লাহ তাকে শহীদি মর্যাদা দান করুন। আমিন॥

লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, খুলনা মহানগরী।

"সত্য সমাগত, মিথ্যা অবসৃত
সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী"
- আল কুরআন

www.icsbook.info

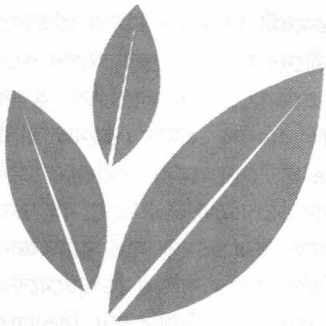

প্রেরণার উৎস

শহীদ শেখ রহমত আলী

অধ্যাপক এ.কে.এম.ফজলুর হক

শাহাদাতের ঘাটনা কোন সাধারণ ঘটনা নয়। শাহাদাত সকলের ভাগ্যে জোটে না। যদি ইচ্ছা করলেই শহীদ হওয়া যেত তাহলে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা:) মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয়ে শহীদি মৃত্যু না হওয়ার জন্য আফসোস করতেন না। আল্লাহর রাসূল (সা:) একবার হযরত আয়েশা (রা:) কে বলেন " এমনভাবে আমল করো যেন হিসাব ছাড়াই বেহেশতে যেতে পারো"। একমাত্র শহীদরাই দুনিয়া থেকে এ নিশ্চয়তা নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে যে, আল্লাহর জান্নাত তাঁর জন্য অবধারিত। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির অসংখ্য শহীদদের ধারক এক সংগ্রামী কাফেলা। শহীদ শেখ রহমত আলী সেই কাফেলার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

সাতক্ষীরা জেলার তালা থানার দোহার গ্রামের এক নিভৃত পল্লীর শেখ মোফাজ্জেল হোসেন এবং মাতা রাফিয়া ৮ জন সন্তানের মধ্যে শেখ রহমত আলী ছিলেন ভাইদের মধ্যে চতুর্থ। ছোট বেলায় তিনি পিতৃহারা হন। পিতা মারা যাওয়ার পর থেকে পরিবার দারুণ অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। রহমত আলী ভাইয়ের লেখা পড়া প্রায় বন্ধ হওয়ার পথে। তার ভিতর ছিল জ্ঞানার্জনের তীব্র আকাঙ্খা। বাড়ি থেকে যখন লেখাপড়ার খরচ বহন করা সম্ভবপর ছিল না তখন রহমত আলী ভাই সিদ্ধান্ত নিলেন ঘরে কাজ করে টাকা উপার্জন করে লেখাপড়া শিখবেন। লজিং থেকে, টিউশনি করে কুমিরা বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৮৪ সালে এস.এস.সি পাস করেন। বড় ভাইদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সংসারের অবস্থা দ্রুত পরিবর্তন হতে লাগলো। ৮৪ সালে তিনি বি.এল. কলেজে এইচ.এস.সি ভর্তি হন। ১৯৮৬ সালে এইচ.এস.সি পাস করেন এবং একই বছরে খুলনা বি.এল. কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অনার্সে ভর্তি হন।

www.icsbook.info

সদা হাস্যোজ্জ্বল রহমত ভাই ছিলেন এক ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ। নানামুখী প্রতিভার সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি খুব দ্রুত আপন করে নিতে পারতেন। শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মচারী প্রত্যেক ক্ষেত্রে তার ছিল অবাধ বিচরণ। বার বার ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিজয় লাভ তার বড় প্রমাণ। রহমত আলী ভাই যখন ক্যাম্পাসে হাঁটতেন তখন সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা সমাধানে তিনি ছিলেন ব্যাকুল। তাঁর ভূমিকার কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ডিপার্টমেন্টে অসংখ্য বই ক্রয় করা সম্ভব হয়েছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র রহমত আলী রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের উন্নয়নের জন্য যে পরিশ্রম করেছেন তাঁর স্বাক্ষর আজও ডিপার্টমেন্টের প্রতিটি পরতে খুঁজে পাওয়া যাবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একজন ছাত্র হওয়ায় সেই উন্নয়ন আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। তিনিই প্রথম সাহিত্য সম্পাদক যিনি প্রথম বারের মত আন্তঃকলেজ বির্তক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন এবং তারই প্রচেষ্টায় উদ্বোধনী ভাষণ রেডিওতে প্রচারিত হয়। শহীদ তিতুমীর হলের ২৩৪নং কক্ষে তিনি থাকতেন। বি.এল. কলেজে ভর্তির পূর্বে আমি তিতুমীর হলে ২ দিন ২৩৫নং রুমে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করি। রহমত আলী ভাইয়ের সুললিত কণ্ঠের আজান নামাজের জন্য হলের বারান্দা দিয়ে সালাত সালাত বলে ছাত্রদের ডাকবার দৃশ্য, নামাজবাদ হাদীস পাঠ এবং ঐদিনে শিবিরের নেতা কর্মীদের কাজ বুঝিয়ে দেওয়া একজন আদর্শ সংগঠকের পরিচয়ই বহন করে। হলের কর্মচারী বয় বেয়ারা দোকানদারদের সাথে সম্পর্ক তাঁর উদার মনের পরিচয় মেলে। তাঁর কাছে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী গরীবের কোন ব্যবধান ছিল না। রহমত ভাইয়ের শাহাদাতের এক বছর পরও কর্মচারী ব্যবসায়ী, হোটেল মালিকদের কাছে রহমত ভাইয়ের কথা বলতেই হাউ মাউ করে কাঁদতে দেখেছি। একদিকে সাংগঠনিক কাজ অন্যদিকে ছাত্র সংসদের ব্যস্ততা এরপরও তিনি লজিং আর টিউশনি করে নিজের পড়াশুনার খরচ নিজেকে জোগাতে হত। যা অনেকেই কল্পনা করতে পারেন না। শহীদের সেজো ভাই রজব আলী বললেন- রহমত সারাজীবন অনেক কষ্টকরে লেখাপড়া করেছে। নিয়্যত করেছিলাম সামনের মাস থেকে ওকে কিছু টাকা অন্তত হাত খরচের জন্য পাঠাবো। সে আশা অপূর্ণ রয়ে গেল। যদি এদেশে ইসলামী বিপ্লব হয় তাহলে বলতে পারবো এই বিপ্লবের পিছনে আমার ভাই রহমতেরও রক্ত ঝরেছে।

কাজের চাপে অনেক সময় তাঁর সকালের নাস্তা, দুপুরের খাওয়া ভাগ্যে জুটেনি। মাঝে মাঝে তিনি নিজে রুমে রান্না করে খেতেন। কখনও কখনও অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে ক্লান্তি ও গভীর রাতে প্রোগ্রাম শেষে রুমে ফিরে অভুক্ত অবস্থায় রাত কাটাতেন। প্রায় রাতে রহমত ভাইকে দেখা যেত হলের নিজের সিট মেহমানকে দিয়ে খালি মাথায় হাতের উপর মাথা রেখে মসজিদের মধ্যে ঘুমাতো। এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তিনি ছিলেন উন্নত আখলাকের অধিকারী। তার জীবনে অভাব-অনটন ছিল ঠিকই কিন্তু তিনি ছিলেন পরিচ্ছন্ন জীবনের অধিকারী। সংগঠনের কাজ ছাড়া

www.icsbook.info

মায়ের প্রতি ছিল তার অগাধ ভালবাসা। কোন একদিন রাতে তার কাছে খবর পৌঁছালো মা অসুস্থ। খুলনা থেকে তিনি তালায় পৌঁছালেন রাত ১১ টার দিকে। তখন নদীতে কোন নৌকা নেই। ওদিকে মা অসুস্থ। বিকল্প রাস্তা না পেয়ে তিনি কপোতাক্ষ নদী সাঁতার কেটে ভিজে কাপড়ে রাত ১২ টায় বাড়িতে পৌঁছান।

৯৩ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর খুলনার ইতিহাসে এক ন্যক্কারজনক অধ্যায়। তৎকালীন ছাত্রদল সরকারি বি.এল কলেজ থেকে ছাত্রশিবিরের কর্মকাণ্ডে নিজেদের অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার আশংকায় তথাকথিত নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় শিবির উৎখাত করার স্বপ্নে মেতে ওঠে। তার-ই অংশ হিসাবে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা দুপুরে নামাজরত অবস্থায় এবং খাবার গ্রহণের সময় নিরস্ত্র শিবির নেতা কর্মীদের ওপর হামলা পরিচালনা করে। শিবিরের নেতা কর্মীরা সংগঠিত হয়ে হামলা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। রহমত আলী ভাই ও খায়ের লস্কর ভাই সহ ৭/৮ জন বি.এল কলেজের দ্বিতীয় গেট থেকে নারায়ে তাকবিরের স্লোগান দিয়ে সন্ত্রাসীদের পিছু নিলে সন্ত্রাসীরা পালাতে থাকে। ১ম গেটে থাকা শত শত সন্ত্রসী মুহুর্মুহু গুলি করতে থাকলে রহমত আলী ভাইয়ের প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের মুখে শিবির কর্মীরা দাঁড়াতে না পেরে পিছু হঠতে বাধ্য হয়। এ সময় রহমত আলী ভাই সহ অনেকে তিতুমীর হলে যান। শেখ রহমত আলী ভাই হলের সবাইকে বেরিয়ে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু আল্লাহর কি ইচ্ছা রহমত ভাই সকলকে বের করে দিলেও নিজে বের হওয়ার সুযোগ পাননি। মুহুর্তের মধ্যে সন্ত্রাসীরা হলের ভেতরে প্রবেশ করে। রহমত আলী ভাই তিতুমীর হলের ২য় তলায় পূর্ব পাশের বাথরুমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সন্ত্রাসীরা হালাকু আর চেঙ্গিস খানের বর্বরোচিত ইতিহাস ম্লান করে দিয়ে বাথরুমের দরজা ভেঙ্গে প্রথমে গুলি পরে রামদা, চাইনিজ কুড়াল দিয়ে রহমত আলী ভাইয়ের সারা শরীরে আঘাত করতে থাকে। এক পর্যায়ে তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় বাথরুমের মেঝে লুটিয়ে পড়েন। রক্ত পিপাসু ছাত্রদলের কর্মীরা রামদা দিয়ে যখন রহমত ভাইকে আঘাত করছিলেন প্রতিটি আঘাতের সাথে সাথে তিনি আল্লাহু আকবার বলে চিৎকার করেছিলেন। আঘাতের এক পর্যায়ে তিনি তাঁর গর্ভধারিণী মায়ের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, মাগো তুমি কোথায়? ওরা আমাকে শেষ করে ফেললো। এ ঘটনার কয়েকমাস পরে কাশেম পাঠান ভাইয়ের সাথে তিতুমীর হলের উত্তর পাশে এক শিক্ষিকার বাসায় দেখা করতে গেলে দু চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন- তোমরা আমাকে ক্ষমা করো, একজন মা হয়েও আমি রহমতের জন্য কিছুই করতে পারলাম না।

ঐ দিন সন্ত্রাসীরা রহমত আলী ভাইয়ের দেহ গুম করার উদ্দেশ্যে পায়ে গামছা বেঁধে তিতুমীর হলের ২য় তলায় বাথরুম থেকে টেনে হেঁচড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে ক্যাম্পাসের মধ্যবর্তী স্থানে কমার্স বিল্ডিংয়ের কাছে দর্শন বিভাগের সামনে ফেলে জনতার ভয়ে পালিয়ে যায়। সেদিন খুনিরা রহমত আলী ভাইয়ের ঘাড়ের স্পাইনাল কর্ড কেটে দেয়। এরপর সংজ্ঞাহীন দেহের ওপর চালায় নির্মম অত্যাচার। এ

www.icsbook.info

অবস্থায় তাকে খুলনার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জ্ঞান ফিরলে তিনি বার বার বলছিলেন আমি শহীদ হব আল্লাহ কেন আমাকে শহীদ করতে এত দেরি করছেন"। হাসপাতালে থাকাকালীন সময়ে তাঁর শরীরের অবস্থার কোন পরিবর্তন না হলে ২দিন পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়। স্পাইনাল কর্ড কেটে যাওয়ায় তাঁর দেহের ২ হাত ব্যতীত সবটাই অসাড় হয়ে যায়। এ সময় জ্ঞান থাকলে তিনি শুধু কুরআন তিলওয়াত করতেন। আর এভাবে কুরআন তিলওয়াত করতে করতে শেষ বারের মত জ্ঞান হারিয়ে ঘটনার ১২ দিন পরে ২ অক্টোবর'৯৩ অনেক যন্ত্রণা সহ্য করে কুরআনের কর্মী শেখ রহমত আলী ভাই শাহাদাতের অমিয় পেয়ালা পান করে মহান রবের দরবারে পাড়ি দেন।

শহীদ রহমত আলী ভাই শাহাদাতকালে সংগঠনের সদস্য প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু সদস্য হওয়ার তীব্র আকাঙ্খা ছিল তাঁর। তাঁর উদারতা, ত্যাগ, আমানতদারিতা, পরিশ্রমপ্রিয়তা, ন্যায়পরায়ণতা, সাহসিকতা, খোদাভীতি, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ তাকে এক বিরল ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিলেন। শহীদের বৃদ্ধা মা গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন দীর্ঘ নয় বছর শিক্ষা শেষে সন্তান ঘরে ফিরে আসবে। পরিবারের হাল ধরবে, সবার দুঃখ দূর করবে। তবে তিনি ঘরে ফিরলেন ঠিকই, কিন্তু ফিরলেন সাদা কফিনে শহীদবেশে। শহীদ শেখ রহমত আলী ভাইয়ের স্বপ্ন ছিল আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা। তাঁর রেখে যাওয়া এ স্বপ্নকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর দায়িত্ব তাদের সাথী ও উত্তরাধিকারীদের। তাই এ মুহূর্তে আন্দোলনের কর্মীদের মজবুত ঈমান, খোদাভীতি, উন্নত আমল, শাহাদাতের তামান্না দায়ী ইলাল্লার বৈশিষ্ট্য নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইসলামী সরকার কায়েমের বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে শহীদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হবে।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক দান করুন এবং বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরকে কবুল করুন। (আমিন)॥

লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, খুলনা মহানগরী।

www.icsbook.info

সেই সরল মিষ্টি হাসি
আর দেখতে পাব না কোনদিন

মুহাম্মদ আব্দুর রহিম

সেদিন ছিল বাংলা ১৪০০ সালের ১লা বৈশাখ, নববর্ষ। রাত্রি ১২ টার সময় শহীদ তিতুমীর হলের ছাদে ৮-১০ জন বসে আছি। বসে আছি একটি নতুন শতাব্দীকে বরণ করে নেয়ার জন্য। চারদিকে পটকার আওয়াজ, আনন্দ, উল্লাস, নিউ মুসলিম হলের দিক থেকে একটি মিছিল এল চামচ দিয়ে থালা পেটাতে পেটাতে। নববর্ষের মিছিল, আমাদেরও অংশগ্রহণের আহবান জানাল। থালা পিটিয়ে আমরা নববর্ষ পালন করতে রাজি হলাম না। ভাবলাম কি করা যায়, ঠিক হল আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা আযান দিয়েই আমরা স্বাগত জানাবো নতুন শতাব্দীকে। কিন্তু কে দেবে আযান? যার কণ্ঠ সবকিছু ছাপিয়ে যাবে। তুলবে সুমধুর সুরের মূর্ছনা। হ্যাঁ, একজনই আছেন এমন। তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রিয় ভাই শেখ রহমত আলী। আযান দিলেন তিনি হলের ছাদে দাঁড়িয়ে। রাতের আঁধার বিদীর্ণ করে, থালা বাদকদের স্তব্ধ করে দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল আযান। এত ভাল লেগেছিল সে আযান যে, মনে হচ্ছিল জীবনের প্রথম আযান শুনছি। থালা বাদকরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। এক সময় হতভম্ব, কিছুটা লজ্জিত হয়ে চলে গেল।

রহমত ভাই বয়সে আমাদের চেয়ে বড় ছিলেন। অর্থাভাবে কয়েকবছর তার পড়াশুনা বন্ধ থাকায় তিনি পিছিয়ে পড়েছিলেন। ঘনিষ্ঠ পরিবেশে আমি ও মিলন ভাই তাকে শেখ সাহেব বলে ডাকতাম। বললাম শেখ সাহেব আজ একটা নতুন সংস্কৃতির জন্ম লাভ করল। জবাবে তিনি মিষ্টি করে হাসলেন, মনে পড়ল হাজী মহসীন হলের উদ্বোধনী দিনটির কথা। সেদিনও হলের প্রথম নামাযের আযান দিতে রহমত ভাইয়ের ডাক পড়েছিল।

www.icsbook.info

আজ রহমত ভাই আমাদের মাঝে নেই। ক্যাম্পাসে বা হলে কোথাও না। পরম করুণাময়ের ডাকে অনন্তের উদ্দেশ্যে তিনি পাড়ি জমিয়েছেন চির দিনের জন্য। তাঁকে আর কোনদিন পাব না। কিন্তু তাঁর সাথে সাংগঠনিক জীবনের বেশ কয়েকটি বছরের সুমধুর স্মৃতির রোমন্থন আমৃত্যু করবে অশ্রুসিক্ত।

১৯৯২ সালের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মাত্র ১দিন আগে নির্বাচনী ক্যাম্পেইন সেরে হলে ফিরছিলেন রহমত ভাই। রাত তখন ১২টার বেশি, ক্যাম্পাসে প্রবেশ করা মাত্র ছাত্রদলের খুনী ফারুক তাঁকে বললো-

রহমত তুমি আমার নামে কলেজে মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছো।

কলেজে খুনী ফারুকের নারী ঘটিত কেলেংকারি তখন সকলের মুখে মুখে। রহমত ভাই বললেন-

– আমি তোমার নামে মিথ্যা বলতে যাব কেন? তুমি ভি.পি. প্রার্থী আর আমি সাহিত্য সম্পাদক প্রার্থী। ফারুক বলল-

– আমি সব বুঝি। নির্বাচনটা যাক তোমার পায়ের তলা থেকে মাটি আমি সরিয়ে দেব।

আমার কাছে প্রচণ্ড ক্ষোভের সাথে রহমত ভাই বললেন ফারুকের হুমকির কথা। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিলাম।

– ধৈর্য ধরুন রহমত ভাই। পরাজয় নিশ্চিত জেনে ওরা আবোল তাবোল বকছে।

রহমত ভাইকে সান্ত্বনা দিলেও আমার মনে ঘটনাটা বেশ দাগ কাটে। রহমত ভাইয়ের শাহাদাতের পর আমার বুঝতে বাকি থাকে না, কেন, কে তাকে হত্যা করেছে।

শাহাদাত এক দুর্লভ সৌভাগ্য। আল্লাহর পছন্দনীয় বান্দারাই এ মর্যাদা লাভ করে থাকেন। শহীদ রহমত ভাই ছিলেন আল্লাহর এক উচ্চ মর্যাদার সৈনিক। মাত্র ৫ বছর বয়স থেকে তিনি নিয়মিত রোজা রাখা ও নামায আদায় শুরু করেন। শাহাদাত পর্যন্ত তিনি কোনদিন রোজা কাযা করেননি। তিতুমীর হলের নিয়মিত মুয়াজ্জিন ছিলেন তিনি। দারুণ অর্থনৈতিক টানাপোড়নের মধ্যে তাঁকে লেখাপড়া চালাতে হয়েছে। বছরের পর বছর তিনি চিংড়ি ঘের পাহারা দিয়ে কাটিয়েছেন। পড়াশুনা এ সময় বন্ধ ছিল। কিছু অর্থ জমা করে আবার শুরু করেছেন। এভাবেই এস.এস.সি পাস করেন। আসেন খুলনায়। লজিং থেকে বি.এল. কলেজে পড়াশুনা শুরু করেন। সংগঠনের সাথেও নিবিড়ভাবে যুক্ত হন এসময়। অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে তিনি সাথী হন। শাহাদাতের মাত্র ১৫ দিন আগে সদস্য প্রার্থী হন। এ সময় তিনি এম.এ শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। যদিও তাঁর মানোন্নয়ন ঘটেছিল ধীরগতিতে তবুও দায়িত্বশীলতার উন্মেষ তাঁর মধ্যে হয়েছিল কর্মী থাকা অবস্থায়। যখনই যে দায়িত্ব দেয়া হত তা পালনের জন্য পাগলের মত ছুটতেন। রহমত ভাই বলতেন-

আমি পারি না এমন কোন কাজ নেই। শুধু একটু বুঝিয়ে দেবেন, তাহলেই হবে। ক্লাস কমিটি করার ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। যে সকল শ্রেণীতে কমিটি করা কঠিন ছিল সেগুলোর দায়িত্ব থাকত তাঁর। একবার দর্শন প্রথম বর্ষে

www.icsbook.info

কমিটি করতে গেলাম রহমত ভাইয়ের সাথে। দেখা গেল কোন মুসলমান ছাত্র ক্লাসে নেই। কুরআন তেলাওয়াত করলেন অন্য শ্রেণীর একজন ছাত্র। ভাবলাম কমিটি আজ করা যাবে না। রহমত ভাই বললেন-

– রহিম ভাই ৩০ মি. লম্বা একটা বক্তৃতা দেন। বললাম-

– তারপর?

– কমিটি ঘোষণা করা হবে।

শুরু করলাম বক্তৃতা। ৩০ মি. পর বক্তৃতা শেষ করতেই তিনি একটি কাগজ হাতে দিলেন। পূর্ণাঙ্গ ক্লাস কমিটি। কমিটিতে বেশ কয়েকজন মুসলমান ছাত্রেরও নাম দেখতে পেলাম। পরে জানতে চাইলাম কি ভাবে কি করলেন? জবাবে সরল মিষ্টি হাসলেন। যার অর্থ আমার জানা। তা হলঃ "এটা কোন কঠিন কাজ হল?" প্রতি বছর ৭-৮টি ক্লাস কমিটি তিনি একা করতেন।

সংসদে তিনি দুইবার নির্বাচিত হয়েছিলেন। সহ-ক্রীড়া ও সাহিত্য সম্পাদক। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় কলেজে প্রথমবারের মত আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আর বি.এল. কলেজ হয় চ্যাম্পিয়ন। কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের সাথে তাঁর ছিল ব্যক্তিগত সম্পর্ক। বিভাগীয় শিক্ষকদের বাসায় মাছ কিনে নিয়ে তিনি বেড়াতে যেতেন। বাড়ী থেকে মাছ আনলে রান্না করে শিক্ষক কর্মচারীদের বাসায় দিয়ে আসতেন। এক ঈদে দেখলাম তিনি ২টি পাঞ্জাবি কিনেছেন। বললাম, অন্যটি কার? জানালেন কলেজের এক দরিদ্র অফিস কর্মচারীকে ঈদ উপহার দেবেন ওটা। তাঁর রুমে মাঝে মাঝে কলেজের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দেখতাম। জিজ্ঞেস করলাম, রহমত ভাইয়ের রুমে কেন যান? বললেন-

– আমি রহমত ভাইয়ের কাছ থেকে প্রতিমাসের মাঝামাঝি টাকা ঋণ নেই। আবার মাসের প্রথমে বেতন পেয়ে শোধ করে দেই। যদিও নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না তবুও তিনি পরোপকারে কখনও পিছনে থাকতেন না। রহমত ভাইয়ের সাথে একরুমে প্রায় দুই বছর ছিলাম। তিনি রুমে রান্না করে খেতেন। কোনদিন আমাকে রান্না করতে দিতেন না। কোন কাজই আমাকে করতে দিতেন না। রুমে গেস্ট এলে নিজের সিটে রেখে নিজে মসজিদে ঘুমাতেন। বাড়ি থেকে বস্তাভরে চাল আনতেন। তিনি বাড়ি গেলে আমরা তা খেতাম। কোনদিন তার দাম শোধ করতে পারিনি।

শহীদ তিতুমীর হলে শিবিরের সিট সংখ্যা বৃদ্ধিতে তাঁর রয়েছে অসামান্য অবদান। প্রতিবছর যে সিটগুলো খালি হত, খালি হওয়ার ৬ মাস আগেই তিনি লাগতেন তার পিছনে। এক্ষেত্রে তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করতেন। তাঁর কৌশলের সফলতা আজকের তিতুমীর হল। কখনও কখনও তিনি কয়েক বছর একটি সিটের পিছনে লেগে থাকেন। সিট হাতে এনে তবে শান্ত হতেন। কলেজে কোন টেনশন হলেই রহমত ভাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পড়ত। তিনি রাতের পর রাত জেগে থেকে হল

www.icsbook.info

পাহারা দিতেন। রাতের বেলা দায়িত্ব পালনে অনেকেরই আপত্তি থাকত। রহমত ভাই কখনও তা করতেন না। কখনও আমিও থাকতাম তাঁর সাথে, বসতাম কোন গাছের গোড়ায়। গভীর রাত্রে মাত্র দুইজন। নানান কথা বলতেন। আমি বলতাম-

–রহমত ভাই একটা গান শোনান। রহমত ভাই গাইতেন-

"মুহাম্মদের নাম জপেছিলি বুলবুলি কি তুই আগে"... কখনও গাইছেন-

"মধুর চেয়েও মধুর আরও মুহাম্মদের নাম, আমার...।"

রহমত ভাইয়ের সুর ছিল চমৎকার। শুনতে বেশ ভালো লাগত।

নিজ গ্রামে তিনি ছিলেন দারুণ জনপ্রিয়। এলাকার কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি তার মধ্যে একজন মেম্বারও ছিলেন, একবার এসে আমাকে বললেন-

– রহমতকে আমরা চেয়ারম্যান নির্বাচন করাতে চাই। আমি বললাম-

– পাস করবে তো! তাঁরা বললেন-

– আপনারা অনুমতি দেন। পাস করানোর দায়িত্ব আমাদের। আমি বললাম-

– আগে এম.এ পাস করুক। তারপর চেয়ারম্যানী পাস করবে।

তাঁরা চলে গেলেন। হয়ত আশা করেছিলেন এম.এ পাস করে রহমত গ্রামে এলে তাঁরা একজন যোগ্য নেতা পাবেন। কিন্তু ঘাতক ছাত্রদল সে আশা ভেঙ্গে চুরমার করে দিল।

২০ সেপ্টেম্বর তিনি খুনিদের গুলি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রায় খালি হাতে। ইট পাথর দিয়ে জবাব দিচ্ছিলেন ককটেল আর গুলির। এক সময় তাও শেষ হয়ে গেলে। নির্দেশ পেয়ে হলে চলে এলেন। ততক্ষণে হল খালি হয়ে গেছে। তারপরও কেউ রয়ে গেল কিনা দেখতে দোতলায় গেলেন। আর নামতে পারলেন না সেখান থেকে। হলের বাথরুমে খুনি ফারুক, হাফিজ, আজাদ, লিটন, সোহাগ তাকে ঘিরে ধরে। রামদা আর চাইনিজ কুড়ালের আঘাতে তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে। প্রতিটি আঘাতের জবাব তিনি দেন "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি তুলে। রক্তে বাথরুম সয়লাব হয়ে যায়। অচেতন হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তাঁর অচেতন দেহ রক্তের মধ্যে ভাসছিল। এসময় খুনিরা মাত্র ১ গজ দূর থেকে তাঁকে পাইপ গানের গুলি করে। সারা দেহে সে গুলিবিদ্ধ হয়। তারপর নরপশু আজাদ গলায় ফাঁস লাগিয়ে তাঁকে টেনে নিয়ে চলে লাশ গুম করার জন্য। যেন কোনদিন রহমত ভাইকে আমরা খুঁজে না পাই। তিতুমীর হল থেকে কলাভবন পর্যন্ত রহমত ভাইয়ের অচেতন দেহ টেনে নেয় আজাদ। তাঁর দেহ থেকে রক্ত ঝরছিল গলগল করে। জানালা থেকে এ দৃশ্য দেখে একজন স্যারের স্ত্রী বেহুঁশ হয়ে পড়েন। আশেপাশের জানালা থেকে যারাই দেখছিলেন তারাই জানালা বন্ধ করে কাঁদতে থাকেন। বাইরে লোকের ভিড় দেখে খুনি আজাদ আবার রহমত ভাইকে টেনে নিয়ে যায় হলের ভিতরে। এরপর খুনিরা পুলিশের সামনে দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করতে করতে

www.icsbook.info

দৌলতপুর চলে যায়। ফারুক আর হাফিজ মিষ্টি খাওয়ার জন্য পশুপতি ঘোষ ডেয়ারিতে যায়। হাফিজ বলল-

– আমার মিষ্টি খাওয়া হালিমের জন্য। ও আমাকে নির্বাচনে হারিয়েছে। ফারুক ভাই আপনারটা কার জন্য? ফারুক বলল-

– রহমতের জন্য। আমি ওর পায়ের তলার মাটি সরিয়ে দিয়েছি আজ। ওর জন্য হেরেছি আমি।

রহমত ভাইকে বাঁচানোর সকল চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি তো তাঁর সবচেয়ে প্রিয় আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন অনেক আগে। তাই কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে চলে গেলেন জান্নাতের পানে। সর্বশেষ অচেতন হওয়ার আগে তিনি পড়লেন- "ওয়ালা তাকুলু লি মাইয়্যুক তালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত, বাল আহইয়ায়ু ওয়ালা কিল্লা তাশউরুন– যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বল না। তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পার না।"

২ অক্টোবর রহমত ভাইয়ের শাহাদাতের খবর এল খুলনায়। একাদশ শ্রেণীর ছাত্র নয়ন জামায়াত অফিসে কেঁদে জড়িয়ে ধরল আমাদের। ৩ তারিখ কাশিপুর মসজিদে আসরের নামায শেষে একজন অভিভাবক হাত ধরে কেঁদে বললেন, আমার বাড়ি একটু চলেন। জিজ্ঞেস করলাম, কেন? বললেন- আপনার ভাবী আর আমার বাচ্চা দুটো আজ ২ দিন কিছুই খাচ্ছে না। ওরা কেবল কেঁদেই চলেছে। জানলাম একসময় ওই বাড়িতে রহমত ভাই লজিং ছিলেন। কান্নার অজস্র ধারা সেদিন সিক্ত করেছিল খুলনার জমিন। কিন্তু শুধুই কি কান্না ছিল? না। হাজার যুবক দ্বীনের ঝাণ্ডা বহনের জন্য শপথ নিয়েছিল সেদিন। ইসলামের জন্য শহীদ হওয়ার জন্য দৃঢ় অঙ্গীকার করেছিল। চোখ বুজলেই রহমত ভাইকে দেখি। তাকে হারিয়েছি চিরদিনের জন্য। তার সরল মিষ্টি হাসি আর দেখতে পাব না কোনদিন।

লেখক : সাবেক জি.এস, বি.এল. কলেজ ছাত্রসংসদ ও সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, বি.এল. কলেজ শাখা।

www.icsbook.info

চির চেনা চির জানা শহীদ হালিম রহমত ও আবুল কাশেম পাঠান

মোহাম্মদ মাসুদ আলম গোলদার

শহীদ হালিম, শহীদ রহমত ভাই সম্পর্কে কখনো লিখতে হবে তা কোনদিন কল্পনাও করিনি। আজ আমার প্রিয় সাথীদের সম্পর্কে লিখতে বসে মনে পড়ছে তাদের অনেক দিনের অনেক স্মৃতিকথা, ঈমানের যে বিরাট দীপ্ত সূর্য নিয়ে তারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই ধরাধমে। আমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন আলোর মশালবাহী হয়ে থাকতে। তারা একদিন আমাদের শত সহস্র হৃদয়ের অজস্র রক্ত ক্ষরণের মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় আলোর পথের দিশা দিয়ে হঠাৎ করে পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যাবে সেকথা কল্পনা করাও কষ্টসাধ্য। পৃথিবীতে হালিম, রহমত ও কাশেমেরা সংখ্যায় বেশি জন্মগ্রহণ করে না। মহাকাশে ধূমকেতু যেমন মানব সমাজেও তেমনি তারা জন্মগ্রহণ করে শুধুমাত্র কর্মময় কতকগুলো অবিনশ্বর মুহূর্ত নিয়ে। ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ আব্দুল মালেকের কথায় এ মহাজীবনের পরিচয় মেলে "জীবন মরণের এই স্রোতধারায় আমরা প্রত্যহ বহু জীবনের সংস্পর্শে আসছি, কিন্তু এই অখণ্ড স্রোতের মধ্যে কদাচিৎ দু'একটি জীবনের সন্ধান মিলে যা সর্ববিষয়ে সাধারণ হতে স্বতন্ত্র" মহত্ত্বে জ্ঞানে কর্মে সে জীবন হয়ে ওঠে আমাদের আদর্শ। মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অফুরন্ত রহমত সঞ্চিত হয়ে সে আদর্শ জীবন নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন শহীদ হালিম, শহীদ রহমত আলী ও শহীদ আবুল কাশেম পাঠান। শহীদ হালিম ছিলেন কর্মীদের কাছে একটি আদর্শ। কর্মীদেরকে তিনি ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন তাদের দুঃখ ও বেদনার সাথী। সকল কর্মীদের ব্যাপারে তার ছিল পরিষ্কার ধারণা। কর্মীদের কাছে তাই তিন ছিলেন অনুকরণীয় আদর্শ। একজন অভিভাবক, একজন নেতা।" আর কলেজের সাড়ে সাত হাজার

www.icsbook.info

ছাত্রছাত্রীর তিনি ছিলেন প্রিয় হালিম ভাই। শিক্ষকদের প্রিয় ছাত্র। কর্মচারীদের একান্ত আপনজন। তার ইমামতিতে হাজী মুহসীন হল মসজিদে অসংখ্য বার নামায পড়ার আমার এবং হলের অন্যান্যদের সৌভাগ্য হয়েছে। এমনকি আল্লাহর এ গোলামের কুরআন তেলাওয়াতে আকৃষ্ট হয়ে পার্শ্বের হলের ছাত্র কর্মচারীরা হাজী মুহসীন হলে ছুটে যেত নামায পড়তে। শহীদ হালিম ভাইয়ের শাহাদাতের খবর শুনার সাথে সাথে তার মা বারবার জ্ঞানহীন হয়ে পড়ছিলেন। জ্ঞান ফিরলেই শুধু বলছিলেন "আমার হালিম তুই একটি বার ফিরে আয়, আমাকে আর একটু কুরআন তেলাওয়াত করে শুনা বাপ।" আমরা যখনই তাদের বাড়িতে গিয়েছি হাত দু'টি জড়িয়ে ধরে তিনি বলেছেন, "তোমরা এসেছো আমাকে একটু হালিমের মত কুরআন তেলাওয়াত করে শুনাতে পার।

কলেজের পদার্থবিদ্যার একজন শিক্ষক হালিম ভাইয়ের শাহাদাতের পর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বারবার বলেছিলেন, ছাত্রজীবনে একই হলের পাশের রুমের মালেককে হারিয়েছি। অধ্যাপনা জীবনে আরেক মালেককে হারালাম। কি অদ্ভুত মিল খুঁজে পেয়েছিলাম শহীদ মালেক ও শহীদ হালিমের ভেতরে।

শহীদ হালিমের দুইটি শখ ছিল

একঃ শাহাদাতের মৃত্যু, দুইঃ ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতিষ্ঠা। শাহাদাত যে তার কত কাম্য ছিল তার নিজের ডায়েরিতে লিখেছিলেন তার নিজের ভায়ায়।

"যেখানে রয়েছে আমার বড় ভাই শহীদ আব্দুল মালেক, শহীদ সাব্বীর, শহীদ হামিদ, শহীদ আসলাম, শহীদ শফিক, শহীদ আব্দুর রহিম, শহীদ লিটন- আমিও তো যেতে চাই- যাবো তাদের ওখানে। শহীদি মিছিলে আমিও আসছি। শাহাদাত আমার সকল কর্ম প্রেরণার উৎস।"

শহীদ রহমত ভাই ছিলেন ত্যাগী, সদালাপী সদা হাস্যোজ্জ্বল, পরোপকারী, সাদাসিধে জীবন যাপন করতে ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন একজন খোদাভীরু বিনয়াবনত গোলামের মূর্ত প্রতীক। প্রতিদিন সকালে তার মধুর সুরের আযানে ঘুম ভাঙ্গে শহীদ তিতুমীর হলের ছাত্রদের। রুমে সর্বদা মেহমানে ভরপুর থাকত, মসজিদই ছিল তার প্রিয় ঠিকানা। শহীদ হালিম ভাই সর্বদা দু'টি গান গাইতেন "আজো সেই কুরআন আছে, হাদিস আছে, সেই ঈমান আর..... আমাকে শহীদ করে সেই মিছিলে শামিল করে নিও।

গভীর রাতে উঠে মসজিদে যাওয়া, নামায পড়া তার রুটিন মাফিক কাজের অংশ ছিল। শহীদ হালিম ভাই ঘুমিয়ে আছেন নিজ গ্রাম ফুলতলা ও শহীদ রহমত ভাই ঘুমিয়ে আছেন তালাখানার দোহারের নিভৃত পল্লীতে আর শহীদের শত সহস্র সাথীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "তোমরা শহীদের সাথী, তোমরা আমাদের হত্যার বদলা নিও বাংলাদেশে ইসলামী জীবনাদর্শ আল কুরআনকে প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

www.icsbook.info

শহীদ আবুল কাশেম পাঠান

হৃদয়ের সবটুকু জায়গা জুড়ে যে নামটি বিরাজমান, সেটি অবশ্যই শহীদ আবুল কাশেম পাঠান। আমার তনুমন হৃদয় আর সারা অস্তিত্ব জুড়ে রয়েছে একান্ত প্রিয় সাথী শহীদ কাশেম পাঠান। হারিয়ে গেছে প্রাণ, ফেলে রেখে গেছে মনের পাতায় ভাজ করা অসংখ্য স্মৃতি। একান্ত প্রিয় সাথী সম্পর্কে লিখতে বসেই মনে পড়ছে অসংখ্য দিনের অসংখ্য স্মৃতির কথা। তার প্রতিটি পাতা উল্টাতে গেলেই চোখের কোণটা ভিজে আসে। বেদনার উদ্‌গত অশ্রু কোনভাবেই স্মরণ করা যায় না। দেখা না দেখার এই বাস্তব স্বপ্নেও আমি অনুভব করছি প্রতিটি মুহূর্ত। সে তো আমার অনেক কাছের একান্ত আপনজন।

শহীদ কাশেম পাঠান একটি নাম, একটি ইতিহাস, একটি অনন্য প্রতিভা, একটি নক্ষত্র, ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ-শহীদ আব্দুল মালেকের যোগ্য উত্তরসূরি। শহীদ আবদুল মালেকের কথায় শহীদ কাশেম পাঠানের অনন্য জীবনের পরিচয় মেলে, "জীবন মরণের এই স্রোতধারায় আমরা প্রত্যহ বহুজীবনের সংস্পর্শে আসছি। কিন্তু এই অখণ্ড স্রোতের মধ্যে কদাচিৎ দু'একটি জীবনের সন্ধান মেলে যা সর্ব বিষয়ে সাধারণ হতে স্বতন্ত্র। মহত্ত্বে জ্ঞানে কর্মে সে জীবন হয়ে ওঠে আমাদের আদর্শ।" মহান রাব্বুল আলামিনের অফুরন্ত রহমত সঞ্চিত হয়ে এক অনুপম অনুকরণীয় আদর্শ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শহীদ আবুল কাশেম পাঠান। তিনি কর্মীদের কাছে ছিলেন আদর্শের প্রতীক। কর্মীদেরকে তিনি ভালবাসতেন একান্তভাবে। তিনি ছিলেন তাদের সকল সুখ, দুঃখ ও বেদনার সাথী। অধস্তন সকল কর্মী ও উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদের ব্যাপারে তার ছিল স্বচ্ছ ধারণা। কর্মীদের নিকট তাই তিনি ছিলেন অনুকরণীয় আদর্শ। একজন অভিভাবক, একজন নেতা, আর কলেজের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ছিলেন একান্ত প্রিয় কাশেম ভাই। শিক্ষকদের প্রিয় ছাত্র, কর্মচারীদের একান্ত আপজন। তার প্রমাণ ছাত্র সংসদ '৯১-৯২, '৯২-৯৩ নির্বাচনে শিবির মনোনীত 'জাকির-রহিম-কাশেম' পরিষদ এবং 'জাকির-হালিম-কাশেম' পরিষদে ছাত্র-ছাত্রীরা কাশেম পাঠানকে সর্বোচ্চ ভোটে বিজয়ী করে দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করেছিল। মানুষের সাথে অকৃত্রিম ভালবাসার নিদর্শন দেখিয়ে গেছেন কাশেম পাঠান ভাই। কি ছোট কি বড় খুলনার ছাত্র-শিক্ষকক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা সর্বোপরি আপামর জনসাধারণের সাথে তাঁর ছিল হৃদয়ের অকৃত্রিম সখ্য।

কলেজের অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের বাসায় তার ছিল নিয়মিত যাতায়াত। কাশেম ভাইয়ের দেওয়া পাকা আম আর মাছ খাননি এমন শিক্ষক খুবই কমই আছে। একবার ছেলের অসুস্থতার খবর শুনে প্রিন্সিপাল স্যার হঠাৎ করে ঢাকার লালবাগের বাসায় চলে গেলেন। এ খবর শুনার পরেই কাশেম ভাই কলেজের সাবেক জি.এস. আব্দুর রহিম ভাইকে সাথে নিয়ে চলে গেলেন ঢাকায় প্রিন্সিপাল স্যারের বাসায়। তিনি স্যারের অসুস্থ ছেলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং সমবেদনা জানালেন। প্রিন্সিপাল স্যার আমাদের ভিতর কাশেম ভাইকে সবচেয়ে বেশি

www.icsbook.info

ভালবাসতেন। আমার যতদূর মনে পড়ে কাশেম ভাইয়ের দেওয়া কোন কাজে তিনি 'না' বলেননি। শাহাদাতের কয়েকদিন পূর্বের ঘটনা- কলেজের মসজিদ সংস্কারের কাজ চলছে। মসজিদটিকে দোতলা করা হবে। প্রিন্সিপাল স্যারসহ অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্রদের একান্ত সহযোগিতায় টাকা সংগ্রহের কাজ চলছে। প্রিন্সিপাল স্যার তখন কাশেম ভাইকে বলেছিলেন, 'কাশেম, তুমি কত টাকা কালেকশন করে দিতে পারবে?' কাশেম ভাই দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন- 'পঞ্চাশ হাজার টাকা'। স্যারের ধারণা ছিল কাশেম অনেক কম টাকার কথা বলবে কিন্তু তার উত্তর শুনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তাইতো শাহাদাতের কয়েকদিন পর প্রিন্সিপাল স্যার বেদনায় মুষড়ে পড়ে বলেছিলেন- 'কাশেম বেঁচে থাকলে মসজিদের কাজ শেষ করতে এত কষ্ট হতো না।'

সদা হাস্যোজ্জ্বল কাশেম পাঠান খুলনার অলি-গলি পথে-প্রান্তরে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখে বিপর্যয়ে অসহায়ত্বে ছিলেন অত্যন্ত কাছের মানুষ। তার প্রমাণ কাশেম পাঠান ভাইয়ের আকস্মিক শাহাদাৎ-এর ঘটনায় লাখ লাখ মানুষের খুলনা থমকে গিয়েছিল। একদিকে চলছে রাজপথে শহীদের সাথীদের গগনবিদারি শ্লোগান অন্যদিকে রিক্সাওয়ালা, শ্রমিক ও শহীদের সাথীসহ সর্বস্তরের মানুষের বুক ফাটানো আর্তনাদ, কান্নার মাতম। সে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য! হারিয়ে ফেলেছে শহীদের সাথীরা কথা বলার শক্তি। কান্নার স্বর আকণ্ঠ থেমে আছে। অনুরুদ্ধ হয়ে আছে কান্নার আবেগ! শহীদ আবুল কাশেম পাঠানকে হারিয়ে ফেলেছে খুলনাবাসী, যে প্রস্ফুটিত ফুলের সুবাসে সুবাসিত ছিল ভৈরব রূপসা বিধৌত অবারিত অঙ্গন সে ফুল ছিড়ে ফেলা হয়েছে। অতিক্রান্ত হচ্ছে বছর আর তার সাথীরা তাকে খুঁজে ফিরছে স্মৃতির পাতায়।

১৯৮৭ সালের প্রথম দিকে শহীদ কাশেম পাঠান ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় একই কলেজে ছাত্র হবার সুবাদে। সংগঠনে তিনি এসেছিলেন আমার পরে। কিন্তু তার অসাধারণ যোগ্যতা, মেধা ও মননশীলতার বদৌলতে সদস্য হয়েছিলেন আমার অনেক পূর্বেই। তিনি যে সেশনে কলেজের সভাপতি (শাহাদাতের বছর) আমি সাংগঠনিক সম্পাদক, তিনি যে সংসদের এ.জি.এস. (ভারপ্রাপ্ত জি.এস.) আমি পত্রিকা সম্পাদক। এবং শাহাদাৎ এর পূর্ব পর্যন্ত আমরা ছিলাম শহীদ তিতুমীর হলে পাশাপাশি রুমের আবাসিক ছাত্র। যদিও খুলনা মহানগরীতে তার নিজস্ব বাড়ি ছিল তবু সংগঠনের দায়িত্বের কারণে তাকে হলে থাকতে হতো। যখনই কোন সমস্যায় পড়তেন সহযোগীদের সাথে একান্তে পরামর্শ করতেন। সংগঠনে এলেন পরে, চলে গেলেন আগে, সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে নিজে হাসতে হাসতে স্রষ্টার সান্নিধ্যে রেখে গেলেন আমাদের মত গোনাহগার সহযোগীদের।

কাশেম ভাইয়ের হাতেই আমার পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির হাতে খড়ি। তিনি আমাকে এক প্রকার জোর করেই লেখা-লেখির কাজে উৎসাহিত করতেন। যেখানে শহীদ কাশেম পাঠান ভাইয়ের লেখা-লেখিতে হাতে খড়ি সেই "দৈনিক প্রবাহ" তেই দীর্ঘদিন মহানগর প্রতিনিধি এবং স্টাফ রিপোর্টারের দায়িত্ব পালন করেছেন। একদিন আমাকে প্রবাহ ডেস্কে বসিয়ে দিলেন। উল্লেখ্য দৈনিক জনবার্তাতেও তিনি কিছুদিন স্টাফ

www.icsbook.info

রিপোর্টার ছিলেন। সেদিন বুঝতে পারিনি কাশেম পাঠান ভাই সম্পর্কেই কোনদিন লিখতে হবে। আমাদের শত সহস্র হৃদয়ের অজস্র রক্তক্ষরণের মধ্যে দিয়ে তিনি চলে যাবেন সে স্মৃতি সত্যই বেদনাদায়ক। অত্যন্ত বড় হৃদয় ও মনের মানুষ ছিলেন। মেধাবী ও স্বাস্থ্যবান তরুণ ছাত্রনেতা আবুল কাশেম পাঠান। অতি অল্প সময়ের মধ্যে মানুষকে কাছে টানার অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী। তার মত ক্যারিশমা সম্পন্ন ছাত্রনেতা বি.এল. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইতিহাসে কোনদিন ছিল না ভবিষ্যতে আসবে কিনা তাই বা কে জানে। শহীদ তিতুমীর হলের ২৩৭নং কক্ষ ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের তীর্থস্থান। তাদের সমস্যা সমাধানে কাশেম ভাইয়ের তুলনা শুধু তিনিই। কাশেম পাঠান ভাইয়ের জীবন ছিল তাজা গোলাপের মত। গন্ধ বিতরণের পূর্বেই ছাত্রদলের খুনিরা দুমড়ে মুচড়ে দিল। তার শাহাদাতের এক বছর পূর্বেই ২০শে সেপ্টেম্বর '৯৩ ছাত্রদলের ঘাতকদের নির্মম আঘাতে শহীদ হলেন আমাদের প্রিয় নেতা, চির ভাস্বর সভাপতি শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম, শহীদ রহমত আলী ও আমান উল্লাহ আমান। তাদের রক্তের দাগ শুকাতে না শুকাতেই ২৩শে অক্টোবর '৯৪ বি.এল. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সাজানো ফুল বাগানের সেরা গোলাপটিকে জোর পূর্বক পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেয়া হলো। মাত্র ঘন্টা খানেকের মধ্যে তছনছ হয়ে গেল সাজানো ফুল বাগান।

বি.এল. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষের রুমে গেলে যখন দেখি, গর্বভরে শোভা পাচ্ছে দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রেসিডেন্টের পুরস্কার। দেখি সযত্নে বাঁধানো অধ্যক্ষের সাথে প্রেসিডেন্টের পুরস্কার হাতে ছাত্রসংসদ নেতৃবৃন্দের হাস্যোজ্জ্বল ছবি। শহীদ হালিম (জি.এস), আবুল কাশেম পাঠান (এ.জি.এস), রহমত আলী (সাহিত্য সম্পাদক), ভি.পি জাকির ভাই, মিলন ভাই (সাংস্কৃতিক সম্পাদক) এবং আমাকে (পত্রিকা সম্পাদক) তখন নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়। ভাবী দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুরস্কার আজো আছে। আছে বি.এল. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। কিন্তু কি যেন নেই। নেই শহীদ হালিম, রহমত, কাশেম পাঠান ভাই। অথচ আমরা আজো বেঁচে আছি। তাদের গোনাহগার সাথীরা। কিন্তু কেন? নিবিষ্ট চিত্তে ভাবী উত্তর একটাই শহীদ হবার ভাগ্য সবার হয় না"

শহীদ কাশেম পাঠান সর্বদা কামনা করতেন শহীদি মৃত্যু। গভীর রাত, চারিদিকে নিথর নিস্তব্ধ। শহীদ তিতুমীর হলের ছাদের এক কোনে কাশেম পাঠান ভাই ও আমি কলেজের সাংগঠনিক মজবুতি, হালিম-রহমত ভাইয়ের শাহাদাতের মূল্যায়ন ও আমাদের পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে নানাবিধ আলোচনা চলছে। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'রোগে শোকে বিছানায় মৃত্যুর থেকে শাহাদাতের গৌরবোজ্জ্বল মৃত্যু আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় "আমার প্রথম ও শেষ আশা শহীদি মৃত্যু। তিনি মাঝে মাঝে কাজের মাঝে মনের অজান্তেই গুন গুন করে গেয়ে উঠতেন,

"আমাকে শহীদ করে সেই মিছিলে
শামিল করে দিও।
যে মিছিলের নেতা আমীর হামযা....."

www.icsbook.info

কাশেম পাঠান ভাইয়ের প্রথম ও শেষ আশা ছিল শাহাদাতের মৃত্যু শাহাদাৎ কামনা যে কত তীব্র ছিল তার ডায়েরির পাতায় লিখেছেন এভাবে। পূরণ হবে তো? শহীদ হবার ইচ্ছে শুধু আজ থেকেই নয়। যেদিন থেকে ছাত্রশিবির ভালভাবে বুঝতে শিখেছি সেদিন থেকে। এর থেকে গর্বের মৃত্যু আল্লাহর কাছে আর নাই। জীবন যখন আল্লাহ দিয়েছেন তখনতো মরতেই হবে। হয়ত অসুখে বা দুর্ঘটনায় বা অন্যকোন অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। তবে এই মৃত্যু শহীদের মৃত্যুই হোক। আল্লাহ পাক কি আমার এ উদ্দেশ্য পূরণ করবেন? আশা কি বিফল হবে আমার। আমি তো প্রায়ই নামাজের পরে দোয়া করি তুমি আমাকে শহীদের মৃত্যু দাও।"

হে মাবুদ তুমি আমার এই ছোট আশাটি পূরণ নিশ্চয়ই করবে। তোমার তো এতে কোন ক্ষতি হবে না। তবে কেন তুমি আমার এই প্রথম ও শেষ আশাটি মিটাবে না....

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার এক বিনয়াবনত গোলাম আবুল কাশেম পাঠানের একান্ত ইচ্ছা প্রথম ও শেষ আশা পূরণ করেছেন শাহাদাৎ এর পথে।

সেদিন ছিল ২৩শে অক্টোবর '৯৪ সকাল ৭টা বি.এল. কলেজের শহীদ তিতুমীর হল থেকে আমি কাশেম ভাই, সাখাওয়াত ভাই একত্রে বেরিয়েছি উদ্দেশ্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে ড. উমার আলী স্যার আসছেন বি.এল. কলেজে তাকে স্বাগত জানাতে হবে। কলেজের গেটেই মেহমানদের স্বাগত জানালাম আমরা। উমার আলী স্যারের কাছে অধ্যাপক মতিন ভাই আছেন তাদেরকে কলেজ ক্যাম্পাস দেখাতে দেখাতে কথা হচ্ছিল। কখন যে নয়'টা বেজে গেল কেউই টের পাইনি হঠাৎ কাশেম ভাই মেহমানদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে পরামর্শ করলাম দায়িত্বশীলরা। কাশেম ভাই বললেন কয়েক জন কর্মীসহ আমাকেই কলেজে থেকে যেতে। সাখাওয়াত ভাইসহ কয়েকজন সিটি কলেজে যাবেন। আমাকে সিটি কলেজে নিয়ে যেতে ভীষণ পীড়াপীড়ি করলাম বললাম যেতে হলে সকলেই যাব। নাছোড়বান্দা কাশেম ভাই। অগত্যা আমাকে থেকে যেতে হলো। তখন বুঝতে পারিনি শহীদ হবার জন্যেই তিনি ছুটে যাচ্ছেন সিটি কলেজে। বুঝলাম দু'ঘন্টা পরে, তখন সব শেষ ঘাতক বুলেটে সব কিছু লণ্ড ভণ্ড করে দিয়ে গেল।

বছর ঘুরে যতই এগিয়ে আসছে তোমার শাহাদাতের দিনটি ততোই হাজারো কথার অজস্র স্মৃতির ঝড় তুলছে আমার মনে। তোমার কথাই আজ আমার বড় বেশি মনে পড়ছে। আমার স্মৃতির খাতার প্রতিটি পরতে পরতে তুমি থাকবে চির জাগরুক, চির অম্লান।

কাশেম পাঠান ভাই চির নিদ্রায় শুয়ে আছে বসুপাড়া কবরস্থানে। আর যেন তার সাথীদের উদ্দেশ্য করে বলছেন- তোমরা আমার সাথী, তোমরা আমার ভাই, তোমরা আমার হত্যার বদলা নিও। বাতিলের উৎখাত করে এদেশেই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের মধ্য দিয়ে।

লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, বি.এল. কলেজ শাখা।

www.icsbook.info

অব্যক্ত বেদনা

মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন

খানজাহানের পুণ্যভূমিতে শহীদের খুনে আত্মোৎসর্গকারী আমার প্রিয় ভাই, শহীদ আবুল কাশেম পাঠান। গভীর এ রজনীতে শাহাদাতের দিনটি অতি নিকটবর্তী হওয়ায় তার কথা আজ বেশী মনে পড়ছে। দীর্ঘ একটি বছর পর শহীদ আবুল কাশেম পাঠান ভাইয়ের শয়নকক্ষে তিতুমীর হলে রাত্রিযাপন করে হাজারো কথা, অজস্র স্মৃতির ঝড় তোলে আমার হৃদয়ে। মুহূর্তে ভেসে উঠে '৯৩ সালে সদস্য সম্মেলনের বিচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহের দৃশ্যটা। সেদিন কাশেম ভাই খুলনা মহানগরীর প্রত্যেক সদস্য ভাইকে নববর্ষের কার্ড দিয়েছিলেন। তার এ ক্ষুদ্র উপহারে নতুন অভিজ্ঞতা খুঁজে পেয়েছিলাম। সদস্য ভাইদের যে বিষয়ে দুর্বলতা ছিল সে বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। ভাইদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন বিভিন্ন সাংগঠনিক ও সামাজিক গণভিত্তি রচনার কাজে। যেমন মাসুদ ভাইয়ের কার্ডে কুরআন শরীফ শুদ্ধ করে পড়ার তাগিদ দিয়ে লিখেছিলেন, 'ভালো দেখে হুজুর রেখে নেন, নইলে কিন্তু সদস্য হতে পারবেন না।' উল্লেখ্য সদস্য প্রার্থীদের সেবার সম্মেলনে যাবার অনুমতি ছিল। অপরপক্ষে আমাকে কলেজের পাশে কাশিপুরে সাংগঠনিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। "ভালো হয়ে যান কেবল তো বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা আর গরু জবাই শুরু"। এইভাবে মহানগরী সভাপতি থেকে শুরু করে সকল ভাইদের সম্মেলন ক্যাম্পে চমক থেকে শুরু করে সকল ভাইদের সম্মেলন ক্যাম্পে চমক লাগিয়েছিলেন। যে স্মৃতি সংশ্লিষ্ট ভাইদের ভুলবার নয়।

ভেসে উঠছে আজ শহীদ কাশেম ভাইয়ের বিছানায়

www.icsbook.info

শয়নকালে হৃদয় মাঝে রক্তাক্ত বি.এল. কলেজের সাংগঠনিক জীবনে তার সাথে দায়িত্ব পালনের বিভিন্ন স্মৃতিকথা। ১৯৯৩ সনে বি.এল. কলেজের জি.এস. শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম, সাহিত্য সম্পাদক, শেখ রহমত আলী শাহাদাৎ বরণ করেন। '৯৪ সালে বি.এল. কলেজের সভাপতি হন আমার প্রিয় ভাই আবুল কাশেম পাঠান। আমি ছিলাম তার সেক্রেটারি সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে আমি তাকে পেয়েছিলাম একজন আদর্শবান নেতা, একজন অভিভাবক আনুগত্যের প্রশ্নে অকৃত্রিম, আন্তরিকতা, কর্মী গঠন ও সংগঠন পরিচালনায় যোগ্য সংগঠক, সাংগঠনিক কাজে ছিল তার ব্যাপক পেরেশানী। ছাত্র-সমস্যা সমাধানে ছিল অগ্র সৈনিক, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও গণমানুষের সমস্যায় তাকে না বলতে দেখিনি। 'হবে না' বলতে কোন ভাষা তার জানা ছিল না। বিভিন্ন সময়ে আমি কাশেম ভাইয়ের কাজের ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে বিভিন্ন কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতাম। এ সময়ে তিনি মিষ্টি হাসি দিয়ে বিলীন করে দিতেন আমার বিরক্তিকর পরিবেশকে। তার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিল বি.এল. কলেজ। কলেজ বন্ধের ষড়যন্ত্রে তার সহযোগিদের নিয়ে কেঁদে দিয়েছিলেন অধ্যক্ষের হাত ধরে, বলেছিলেন যে কোন মূল্যে কলেজ খোলা রাখতে হবে। নতুবা আমি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে মুখ দেখাতে পারব না। সত্যই সেদিন তার ভূমিকায় হতবাক হয়ে গিয়েছিল শিক্ষক, কর্মচারী ও পুলিশ প্রশাসন। কাশেম ভাইকে শিক্ষক-কর্মচারীরা একান্ত ভালবাসতেন। যার প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠেছিল '৯৪ এর ২৩শে অক্টোবর শাহাদাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। অনুষ্ঠিত হয়েছিল বি.এল. কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের শোক সভা।

"আমি তাকে পেয়েছিলাম একজন আদর্শবান নেতা, একজন অভিভাবক আনুগত্যের প্রশ্নে অকৃত্রিম, আন্তরিকতা, কর্মী গঠন ও সংগঠন পরিচালনায় যোগ্য সংগঠক, সাংগঠনিক কাজে ছিল তার ব্যাপক পেরেশানী। ছাত্র-সমস্যা সমাধানে ছিল অগ্র সৈনিক, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও গণমানুষের সমস্যায় তাকে না বলতে দেখিনি। 'হবে না' বলতে কোন ভাষা তার জানা ছিল না।"

শহীদ আবুল কাশেম পাঠান ভাই কর্মী ও জনশক্তিদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন তাদের দুঃখ-বেদনার সাথী, আর আন্তরিকতা ও ভালবাসার জন্য অনেক কর্মীর কাছে ছিলেন অভিভাবকের মত। কর্মীদের সাথে দেখা হলেই মিষ্টি হাসি দিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। কর্মীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির তত্ত্বাবধান করতেন বিভিন্ন বৈঠকে। কর্মীদের সাথে আন্তরিকভাবে মিশে জেনে নিতেন তাদের দুঃখ-বেদনা, দুর্বলতা, যোগ্যতা। দুর্বলতাকে ইঙ্গিত করে উপদেশ দিতেন সংশোধন করতে। কর্মীর যোগ্যতাকে সামনে রেখে অনুপ্রেরণা যোগাতেন

www.icsbook.info

প্রতিভা বিকাশে। সব সময়ে পরামর্শ দিতেন আমাকে কর্মীদের মানোন্নয়ন ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিতে। ফলে কর্মীদের নিকট তিনি ছিলেন প্রিয় কাশেম ভাই। একজন আদর্শ নেতা, অভিভাবক, তার কর্মতৎপরতায় পেত অনুকরণীয় আদর্শ, সামনে চলার পথ।

আদর্শ সংগঠক হিসেবে কাশেম ভাইয়ের বিকল্প নেতা পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। খুলনায় রাজনীতিতে তিনি ছিলেন জাতীয় যুব কমাণ্ডের রূপকার। প্রভাবশালী যুবকদের নিয়ে গঠন করেছিলেন যুব কমাণ্ডের ওয়ার্ড কমিটি। চ্যালেঞ্জ করেছিলেন ঘাদানিকের বিরুদ্ধে। প্রমাণ করেছিলেন জাতীয় যুব কমান্ড খুলনায় একটি শক্তিশালী সংগঠন।

শহীদ কাশেম ভাই সংগঠন পরিচালনায় এক আসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার কারণে ক্যাম্পাসে সব সময় থাকতে পারতেন না তারপরও সংগঠন পরিচালনায় তার কৌশলগত প্রতিভা থাকার কারণে কখনো তার অভাব বোধ করিনি। বাসা থেকে কলেজে আসতেন নতুন নতুন চিন্তা ও কাজ নিয়ে। ক্যাম্পাসে এসে প্রথমে জিজ্ঞাসা করতেন কোন সমস্যা ও কাজ আছে কিনা। আমরা যতটুকু বুঝতাম বলতাম। তারপর দেখেছি পকেট থেকে লিখিত কাগজ বের করেই সমস্ত কাজ লিখে নিতেন এবং সমাধান করতেন। আর কি কাজ আছে আপনারা নোট করে রাখবেন। আগামীতে আমি দেখব এবং বিশেষভাবে পরামর্শ দিতেন আপনারা ১/২ ঘন্টা সংগঠন নিয়ে প্রতিদিন চিন্তা করবেন এবং যখন যা মনে পড়ে লিখে রাখবেন। বর্তমানে কাশেম ভাই নাই কিন্তু তার পরামর্শ ও সংগঠন পরিচালনার আদর্শ আজও আমাদের মাঝে আছে।

আল্লাহর প্রতি গভীর ভালবাসা ও খোদাভীতির মূর্ত প্রতীক ছিলেন কাশেম ভাই। শাহাদাত এর পূর্বে ১/২ মাস থাকতাম একই রুমে। আমি ইতঃপূর্বে শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম ভাই এর রুমে মহসীন হলে থাকতাম। সাংগঠনিক কাজের সুবিধার জন্য কাশেম ভাই পারিবারিক ও সামাজিক হাজার সমস্যাকে উপেক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিলেন কলেজ ক্যাম্পাসে তিতুমীর হলে ৩৭ নং রুমে থাকার। আমাকে তার রুমে আসার নির্দেশ দিলেন। একই রুমে থাকার সুবাদে একান্তভাবে কাশেম ভাই-এর সাথে মেশার সুযোগ হয়েছিল। সেদিন দেখেছিলাম সত্যিই একজন খোদাপ্রেমিক আদর্শবান নেতা। সারাদিন কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্র সমস্যার সমাধান ও সাংগঠনিক তৎপরতায় ব্যস্ত মানুষটি রাতের আঁধারে কোরআন তেলাওয়াত ও নফল নামাজের। আমার হৃদয়ে বার বার দোলা দিচ্ছে। শাহাদাতের পূর্ব রাতের দৃশ্যটি কোনদিন ভুলব না। ২২শে অক্টোবর বি.এল. কলেজের একাদশ শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা ছিল। সারাদিন না খাওয়া প্রায়। দিন শেষে রাতের আধঅরে গভীর রাজনীতে নফল নামাজ পড়েছিলেন কাশেম ভাই। সেই সময় আমার মনে পড়েছিল

www.icsbook.info

মন্টু ভাইও রহিম ভাই-এর কথা- "কাশেম, শহীদ হবে"। খোদার প্রতি ভালবাসা ও শহীদ হওয়ার ঘটনা-প্রবাহ অনেক আছে-আমরা সকলে তার ছলাফেরা, উঠা-বসা, সামাজিক কর্মকাণ্ডে সাবধান করতাম কিন্তু কাশেম ভাই-এর মধ্যে কোন অনুভূতি লক্ষ্য করতাম না তিনি আল্লাহর প্রতি ভরসা করেই সব সময় চলাফেরা করতন। ২৩শে অক্টোবর সকল বেলা ক্যাম্পাসে পদচারণার মধ্য দিয়ে কলেজ সংগঠন সম্পর্কে একান্তভাবে কিছু কথা হয়। এক পর্যায় কলা ভবনের সিঁড়িতে বসে প্রায় ১ ঘন্টা আলোচনা হয় সত্যিই সে স্মৃতি ভুলবার নয়। আমার মনের প্রশ্নের যোগ-বিয়োগ এখনও মেলেনি-কেন যে, তিনি আমার সাথে শাহাদাতের পূর্বে একান্ত পরিবেশে সংগঠন-পারিবারিক জীবনের অসমাপ্ত কথাগুলো বলে গেলেন-উত্তর কি পাব কোন দিন? সকাল ১০টায় মাসুদ ভাইকে বি.এল. কলেজে রেখে আমিও কাশেম ভাই ২৫/৩০ জন কর্মীকে নিয়ে সিটি কলেজে গিয়েছিলাম। নবাগতদের শুভেচ্ছা জানাতে মিছিল হল সংঘর্ষের ময়দানে কাশেম ভাই-এর সাথে অবস্থান করলাম-ঘাতক বুলেট কাশেম ভাই-এর জীবন কেড়ে নিল।

কঠোর সংযমের সাথে শাহাদাত-এর সংবাদ জানাতে নিজেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলাম। কর্মীদের সবরের নছিয়ত করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেই অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছিলাম। তার অতীতের কর্মকাণ্ডে প্রমাণিত হলো কাশেম ভাই শাহাদাতের জন্য অনেক পূর্ব হতে নিজেকে তৈরী করেছিলেন।

দীর্ঘ কয়েক বছর হল অনেক মিছিল সমাবেশ বৈঠক সাংগঠনিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করেছি কিন্তু-কাশেম ভাই-এর মত একজন সাহসী আদর্শ। নৈতিক মানসম্পন্ন নেতা খুঁজে পাইনি।

সংগঠনে অনেক নেতা ও কর্মীর আগমন দেখলাম। কিন্তু শহীদ কাশেম-এর মত সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নেতৃত্ব। বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, সাংবাদিক, পুলিশ প্রশাসন, গণ-মানুষের আস্থাশীল ব্যক্তিত্ব, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রিয় ভাই শিক্ষক-কর্মচারীদের ভালবাসার স্নেহের মানুষটি আজও খুঁজে পাইনি।

আমরা কি পারব-দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শহীদ আবুল কাশেম পাঠান ভাই-এর স্মৃতি ধরে রাখতে-পারব কি তার অসম্পূর্ণ রেখে যাওয়া আদর্শ বাস্তবায়ন করতে! হে আল্লাহ আমাদেরকে তার আদর্শ বাস্তবায়ন করার তৌফিক দাও! আমীন॥

লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, বি.এল. কলেজ শাখা।

www.icsbook.info

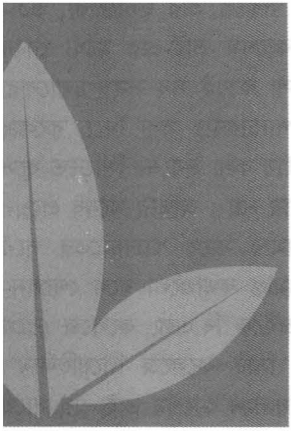

আজও ভুলিনি

জি.এম.শফিকুল ইসলাম

শহীদ আমান উল্লাহ আমান বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ৫৭তম শহীদ। সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানার দরগাহপুর গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। দুই ভাই চার বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন ৪র্থ। ছোট বেলায় তিনি পিতৃহীন হন। তাই লেখাপড়া শিখানোর জন্য তার চাচা তাকে খুলনা আলিয়া মাদরাসার এতিমখানায় ভর্তি করান। কৃতিত্বের সাথে শহীদ আমান ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণী পাস করে ৯ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছিলেন। ১৯৯৩ সালে ২০ সেপ্টেম্বর বেলা আনুমানিক ২টায় ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের বুলেটের আঘাতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

সেদিন ছিল ২০ সেপ্টেম্বর। আমি তখন সংগঠনের সাথী। খানজাহান আলী উপশাখার সভাপতি ছিলাম। সাংগঠনিক কাজে বাইরে ছিলাম। বেলা ১১টার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রিমু হত্যার জন্য শিবিরকে দায়ী করে মাইকিং এর আওয়াজ শুনতে পেলাম। কিছুক্ষণ পর খবর পেলাম সুন্দরবন

www.icsbook.info

কলেজে শিবিরের সাথে ছাত্রদলের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলছে। এদিকে সিটি কলেজে আবুল কাশেম পাঠান ভাইকে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা আটক করেছে। অনুরূপভাবে কমার্স কলেজেও সংঘর্ষের খবর পেলাম। আমি স্বাভাবিকভাবে ব্যস্ত হয়ে বাসায় ফিরে এসে বিভিন্ন জায়গার খোঁজ-খবর নিলাম। এ সময় মনে হচ্ছিল সারা শহর জুড়ে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। যথারীতি যোহরের নামাজ পড়ে কয়েকজন মিলে দুপুরের খাবার গ্রহণ করছিলাম। এমন সময় কয়েক রাউন্ড গুলি ও বোমার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখনও বুঝতে পারিনি আলিয়া মাদরাসায় হামলা হয়েছে। খাওয়া শেষ হয়নি তখনও। দারোগা পাড়ার শিবিরের কর্মী (নাম এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে না) কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে এসে বলল শফিক ভাই আলিয়া মাদরাসায় ছাত্রদল হামলা করেছে। আমাদের অনেকে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এবং সম্ভবত আমান ভাই মারা গেছেন। আমি, জাহাঙ্গীর আলম ভাই এবং আব্দুল্লাহ হিল মাহমুদ ভাইসহ কয়েকজন দ্রুত বেরিয়ে পড়লাম। ইতোঃমধ্যে মসজিদের মাইকে ঘোষণা আসলো খুলনা আলিয়া মাদরাসায় হামলা হয়েছে। এ হামলায় এতিম ছাত্র আমান উল্লাহ আমান শাহাদাতবরণ করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাহি রাজিউন।

আমরা প্রথমে মাদরাসার মেইন গেটের দিকে যাই তখনও সন্ত্রাসীরা মেইন গেটে অবস্থান করছিল। বাধ্য হয়ে আমরা পিছনের দিক দিয়েই মাদরাসা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করি। আমাদেরকে দেখে ভীতি-সন্ত্রস্ত ছাত্ররা চিৎকার করে কাঁদতে লাগল এবং বারবার বলতে লাগল এরা আমানকে হত্যা করেছে ওদের ক্ষমা করা যাবে না। আমরা তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। এদিকে আমানের নিঃস্তব্ধ দেহ সিঁড়ির কাছে পড়ে আছে। আমরা আমানের লাশকে অফিসের সামনে নিয়ে আসি। এ সময় তৎকালীন শিবিরের মহানগরী সভাপতি ও সেক্রেটারি যথাক্রমে আব্দুল ওয়াদুদ ভাই ও ওয়াসিয়ার রহমান মন্টু ভাই খবর পেয়ে ছুটে আসেন আলিয়া মাদরাসার ক্যাম্পাসে। মনে হচ্ছিল তখন এতিম ছাত্রদের চিৎকারে গোটা আলিয়া মাদরাসার আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। দায়িত্বশীলদের আসার খবর পেয়ে এতিম ছাত্ররা ওয়াদুদ ভাইকে জড়িয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল এখন এসে কি হবে? এ যে আমানের লাশ, আমান আর বেঁচে নেই। কি অপরাধ ছিল আমানের? তাকে কেন হত্যা করা হয়েছে? কিন্তু সেদিন সে প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারেনি।

ঘটনার পর পুলিশ ক্যাম্পাসে আসে। ছাত্রদলের খুনীদের নিক্ষিপ্ত গুলির খোসা উদ্ধার করে। তখন বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে গোটা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আমরা ছাত্রদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করি। এরপর পুলিশ আমানের লাশ মর্গে নিয়ে যায়। অধীর আগ্রহে আমরা অপেক্ষা করছি মাদরাসা ক্যাম্পাসে শহীদের জানাযা পড়ার জন্য। মাইকে বারবার ঘোষণা করা হচ্ছে আসরের নামাজের পর জানাযা অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু খুলনাবাসীর আর শহীদ

www.icsbook.info

আমানের জানাযা পড়া হলো না। কারণ তৎকালীন সরকারের স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলীর নির্দেশে এবং খুলনা আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপালের যোগসাজশে শহীদ আমানের লাশ মাদরাসায় না এনে গল্লামারি নিয়ে যায়। সেখান থেকে বটিয়াঘাটা থানা পুলিশের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়। এভাবে শহীদের জানাযা পড়া থেকে বঞ্চিত করা হয় খুলনাবাসীদের, বঞ্চিত করা হয় মাদরাসার অসংখ্য শোকাহত ছাত্র-শিক্ষককে। এর চাইতে আর কি নির্মমতা থাকতে পারে?

এরপর পুলিশ লাশের গাড়ি নিয়ে শহীদের গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে দেয়। পূর্ব থেকেই শহীদের সাথীরা ভিড় জমাতে থাকে শহীদের বাড়িতে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে পড়শিরা। মুষড়ে পড়েন শহীদের বিধবা মাতা। বোন রেশমা ও ছোট ভাই আব্দুর রহমানের গগণবিদারি কান্নায় আকাশ-বাতাশ ভারি হয়ে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু যেন থেমে গেল। সকলে যেন শোকে মুহ্যমান। বিধবা মা ক্রন্দনরত অবস্থায় বলতে লাগলেন, "আমানের আব্বা বড় আশা করত আমান বড় আলেম হবে, আমিও আশা করতাম অনেক কিছু, ওর আব্বা মারা যাওয়ার পর আমি ওর দিকে তাকিয়ে বেঁচে আছি, ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখতাম। আমান লেখাপড়া শিখবে। বড় হয়ে পরিবারের হাল ধরবে। ছোট ভাইকে লেখাপড়া শেখাবে। বাকি জীবন স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাবো। কিন্তু আমার সব শেষ হয়ে গেল।"

"আমানের আব্বা বড় আশা করত আমান বড় আলেম হবে, আমিও আশা করতাম অনেক কিছু, ওর আব্বা মারা যাওয়ার পর আমি ওর দিকে তাকিয়ে বেঁচে আছি, ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখতাম। আমান লেখাপড়া শিখবে। বড় হয়ে পরিবারের হাল ধরবে।

আমান প্রতি মাসে মায়ের সাথে দেখা করার জন্য একাধিকবার বাড়িতে যেত। সে আজ বাড়িতে যাবে। অন্যান্য দিনের মতো সে বোর্ডিং সুপারের নিকট থেকে ছুটি নিয়েছে। মায়ের সাথে দেখা করবে তাই। যাওয়ার কয়েকদিন পূর্বে মায়ের নিকট চিঠি পাঠিয়ে ছিল। চিঠিতে সে লিখেছিল, "মা আমি ২০ তারিখ বাড়িতে আসব"। আমান ঠিকই ২০ তারিখ বাড়িতে গিয়েছিল। কিন্তু জীবিত অবস্থায় নয়, ফিরে ছিল লাশ হয়ে। এই কি চেয়েছিল আমানের মা!

আমান প্রতিদিনের ন্যায় আজও ক্লাস শেষ করে যোহরের নামাজ শেষে রুমে ফিরেছে। হোস্টেলের সকল ছাত্র খাবার গ্রহণে ব্যস্ত। খাওয়া শেষ করতে পারেনি কেউ। এমন সময় সন্ত্রাসী ছাত্রদল নেতা চঞ্চল, দিদার ও মুকুলের নেতৃত্বে হামলা করা হয় আলিয়া মাদরাসায়। সন্ত্রাসীরা মেইন গেট দিয়ে গুলি করতে করতে প্রবেশ

www.icsbook.info

করে। মুহুর্মুহু বোমা আর গুলির শব্দে ছাত্র-শিক্ষক হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। সকলে প্রাণ ভয়ে ছুটাছুটি শুরু করে। নিরস্ত্র ছাত্র-শিক্ষক কেউ তাদের প্রতিরোধ করতে সাহস পায়নি। তখনও খাওয়া শেষ করতে পারেনি অনেকে। পানিও পান করতে পারেনি। আমান ভাতের প্লেট ফেলে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছিলেন। এসময় তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো সন্ত্রাসী দিদার ও চঞ্চলরা। বুলেটবিদ্ধ হয়ে আমান মা বলে চিৎকার করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। দ্বিতীয়বার গুলি করে দুনিয়া থেকে চির বিদায় করে দিল শহীদ আমানকে। শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে মহান আল্লাহ পাকের ডাকে সাড়া দিলেন আমাদের প্রিয় ভাই শহীদ আমান উল্লাহ আমান। শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্তে সাথীদের প্রতি তিনি আহ্বান করেছিলেন, "আমার বুকের তাজা রক্ত দিয়ে শহীদ আমান লিখে রাখ"। আজও সে লেখাটি আলিয়া মাদরাসার সিঁড়ির দেয়ালে শোভা পাচ্ছে।

দরিদ্র পরিবারের সন্তান পিতৃহীন আমান কষ্ট করে লেখাপড়া করত। গ্রামের লোক ও চাচাদের সহযোগিতায় তার পরিবার চলত। শাহাদাতের কয়েকদিন পূর্বে বিধবা মাতা আমানকে এগিয়ে দিতে মাদরাসায় গিয়েছিলেন। বিদায় নেয়ার সময় মা আমানকে বলেছিলেন, "আমান তুমি মাদরাসার বাইরে যেও না, মিটিং মিছিল করো না। তুমি মারা গেলে আমি কি করে বাঁচবো। আমাদের সব শেষ হয়ে যাবে।" জবাবে আমান বলেছিলেন, "মা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য যদি আমাকে শহীদ হতে হয় তবে আমি শহীদ হবো। আর তুমি হবে শহীদের মা। আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না মা। মা আমার জন্য দোয়া কর"। লাশ বাড়িতে পৌঁছলে মা চিৎকার করে বললেন, "আমি অশিক্ষিত বুঝতে পারিনি সেদিন বিদায়ের সময় আমান কি বলতে চেয়েছিল। এখন বুঝতে পেরেছি আমান শহীদ হতে চেয়েছিল"।

আমান ছিলেন নির্লোভ। অযথা বিধবা মাতাকে বিরক্ত করতেন না। ভাই-বোনের সাথে ভাল ব্যবহার করতো। বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে চলতেন। নিজের দুঃখ কষ্টের কথা কাউকে বুঝতে দিতো না। তাই আমান ছিল বন্ধুদের প্রিয় সাথী। তিনি ভাল সঙ্গীত গাইতে পারতেন। বিধবা মাতা বললেন আমান ছোটবেলা হতে নামাজ পড়তো। কুরআন পড়তো। মা আরো বললেন-শাহাদাতের ৬ মাস আগে আমান বলেছিল, "আমি যদি শহীদ হই তোমার কোন অসুবিধা হবে না"। তার ভিতর সবসময় শহীদ হবার প্রেরণা কাজ করতো। তাই আমি নিশ্চিন্ত যে, আমার ছেলে শহীদ হয়েছে। শিবিরের ছেলেরা আমার বাড়িতে আসা-যাওয়া করে, এতে আমি খুবই খুশি। ছাত্রশিবিরের সব ছেলেরাই আমার ছেলে"। শ্রদ্ধেয় চাচা ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন, "আমান কখনো কারো দিকে চোখ তুলে কথা বলতো না। সে ছিল বিনয়ী। সকলকে হাসি মুখে সালাম দিতো মোসাফা করতো। কিন্তু আমান আজ আমাদের মাঝে নেই"। শহীদ আমানের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বিশিষ্ট ইসলামী

www.icsbook.info

চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা মনোয়ার হোসেন মাদানী বললেন, "এতিম আমান আজ আমাদের মাঝে নেই। বুলেটের নির্মম আঘাতে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেছে আমান"। তৎকালীন হোস্টেল সুপার মাওলানা একরামুল হক বললেন-"আমান ছিল সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। খুব শান্ত ও অত্যন্ত অনুগত"। দীর্ঘ ৬ বছরের মধ্যে মাদরাসার সকল শিক্ষক ছাত্রসহ সকলে তাকে একজন ভাল ছাত্র হিসেবে জানতো। শহীদ আমান হত্যাকাণ্ডে সারা খুলনাসহ সকল ঈমানদার ব্যক্তি চোখের পানি ফেলেছে এবং এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে। কিন্তু খুনিরা খুন করে বীরদর্পে ঘুরে বেড়ালো। অথচ একজন খুনীও গ্রেফতার হয়নি। বিচার করা হয়নি খুনিদের, বরং সরকার তাদেরকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অন্যদিকে যাদের প্রত্যক্ষ মদদে আমানকে খুন করা হলো সেই মেয়র শেখ তৈয়বুর রহমানের বাসায় শ্রদ্ধেয় হুজুররা দাওয়াত খেয়েছেন এবং আমান হত্যার সমঝোতা করেছে। ধিক্কার জানাই এ সমস্ত হুজুরদের। জাতি কখনো তাদেরকে ক্ষমা করবে না। ক্ষমা করবে না শহীদের মাতাও।

শাহাদাতের পর সেদিন শহীদের সাথীরা আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল, হে আল্লাহ দুনিয়ার আদালতে আমান হত্যার বিচার হবে না জানি, কিন্তু তুমি এর বিচার করো। সত্যিই দুনিয়াতে আল্লাহ আমান হত্যার বিচার করেছেন। খুলনাবাসী তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন।

পরিশেষে বলতে চাই, শহীদ আমান চলে গেছে। কিন্তু আমরা কি তার অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে পেরেছি? পারিনি। তাই শহীদ আমানের স্বপ্নকে বুকে ধারণ করে শহীদ হবার তীব্র বাসনা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে শহীদের প্রিয় সাথীদের। সকল ভীরুতা, জড়তা ও কাপুরুষতাকে মাড়িয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজকে আরো বেগবান করতে হবে। আল্লাহ শহীদ আমানসহ সকল শহীদের শাহাদাতকে কবুল করুন এবং আমাদেরকেও শহীদ হবার তীব্র বাসনা নিয়ে শহীদের অসমাপ্ত দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসার তৌফিক দিন। আমীন॥

লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, খুলনা মহানগরী।

www.icsbook.info

শাহাদাত প্রেরণার বাতিঘর

মুহাম্মদ শামছুর রহমান

তারা হারালে আকাশে আঁধার নামে। তাই আকাশ কাঁদে। তেমনি মুমিনের বিদায়ে তারারা কাঁদে, আকাশ কাঁদে। কাঁদে মাটি, মাটির বুক খালি হয়ে যায়। তাই তার বুকে আকুল আবেদন নিয়ে জমিনের মালিকের নাম মুমিন নেয় না, তাই জমিন কাঁদে। এভাবেই গোটা পৃথিবীকে কাঁদিয়ে জয়ী হন আমাদের শহীদেরা। শাহাদাতের উপর লিখতে গিয়ে নিজের কলম যেন বারবার অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। সমস্ত আবেগ আর অনুভূতিগুলি অজস্র বিহঙ্গের ন্যায় মাথার উপর এসে ভর করে। শহীদদের রক্তমাখা স্মৃতি, শহীদ পরিবার ও আত্মীয় স্বজনদের রোনাজারিকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বেসামাল হয়েছি, বহুবার তাদের অশ্রু মুছতে গিয়ে নিজেরাই হয়ে পড়েছি অশ্রুসিক্ত। শহীদেরা যেন হৃদয় দুয়ারে এসে বারবার ডাক দিয়ে যায়।

শহীদ হতে কে রাজি আয়
শহীদ এসে যায় ডেকে যায়।

পৃথিবীর ইতিহাস সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বের ইতিহাস। পৃথিবীর শুরু থেকে এ বিরোধ চলে আসছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত চলবে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, যুগে যুগে সত্যপন্থীরাই বিজয়ী হয়েছেন আর মিথ্যার ধ্বজাধারীরা নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। এই রকম এক রক্তপিচ্ছিল গর্বিত ময়দান খানজাহানের স্মৃতিধন্য আমাদের খুলনা। রক্তেসিক্ত এই জমিনে আমাদের প্রিয় শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম, হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা শহীদ আবুল কাশেম পাঠান, শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান, শহীদ আমান উল্লাহ আমান, শহীদ শেখ রহমত আলী ও শহীদ শেখ বেলাল

www.icsbook.info

উদ্দিন শাহাদাত বরণ করেন। তারা আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজেরা হয়েছেন সফল। আর আমাদেরকে করেছেন আজীবন ঋণী।

আমাদের শহীদেরা আমাদের জন্য প্রেরণার এক বাতিঘর। এখান থেকে এমন এক আলোকবর্তিকা বিচ্ছুরিত হয় যা জাহেলিয়াতের সমস্ত জঞ্জাল আর অন্ধকারকে ভাসিয়ে নিয়ে প্রতিটি মুমিন হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত করে এক আলোর মশাল। প্রতিটি হৃদয়কে দোলা দিয়ে নতুন করে শপথ নিতে শেখায়। তাই শহীদদের রক্তাক্ত খুন আন্দোলনকে করেছে আরো বেগবান, আর জমিনকে করেছে উর্বর। এর এক একটি রক্ত কণিকা থেকে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য আল্লাহর দ্বীনের গোলাম। ঘুমন্ত একটি জনপদ, অচেতন একটি মানবগোষ্ঠীকে জাগাবার জন্য শাহাদাত চেতনার বিস্ফোরণ। যেন ইস্রাফিলের বজ্র নিনাদ। এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প যা বিবেকবোধকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়, যা সত্য পথের সন্ধানীদের ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার পরিবর্তে দীপ্ত শপথে বলীয়ান হতে শেখায়। শতশত শিক্ষাশিবির আর বিশ্ববরেণ্য আলোচকদের হাজার হাজার আলোচনার চেয়ে একটি শাহাদাত বেশি ভারী ও আবেগ সৃষ্টিকারী। শহীদের রক্তের প্রতিটি ফোটা চেতনার সঞ্জীবনী। কোন অত্যাচার, হুমকি, ভয়, প্রাচুর্য ও লোভ লালসা দিয়ে তাদের দমিয়ে রাখা যায়না। আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের রক্ত গড়ে তোলে হিমালয় পাহাড়। তাইতো শহীদ আব্দুল মালেক থেকে নিয়ে ১৩৯ তম শহীদ আব্দুল্লাহ আল মঞ্জু ভাইয়ের তপ্তখুন ইসলামী আন্দোলনকে এত বেশি উর্বর করেছে যে এই আন্দোলনই যেন বাতিলের একমাত্র আতঙ্ক। বিশেষ করে জীবিত মুন্সী আব্দুল হালিম, আবুল কাশেম পাঠান, আমিনুল ইসলাম বিমান, আমান উল্লাহ আমান, শেখ রহমত আলী ও শেখ বেলাল উদ্দিনের থেকে শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম, আবুল কাশেম পাঠান, বিমান, আমান, রহমত ও বেলাল ভাইয়েরা আরো বেশি শক্তিশালী। ইহলৌকিক জীবন থেকে বিদায় নিয়েও শহীদেরা মৃত্যুহীন জীবন লাভ করেন। আর পরজগতে যাওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা তাদের জীবিত করে নিজের মেহমান হিসেব জান্নাতে থাকতে দেন। সুরা আল ইমরানের ১৬৯ ও সূরা বাকারার ১৫৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- "আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাঁদের মৃত মনে করো না, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা জীবন্ত, কিন্তু তাঁদের জীবন সম্পর্কে তোমরা অনুভব করতে পারনা।" হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, "তাদের প্রাণ সবুজ পাখির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে তাদের আবাস। ভ্রমণ করে বেড়ায় তারা গোটা জান্নাত, অতঃপর ফিরে আসে আবার নিজ নিজ আবাসে।" (মুসলিম, তিরমিজী ও ইবনে মাজাহ)

যদি প্রশ্ন করা হয় কেন আমাদের এই প্রিয় ভাইদেরকে শাহাদাতের পেয়ালা পান করতে হলো? কি অপরাধ ছিল তাদের ? জবাবে সুরা বুরুজের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন "মহা প্রক্রামাশালী আল্লাহর উপর ঈমান আনা ছাড়া তাদের আর

www.icsbook.info

কোন অপরাধ ছিল না। "প্রথম মানুষ আল্লাহর প্রথম খলিফা ও প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) দুনিয়ায় আসার সময় তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ তাঁকে বলেন- "আমার পক্ষ থেকে আইন বিধান ও পথ নির্দেশনা যাবে। তদনুযায়ী গোটা জীবন পরিচালনা করলে জীবন সার্থক হবে এবং কোন দুঃখ ও দুচিন্তার কারণ থাকবে না।" এর থেকে বুঝা গেল যে মানুষের দুনিয়ায় আসার এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর হুকুম আইন শাসন মেনে চলা। কিন্তু সমাজে আল্লাহর আইন শাসনের পরিবর্তে যদি মানুষের আইন শাসন চালু থাকে, তাহলে তা প্রত্যাখান করে আল্লাহর আইন শাসন কায়েমের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যাকে কুরআনের পরিভাষায় "জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ" বলা হয়েছে। এটাকেই বাংলা ভাষায় ইসলামী আন্দোলন বলা হয়। এ আন্দোলন সফল হলেই তাকে ইসলামী ইনকিলাব বা ইসলামী বিপ্লব বলা হয়। একে ইকামাতে দ্বীনও বলা হয়। একজন মুমিনের জীবনের লক্ষ্যই ইসলামী ইনকিলাব। প্রথমে ইনকিলাব তার অন্তর রাজ্যে, ঘরে, দেশে এবং সর্বশেষ গোটা বিশ্বে। একজন মুমিনের যিন্দেগী মূলত তিন স্তরে বিভক্ত-হিজরত, জিহাদ ও শাহাদাত। এ এক অনস্বীকার্য সত্য যে ত্যাগ কুরবানী ব্যতীত মহৎ কাজ করা যায় না। আখেরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই যেহেতু সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম, সেহেতু খোদা প্রেম ব্যতীত ত্যাগ ও কুরবানী সম্ভব নয়। খোদা প্রেমিক মানুষ খোদা প্রেমে উন্নত হয়ে অকাতরে তার আপনজন, আত্মীয়-স্বজন, ঘরবাড়ীতে, ক্ষেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য কুরবানী করবে এটাইতো স্বাভাবিক। সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের মক্কী জীবনে এ কুরবানীর অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, এটাই হিজরত।

মুমিন যিন্দিগির দ্বিতীয় স্তর জিহাদ। ঈমান ও জিহাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জিহাদ ব্যতীত ঈমান অর্থহীন। আল্লাহ বলেন, "প্রকৃত মুমিন তারাই যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর এ সম্পর্কে কোন দিধাদ্বন্দ্ব সন্দেহ পোষণ করেনা এবং নিজেদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারাই ঈমানের দিক থেকে সত্যবাদী (হুজরাত ঃ ১৫)। ঈমানের বাস্তব রূপই জিহাদ। পবিত্র কুরআনের বহু স্থানেই তাই জিহাদের ডাক দেয়া হয়েছে। তাই একজন মুমিনের গোটা জীবন এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত জিহাদের ভিতর দিয়েই কেটে যায়। আর জিহাদ করতে হলে শাহাদাতের অভিলাষ অবশ্যই হৃদয়ে পোষণ করতে হবে। যে দিলে আল্লাহর জন্য জীবন বিলিয়ে দেয়ার অভিলাষ নেই, সে দিলে ঈমানের কোন স্থান নেই। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম সর্বোত্তম আদর্শ। শহীদেরা হচ্ছেন সত্যের সাক্ষ্য। তারা জীবনবাজি রেখে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য যে মৌখিক শপথ করেছেন জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তাঁরা বাস্তব সাক্ষ্যের নমুনা পেশ করেন। কাজেই শহীদদের সাক্ষী শহীদ নিজেই। রাসূল (সাঃ) বলেছেন- "ক্ষত ও রক্তসহ তাঁদের কাফন পরিয়ে দাও, গোসল দিওনা। শহীদেরা তাজা রক্ত

www.icsbook.info

নিয়ে কিয়ামতের ময়দানে উঠবে।" (মুসনাদে আহমদ, নেসায়ী)। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে কিয়ামতের দিন সে আঘাত নিয়েই উঠবে এবং তার ক্ষতস্থান হতে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। রং হবে রক্তের মতই কিন্তু গন্ধ হবে মিশকের মত। শহীদেরা জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত থামেনি। কোন আঘাত, কোন নির্যাতন, বাঁধার কোন হিমালয় শহীদদেরকে তাদের লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। ইহা চূড়ান্ত সাক্ষ্য দান, যাদের প্রতিটি রক্তকণা, শরীরের প্রতিটি পশম, প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিতে দিতে অবশেষে নিথর হয়ে পড়েছে।

শহীদের উত্তরসূরি হিসেবে আমরা যারা আজীবন ঋণী হয়ে আছি তাদের কি করণীয় সেটিই সবচেয়ে বড় বিষয়। শাহাদাতের দিবসগুলোতে কবর জিয়ারত, কুরআনখানী, দোয়া অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা ও স্মৃতিচারণের মাধ্যমে শুধু শোক সাগরে ভাসলে চলবে না, বরং শোককে শক্তিতে পরিণত করে সাহসী পদক্ষেপ সামনে এগিয়ে যেতে হবে। শহীদদের রেখে যাওয়া অবাস্তবায়িত কাজকে সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্য সর্বপ্রথম ব্যক্তি জীবনের পরিবর্তন ও মান উন্নয়নের জন্য নতুন করে আবার শপথ নিতে হবে। দ্বিতীয়ত ঃ আলোর পথের এই জান্নাতি কাফেলার দাওয়াত না পাওয়ার কারণে যে অসংখ্য বনি আদম অন্ধকারের চোরাগলি দিয়ে জাহান্নামের দিকে ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে চলেছে তাদের হাত ধরে অত্যন্ত মমতার সাথে জান্নাতি কাফেলায় শামিল করাতে হবে। তাহলে আমাদের শহীদেরা জান্নাত থেকে আমাদের জন্য দোয়া করবেন। কিন্তু দুঃখ হয় যখন দেখি আমাদের আন্দোলনের অনেক কর্মী যারা শহীদের তপ্ততাজা খুন নিজ চোখে দেখেছেন, শহীদের কফিন বহন করেছেন অথচ নিজে সাংগঠনিকভাবে মানের উন্নয়ন করতে পারেননি। পারেননি জীবনকে সংগঠনের আনুগত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে। আবার ছাত্র আন্দোলনে যারা অনেক ত্যাগ কুরবানীর নজরানা পেশ করেছেন তাদের অনেকেই বৃহত্তর আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখার পরিবর্তে আন্দোলনের শীর্ষ সমালোচকে পরিণত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কবি মতিউর রহমান মল্লিক ভাইয়ের একটি শহীদি গানের কথা মনে পড়ছে। তিনি লিখেছেন-

এত শহীদ রক্ত ঢালে

তবু কেন তোমার পাষাণ হৃদয় গলে না? .....

কাজেই শহীদের প্রতি ফোঁটা রক্তের বদলা আমাদেরকে নিতে হবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার মাধ্যমে। আর তা না হলে যদি আমাদের অবহেলা আর অলসতার কারণে কিয়ামতের কঠিন ময়দানে আমাদের শহীদেরা তাঁদের ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়ে আমাদেরকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করার সেদিন আমাদের নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় থাকবে না। বর্তমানে ইসলামের স্বীকৃত দুশমন আওয়ামী জালেমশাহী সরকার ইসলামী আন্দোলন ও এ আন্দোলনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে সম্পূর্ণ

www.icsbook.info

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য তথাকথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের নামে চরম মানবতা বিবর্জিতভাবে মিথ্যা মামলা দিয়ে বিনা বিচারে কারাগারে আটক রেখেছে। এ চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে মর্দে মুমিনদের সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় বাতিলের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হবে–

বেরিয়েছে যেই কাফেলা
ফিরবে না সে কোন দিন
হয়তো বিজয়ী হবে
নয়তো তার ফিরবে কফিন।

পরিশেষে বলতে চাই পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে খ্যাত আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ মূলত খানজাহানের দেশ, শাহজালাল, শাহপরান, শাহমাখদুম আর হাজী শরীয়তুল্লাহর দেশ। এমনি ভাবেই দেশের আনাচে কানাচে ঘুমিয়ে আছেন অসংখ্য সূফী-সাধক, শহীদ ও আল্লাহর মাহবুব বান্দা। যে দেশের মানুষ এশার নামাজ আদায় করে ঘুমাতে যায় এবং 'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম' এই ধ্বনিতে যাদের ঘুম ভাঙ্গে সেদেশে বাতিলের কোন হুংকার বা আস্ফালনকে আমরা পরোয়া করি না। আমাদের বিশ্বাস আমরা যদি শহীদি তামান্না নিয়ে ময়দানে সঠিক ভূমিকা রাখতে পারি তাহলে নিকট ভবিষ্যতে আগামীর বাংলাদেশ হবে ইসলামের বাংলাদেশ, যেখানে কালেমার পতাকা পতপত করে উড়বে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ যেন সেই দৃশ্য আমাদের চোখে দেখে যাওয়ার তৌফিক দেন। আল্লাহ যেন খুলনার ছয় জন শহীদসহ সকল শহীদ ভাইদের শাহাদাতকে কবুল করে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করেন। আমীন॥

লেখক ঃ সাবেক কেন্দ্রীয় তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক, সাবেক সভাপতি, খুলনা মহানগরী
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

**"আমাদের শহীদেরা সবচেয়ে বড় সম্পদ
গড়ে গেছে সহসের দ্বিধাহীন সোজা রাজপথ।"**

www.icsbook.info

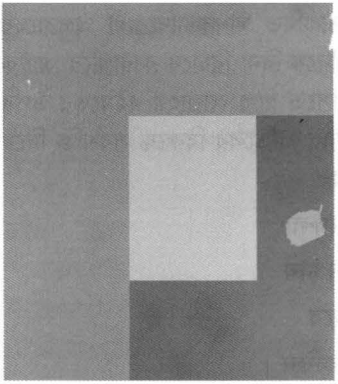

২০ সেপ্টেম্বর'৯৩
আমাদের শপথ গ্রহণের দিন

মো: তারিকুল ইসলাম পিকু

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম, শহীদ আবুল কাশেম পাঠান, শহীদ শেখ রহমত আলী, সবার সাথেই জড়িয়ে আছে কিছু কিছু না ভোলার স্মৃতি। স্মৃতিগুলো এত বেশি সতেজ এতবেশি প্রাণবন্ত যা স্মৃতির মানসপটে আমৃত্যু চির সবুজ হয়ে থাকবে। ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পাওয়া থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এটাই জীবন চলার পথে একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। যা থেকে এ কঠিন পথে চলার সাহস পাওয়া যায়, পাওয়া যায় অনুপ্রেরণা। পিছু টানের সকল শেকল ভেঙ্গে সামনে চলার প্রেরণা জোগায়।

আমি আসলে কোন লেখক নই লেখার কথা মনে হলে আঁতকে উঠি। এই স্মারক গ্রন্থে লেখা না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই ছিলাম, কিন্তু বাদ সাধলেন সভাপতি সাহেব। সভাপতির কথা অনুযায়ী ১০ সেপ্টেম্ব'১২ সন্ধ্যায় লেখার জন্য বসলাম কিন্তু কি লিখব বুঝতে পারছি না। ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে পথচলা শুরু ঢিলেঢালাভাবে। মজবুতভাবে এ পথে এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত নেই ১৯৯৩ সালের ২০ শে সেপ্টেম্বর। থেকে সেই থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত কিভাবে সময় কেটেছে আমার জানা নেই। ২০ শে সেপ্টেম্বর-এর পূর্বে বি.এল. কলেজ ছিল সাজানো ফুল বাগানের মত। চারদিক থেকে অসংখ্য জনশক্তি ক্যাম্পাসে আসত মিছিল হলে বিরাট মিছিল হত। সবকিছু মনে হত একটু অন্যরকম। সামনের সারিতে থাকা নেতাদের বা দায়িত্বশীলদের যাদের খোঁজ পাওয়া যায়নি তাদের বিষয় আলোচনা না থাকলেও এটা উল্লেখ করার মত যাদের কথা কখনো চিন্তাও করা হয়নি তারা পেছন থেকে এসে হাল ধরেছে।

www.icsbook.info

২০শে সেপ্টেম্বর '৯৩ ঐতিহাসিক কাল দিনটি আমাদেরকে নাড়া দিয়ে যায় বারবার আমি যখনই আমাকে মিলাই ২০শে সেপ্টেম্বর এর পূর্বে এবং পর পার্থক্য খুঁজে পাই অনেক। কারণ ঐদিন শপথ নিয়েছিলাম শুধু আমি নই শত-শত কর্মীরা ঐদিন শপথ নিয়েছিল। খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেইন গেটের বিপরীত দিকের মসজিদটি আজ হয়ত অনেক সুন্দর হয়েছে। সে দিন মেজে কাঁচা জানালাবিহীন পাকা দেয়াল, ভিতরে চাটাই মাদুর দিয়ে চলত নামাজ। অনেকটা শেষ ওয়াক্তে আমরা কয়েকজন আসরের নামাজ পড়তে যাই। নামাজ শেষে মসজিদে বসে আলাপ আলোচনার এক পর্যায়ে রাশেদ ভাই তৎকালীন ছাত্রসংসদের কমন রুম সম্পাদক আমাদের আবেগকে সামাল দেয়ার চেষ্টা করছিলেন। উপস্থিত সবার প্রশ্ন হল এখন আমাদের কি করতে হবে? যেখানে হালিম ভাই নেই, রহমত ভাই নেই, আহত হয়ে হাসপাতালে কাতরাচ্ছে অনেক দায়িত্বশীল ভাইয়েরা। আর উত্তর হল এখন খুনের বদলা নিতে হবে তবে পদ্ধতি হবে ভিন্ন খুনের বদলে খুন নয়। শাহাদাতের বদলা কখনো খুন দিয়ে হয় না। খুনিরা যে উদ্দেশ্যে খুন করেছে শহীদ করেছে আমাদের ভাইদের সে উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করে দিতে হবে, আর তা করতে হলে প্রয়োজন নিজেকে গড়ে তোলার। একদিকে নিজেকে তৈরি করতে হবে শহীদ হালিম, কাশেম, রহমতদের মত করে অন্যদিকে শহীদের রক্তকে ভিত বানিয়ে শত-সহস্র জনশক্তিকে দাওয়াতের মাধ্যমে জড়ো করে গড়তে হবে বিরাট প্রাসাদ, যেখানে পত্ পত্ করে উড়বে কালেমার পতাকা।

ইসলামী আন্দোলনের যতটুকু ইতিহাস শুনেছি, বি.এল. কলেজের প্রাক্তন ভাইদের কাছে জেনেছি দাওয়াতই ছিল এ আন্দোলনের শক্তির সবচেয়ে বড় কর্মসূচি। ব্যক্তিগত ভাবে দাওয়াত এবং সমষ্টিগতভাবে দাওয়াতের মাধ্যমে যেন দ্বীনের দা'য়ীদের পদচারণায় মুখরিত হত। আজও আমরা দায়িত্বশীল কর্মী সবাই কাজ কাজ করছি, সাংগঠনিক মজবুতির জন্য প্রচুর সময় ও শ্রম দিচ্ছি কিন্তু কি কাজ করছি প্রকৃত সেই দাওয়াত যা মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করে সেটা কতটুকু দিতে পারছি তা আত্মসমালোচনায় আসা উচিত। শক্তির প্রদর্শনী এ আন্দোলনকে স্থায়ী মজবুতি দিতে পারেনি, তবে সাহসিকতা ছাড়া এ আন্দোলন সম্ভবও নয়। ইতিহাস শুধু সাহসি মানুষের কথা বলে, আর ভীরু পুরুষেরা আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। ক্যাম্পাসের শ্লোগান ছিল 'মানুষ গড়ার আঙিনায়, মানুষ হওয়ার পরিবেশ চাই' আজ সারা দেশের ক্যাম্পাসগুলো মানুষ হওয়ার পরিবেশ নেই যে সকল হল থেকে আজান শোনা যেত, কুরআন হাদীস পাওয়া যেত সেখানে পুলিশ রেড দিয়ে উদ্ধার করে অস্ত্র, রড হকিস্টিক, ছাড়াও অনেক কিছু। হারানো সেই পরিবেশ পুনরুদ্ধার করতে কাজ করতে হবে সবাইকে এক যোগে। গ্রহণ করতে হবে সঠিক এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করতে হবে গঠনমূলক কাজ। শহীদ হালিম, রহমতের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে আছে যে ময়দান তা কখনো হাত ছাড়া থাকতে পারে না।

লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, খুলনা মহানগরী।

www.icsbook.info

কিছু স্মৃতি

মিয়া মুজাহিদুল ইসলাম

শহীদ, ইসলামী আন্দোলন, বা ছাত্রশিবির কি, কেন? তখন বুঝতাম না। ১৯৮৯ সাল, মাত্র ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র। তবে পারিবারিক কারণেই নিজেকে সবসময়ই শিবির কর্মী মনে করতাম। সোনাডাঙ্গায় মহানগরী ছাত্রশিবিরের কর্মী সম্মেলন। আমার শিরোমনি এলাকার জনশক্তির মাঝে মেজ ভাই গোলাম কুদ্দুসভাই তখন মহানগরীর একজন দায়িত্বশীল। ভাইকে বললাম, আমি যাব। আমাকে একটা কার্ড দিতে হবে। এরপর কার্ড বুকে লাগিয়ে রিজার্ভ বাসে করে কর্মী সম্মেলনে পৌঁছালাম। সুসজ্জিত বিশাল প্যান্ডেল, বুঝতাম না। এসে হাজারও প্রশ্ন। দেখি মেজ ভাই কাঁধে হ্যান্ড-মাইক ঝুলিয়ে শৃঙ্খলার দায়িত্ব পালন করছে। দৌড়ে গিয়ে দেখা করলাম। মেজ ভাই আমাকে নিয়ে প্যান্ডেলের পিছন দিকে একজন ভাইয়ের হাতে আমাকে ধরিয়ে দিয়ে রসূল আমার ছোট ভাই, হারিয়ে যেতে পারে। হাত ছাড়বেন না। সাদা স্টাইপ শার্ট কালো প্যান্ট, কালো সু ইন করে পরা। লম্বা চুল, বাতাসে উড়ছে। চেয়ারে বসে আমাকে পায়ের ফাঁকে নিয়ে নাম জিজ্ঞাসা করলো। মুজাহিদুল ইসলাম বলতেই গান গাওয়া শুরু করল "চলো চলো-চলো মুজাহিদ পথ যে এখনো বাকি"। পকেট থেকে চকলেট বের করে আমাকে দিল। কত স্নেহ, কত কথা সামান্যই মনে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ভাইয়া আপনার নাম?- "মুন্সী আব্দুল হালিম"। তোমাদের এলাকায় বাড়ি। সকাল ১১.৩০, মেজ ভাই- ১০ টাকার একটি নোট দিয়ে বলল তুই বাড়ি যা- মারামারি হতে পারে। হালিম ভাই আমাকে নগর পরিবহন বাসে তুলে দিল। দৌলতপুর

www.icsbook.info

পৌঁছাতে শুনি সোনাডাঙ্গায় মারামারি হচ্ছে। বাড়িতে এসে শুনি মেজভাই আহত হয়েছে। এই প্রথম হালিম ভাইকে চিনলাম। এরপর প্রায়ই আমাদের বাড়িতে এসে আমাকে আদর করত। মজার মজার কথা বলত, শিবির করতে বলত। শিবিরের প্রতি এত আকর্ষণ বোধ করতাম কেন জানি না। সে বছর ঈদে ছোট একটি ঈদ কার্ড পেলাম। হালিম ভাইয়ের নিজ হাতে লেখা। "প্রস্ফুটিত হও ফুলের সৌরভে, প্রদীপ্ত হও ইসলামের গৌরবে"। কি-চমৎকার আহবান। এখন বুঝি এসবই ছিল তার ব্যক্তিগত দাওয়াতী কাজের কৌশল। এভাবে প্রায়ই হালিম ভাইয়ের অকৃত্রিম স্নেহ, ভালবাসা ও আদর পেয়েছি। শিশু কিশোরদেরকে সংগঠনে আকৃষ্ট করার তার কৌশল, শ্রম ও আন্তরিকতা সত্যিই ব্যতিক্রম।"

বাড়িতে তখন আমি আমার তিন বোন এবং আব্বা মা থাকি। সবার ছোট হওয়ায় অনেক আদরের ছিলাম। বোনেরা ছাত্রীসংস্থার দায়িত্বশীলা ছিল। আমরা যে ঘরে থাকতাম তার সবচেয়ে বড় দেওয়াল জুড়ে শিবিরের সকল শহীদদের ছবি, পেপার কাটিং, শাহাদাতের রক্তমাখা ছবি, জানাযার ছবি সুন্দর ও পরিপাটি করে লাগানো ছিল। বোনদের সাথে বসে বসে আমিও কাটিং এর কাজে সহযোগিতা করতাম কোথাও কোন শাহাদাতের ঘটনা ঘটলেই তার কাটিং দেওয়ালে সাঁটানো হতো। কিন্তু খুলনার কোন শহীদ ছিলনা। নিচের দিকে ডানপার্শ্বে ফাঁকা জায়গা রেখেছিল আমার বোনেরা। আমরা বলাবলি করতাম খুলনার প্রথম শহীদ হবে আমার মেজ ভাই। এই জায়গা ফাঁকা থাক! অনেক ছোট, বুঝতাম না-তবে এটা বুঝতাম, শহীদ হলে বেহেশ্‌ত পাওয়া যায়। তাই শহীদ হওয়ার প্রতি আকাঙ্খা জন্ম নিত। যখন ৭ম শ্রেণীর ছাত্র, তখন আমিনুল ইসলাম বিমান ভাই খুলনাতে ইসলামী আন্দোলনের প্রথম শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন।

স্কুল কর্মী হিসেবে তারের পুকুরের (জাতিসংঘ পার্ক) জানাযায় অংশ নিলাম। শহীদের পিতার বক্তব্য শুনে আপ্লুত হলাম। "আমার ছেলে হারানো বেদনার চেয়ে, তোমাদের ভাই হারানোর বেদনা অনেক বেশি"। কিছুটা বুঝে, কিছুটা না বুঝে, দায়িত্বশীলও জনশক্তিদের কান্নার রোল দেখে নিজেকে সামলাতে পারি নাই।

১৯৯২ সালে সম্ভবত ছাত্রসংসদের অভিষেক অনুষ্ঠান সরকারি বি.এল. কলেজে। প্রধান অতিথি কবি সানাউল্লাহ নূরী। স্কুল কর্মী হিসেবে এ অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা নয়। তারপরও কবিকে স্ব-চক্ষে দেখার আগ্রহে গেলাম। কলেজের প্রথম গেট দিয়ে ঢোকার সময় দেখি রিক্সা যোগে হালিম ভাই সহ আরেকজন ভাই কলেজ থেকে বের হচ্ছে। ঠিক বর্তমান অধ্যক্ষের বাসভবনের সামনের রাস্তা। আমাকে দেখে স্বভাব সুলভ হাসি দিয়ে হালিম ভাই- জোরে গানগেয়ে উঠল" একজন মুজাহিদ কখনো বসে থাকে না" ....". রিক্সার দু'জনেরই সাদা পোশাক আমার সাথে অন্যভাইকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম হালিম ভাইয়ের পাশের ভাইটি আবুল কাশেম পাঠান ভাই। এ কলেজের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্রনেতা। এখন বুঝি হালিম ভাইয়ের পাশের সিটেতো

www.icsbook.info

কাশেম ভাইকেই মানায়। আর কে তার পাশে বসার যোগ্য। খোদার পক্ষ থেকে যোগ্যলোক বাছাই হয়। সাদা পোশাক, বড় চুল- দু'জনের একসাথে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠা- কি চমৎকার সে দৃশ্য। আবারও দেখতে ইচ্ছে হয়- হালিম, কাশেম ভাই একসাথে হেসে উঠেছে। দু'জন হয়ত ঠিকই একসাথে হেসে উঠেছে নেই শুধু হতভাগ্য আমরা। দায়িত্ব পালনকালে এ স্মৃতির কথা অনেক ভাইকেই বলেছি। যতবার হেঁটে/মোটর সাইকেলে এই রাস্তা দিয়ে যেতাম- স্মৃতিতে সেই রিক্সার কথা ভেসে দু'জনের একসাথে হেসে উঠা দেখতে ইচ্ছে করে।

সম্ভবত ১৯৯২-৯৩ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিজয়ের দু'তিন দিন পরের কথা। নির্বাচিত প্রায় সকল ভাইয়েরা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল, সকাল ১০-১১ টা হবে। কাশেম পাঠান ভাইয়ের প্রস্তাব বিল ডাকাতিয়ায় নৌকা ভ্রমণে যাবে"। ভিপি জাকির ভাই, হালিম ভাইসহ সবাই বলল খুবই মজা হবে। দু'টা নৌকা (গ্রামের ডুঙ্গা) নিয়ে বের হলাম। হালিম ভাই ও কাশেম ভাই একই নৌকায়, আমি জাকির ভাইয়ের সাথে অন্য নৌকায়। রহমত ভাইও আমাদের নৌকায় ছিল। মোট ৮-৯ জন হবে দু'নৌকায়। কাশেম ভাই চেড় দিয়ে চাপ দিয়ে ডুবিয়ে দিল। বিল ডাকাতিয়াতে মাঝে ডুবাডুবি। কি প্রাণবন্ত দুষ্টমি। অনেক শাপলা তুলে দুপুর ২-৩ টায় বাড়িতে ফিরলাম।

১৯৯৩ সালের ২০ অক্টোবর বিকাল ৩-৪ টার দিকে আমি বাজার মসজিদে গিয়েছিলাম কর্মী আলোচনা চক্রে অংশ নিতে। শুনলাম বি.এল. কলেজে মারামারি হয়েছে শহীদ হালিম ভাইকে জবাই করেছে। সব স্মৃতি তখন হারিয়ে গেল। বৈঠকের সবাই হাউ-মাউ করে বলতে লাগলাম। দামোদর হাইস্কুল মাঠে শহীদের বিশাল জানাযায় অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য হলো।

শহীদ আমান উল্লাহ ভাই আমার পূর্ব পরিচিত ছিলনা। তবে তার শাহাদাতে গোটা খুলনাবাসীই কেঁদেছিল। দায়িত্বের কারণে আমান ভাইয়ের আম্মা আর ছোট ভাইয়ের সাথে অনেক ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ হয়েছে।

হালিম ভাইয়ের শাহাদাতের কিছুদিন পর দৌলতপুর বেবিট্যাক্সি ইউনিয়নের সামনে প্রতিবাদ সভা। সভার সভাপতি আবুল কাশেম পাঠান ভাই। উপস্থিত হলাম সেখানে কাশেম ভাইকে অঝোরে কাঁদতে দেখেছি। পরক্ষণে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে দরাজ কণ্ঠে খুনিদের শাস্তির দাবি জানাতে দেখেছি। মনে হত প্রতিশোধ নিতে তিনি একাই যথেষ্ট। শুধু দায়িত্বশীলদের আনুগত্যের বন্ধনই তাকে দমিয়ে রেখেছে।

১৯৯৪ সালের ২৩ অক্টোবর। হঠাৎ শুনি আবুল কাশেম পাঠান ভাই গুলিবিদ্ধ। আমি সবেমাত্র সাথী শপথ নিয়েছি। ৯ম শ্রেণীর ছাত্র। আবেগ ধরে রাখতে পারি নাই। (তারের পুকুর) আল হেরা মসজিদের বরান্দায় লাশ রাখা। বিশাল বুকের পাটা, প্যান্ট এবং সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি পরা কাশেম ভাই সটান শুয়ে আছে। হাসিমাখা মুখ। ৫-৭

www.icsbook.info

ভাই পাগল প্রায় কান্নাকাটি করছে। অন্যরা প্রতিবাদমুখর। গুলির ক্ষত স্থান দেখতে চাইলে, এক ভাই বলল গেঞ্জি উঁচু করে দেখ! পাঁজরের মাঝেই ছোট্ট একটি ছিদ্র!

পিঠের মাঝ থেকে বিশাল জায়গা নিয়ে গুলি বের হয়েছে। লাশ নিয়ে মিছিল সদর হাসপাতালের মর্গের সামনে হাজারো ছাত্র-জনতার মিছিল। মনে হচ্ছিল গোটা খুলনাবাসী তাদের প্রিয় ছাত্রনেতাকে হারিয়েছে।

শহীদ সাংবাদিক বেলাল ভাইকে নিয়ে হাজারো স্মৃতি, ঘটনা যা লিখে, প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আত্মীয় হওয়ার কারণে আরো বেশি ঘনিষ্ঠ। তার ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও চৌকস গুণাবলীর কাছে মনে হয় পৃথিবীর সব ব্যক্তিত্বই পরাজিত। ২০০৫ সালের ফেব্রু' মাসের ৫ তারিখ। সন্ধ্যায় ডুমুরিয়ার প্রোগ্রাম শেষ করে বড় ভাই মিয়া গোলাম পরওয়ার ভাইয়ের সাথে বাড়ি ফিরে সবেমাত্র ড্রয়িং রুমে বসে কথা বলছি। কাপড়ও পরিবর্তন হয় নাই। হঠাৎ টেলিফোন প্রেসক্লাবে বোমা হামলায় বেলাল ভাই আহত। সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি ড্রাইভ করে বড় ভাইসহ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেলাম। আগুনে পোড়া বেলাল ভাই কথা বলছে। শত-শত কর্মীরা রক্ত দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়ানো। নিজের রক্তের গ্রুপ নিজেই বলেছে। সবাইকে ধৈর্য ধরার উপদেশ। অবাক হলাম। এরপর সি.এম.ইউতের এক সপ্তাহের স্মৃতি আজো আমাকে শিহরিত করে।

শহীদ ভাইদের সাথে খুব বেশি স্মৃতি নেই আমার। তবে শহীদি ময়দানে দায়িত্ব পালন করায় স্মৃতি আন্দোলিত করে। বি.এল. কলেজ, সিটি কলেজ, আলিয়া মাদ্রাসাসহ ক্যাম্পাসগুলি স্মৃতিতে নাড়া দেয়। বিশেষ করে সরকারি বি.এল. কলেজের মহসীন হল, জোহা হল আর তিতুমীর হল শহীদের রক্তাক্ত স্মৃতির স্মারক। চিরচেনা আমতলা, শহীদ মিনার, প্রশাসনিক ভবন, কলা ভবনের মিছিলের শব্দ আজো কানে আসে। মনে হয় বিশাল মাঠের মধ্য দিয়ে শাহাদাত বার্ষিকীর র‍্যালি করছি। "দিয়েছিতো রক্ত, আরো দেবো রক্ত, রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়"। শিবিরের জন্য হাজারো শিক্ষার্থী, শিক্ষকের হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা, বুকে জড়িয়ে ধরা আবেগ আপ্লুত হয়ে যাই। ক্যাম্পাস আর হল গুলিতে জীবন্ত হালিম, কাশেম, রহমতের চেয়ে শহীদ হালিম, কাশেম, রহমতেরা বেশি শক্তি ও সাহসের, শহীদের হাজারো সাথীদের রক্তে প্রবাহিত স্ফুলিঙ্গ। আবারো শ্লোগানে-শ্লোগানে মুখরিত হবে ক্যাম্পাস, শিক্ষক শিক্ষার্থীর ভালবাসায় সিক্ত হয়ে পবিত্র শিক্ষাঙ্গন। মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার তৌফিক দান করো"। আমিন॥

লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, খুলনা মহানগরী।

www.icsbook.info

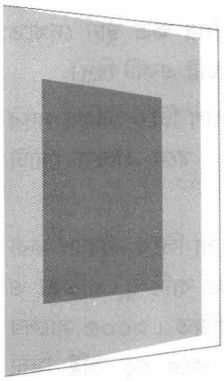

শহীদ আমানের মা

মু. মুকাররম বিল্লাহ আনসারী

হক এবং বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যখন যিনি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমিকা রেখেছেন তিনি তখন বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে কেউ বাধা উপেক্ষা করে সামনে খুলনা মহানগরীর এ শহীদি ময়দানে যারা জীবন দিয়ে শহীদি মিছিলে শরিক হয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম শহীদ আমান উল্লাহ আমান। ১৯৯৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের ছাত্রসংগঠন ছাত্রদলের সশস্ত্র হামলায় শাহাদাত বরণ করেন খুলনা আলিয়া মাদ্রাসার ৯ম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র এতিম আমান উল্লাহ আমান।

সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানার দরগাহপুর গ্রামের ছোট্ট একটি বাড়িতে বসবাস করেন শহীদ আমানের মা। নাম তার মনোয়ারা খাতুন। তার মোট ৪ মেয়ে ২ ছেলে। বড় মেয়ে এরপর শহীদ আমান, এরপর আরো ২ মেয়ে এবং সবার ছোট ছেলে আব্দুর রহমান। শহীদ আমানের পিতার নাম মরহুম শেখ শহীদুল্লাহ। তিনি কত সালে মারা গেছেন তা শহীদ আমানের মা জানেন না। তবে এ টুকু বলতে পারেন ছোট ছেলে আব্দুর রহমানের বয়স তখন ৭-৮ মাস। মা কতটা মমতাময়ী, দরদি এবং দায়িত্ববান তার বাস্তব উদাহরণ শহীদ আমানের মা।

প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়

অনেক দিন ধরেই শহীদ আমানের মা এর গল্প শুনতাম। অনেক দায়িত্বশীলের মুখে শহীদ আমানের পরিবারের কথা শুনে তাদের বাড়িতে যাওয়ার প্রচণ্ড আগ্রহ তৈরী হলো। সুযোগের অপেক্ষায় থাকলাম। অবশেষে সুযোগ পেলাম। ২০০৬ সালে আমি তখন ইসলামী ছাত্রশিবির খুলনা মহানগরীর বায়তুলমাল সম্পাদকের দায়িত্বে।

www.icsbook.info

তারিকুল ইসলাম পিকু ভাই তখনকার মহানগরী সভাপতি। এপ্রিল মাসে পিকু ভাই সাংগঠনিক সফরে সাতক্ষীরায় যাবেন। সারাদিন সেখানে প্রোগ্রাম করবেন। আমি পিকু ভাই এর সফর সঙ্গী হওয়ার আবেদন জানালাম। যথারীতি মঞ্জুর হলো এবং আমরা সকাল ১০টায় সাতক্ষীরা পৌঁছালাম। পিকু ভাই প্রোগ্রামে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমি অনুমতি নিয়ে সাতক্ষীরার একজন সদস্য ভাইকে সাথে নিয়ে মোটর সাইকেল করে বেলা ১১.৩০ মিনিটে শহীদ আমানের বাড়িতে পৌঁছালাম। আমরা যাবো এ সংবাদ পূর্বেই সাতক্ষীরা জেলা সভাপতি শহীদ আমানের মাকে ফোন করে জানিয়েছেন। আমরা পৌঁছে দেখি শহীদ আমানের মা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তার সাধ্যমত অনেক নাস্তা তিনি তৈরি করেছেন আমাদের জন্য। আমি একটু অবাক হলাম। কত বাড়ির পাশেই অবস্থিত শহীদ আমানের কবর যিয়ারত করলাম। একটি বিষয় খুব ভালো লাগলো। তা হলো আমি যখন শহীদ আমানের মা সকলকেই নাস্তা করান। মায়ের সাথে কিছু কথা বলে তাঁর বাড়ির পাশেই অবস্থিত শহীদ আমানের কবর জিয়ারত করলাম। মনের মধ্যে নতুন করে শক্তির সঞ্চার হলো। একটি বিষয় খুব ভালো লাগলো। তা হলো আমি যখন শহীদ আমানের মা কে খালাম্মা বলে ডাকলাম তিনি একটু রাগ করলেন, কষ্ট পেলেন এবং বললেন "আমাকে খালাম্মা বলবেনা, আমাকে মা বলে ডাকবে। তোমাদের শিবিরের সবাই আমার সন্তান, তোমাদের মাঝেই আমি আমার বা'জানকে খুঁজে পাই"। খুবই ভালো লাগলো এবং জানলাম সংগঠনের সকল দায়িত্বশীল ভাইরাই তাকে "মা" বলে ডাকেন। আমিও ডাকলাম এবং মা'র আবদারের কারণে দুপুরে একসাথে খাওয়া দাওয়াত করলাম। এরপর মাগো আমাদের কে তাঁর পরিবার বিশেষ করে শহীদ আমান সম্পর্কে অনেক আবেগময়ী গল্প শুনালেন। আমরা অনেক আবেগ আপ্লুত হলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম ইসলামী আন্দোলনের জন্য আমাদের কে আরো সক্রিয় ভাবে কাজ করতে হবে। এরপর মা'র কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমরা বিকাল ৫টার সময় বিদায় নিলাম।

শহীদ আমানের মা এর সাথে কিছু স্মৃতি

(এক)

সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে প্রায়ই মা'র সাথে ফোনে কথা হতো। সপ্তাহে অন্তত একবার কথা না বললে মা কষ্ট পেতেন। কখনও আমি ফোন করতাম, কখনও বা তিনি নিজেই ফোন করতেন। ২০০৯ সালের ৩০ জুন আমার উপর ইসলামী ছাত্রশিবির খুলনা মহানগরীর সভাপতির দায়িত্ব অর্পিত হয়। ঐদিন রাত ১০ টার সময় হঠাৎ মা ফোন করেন। আমাকে বলেন "তুমি এখন সভাপতি হইছো, আমি জানি তুমি এখন অনেক বড় নেতা। আমারে ভুলে যাবা নাতো? "আমি মা'র কথায় অবাক হলাম। জিজ্ঞেস করলাম আপনাকে এসব কথা কে বলেছে? মা বললেন "আমি সব জানি, তুমি ভয় পাবে না, শয়তানরা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমি রাত জেগে তোমার জন্য দোয়া করবো। আমি চাই আমার বাজান

www.icsbook.info

আমানের রক্ত যেন বৃথা না যায়।" দায়িত্বের ভারে আমি যখন প্রচণ্ড টেনশন করছিলাম তখন মা'র এই কথা গুলো আমাকে নতুন ভাবে আন্দোলিত করলো। আমি বললাম মা তুমি দোয়া করো তোমার বাজান যে আন্দোলনের জন্য জীবন দিয়ে গেছেন আমি যেন সেই কাফেলার এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারি। মা আমাকে অনুরোধ করলেন তাঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্য। ২০০৯ এর আগস্ট মাসে মহানগরী দায়িত্বশীলদের ৮ জনের একটি টিম নিয়ে আমি শহীদ আমানের বাড়ি গেলাম। দেখলাম এক বিরাট কাণ্ড। মা আমাদের জন্য অনেক রকমের পিঠা বানিয়ে অপেক্ষা করছেন। মা আমার দায়িত্বশীল ভাইদের কাছ থেকে জেনেছেন আমি হাঁসের গোশত খেতে পছন্দ করি। মা বড় এক বাটি ভুনা হাঁসের গোশত আমার সামনে দিয়ে বললেন সবাইকে দিয়েছি এটা সব তোমাকে খেতে হবে। আমি বললাম তুমি কেন এত কষ্ট করলে? মা বললেন আমি আমার বাজানের জন্য এসব রান্না করেছি। তোমাদের মাঝেই আমার বা'জানকে খুঁজে পাই।

(দুই)

২০০৯ সালের ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে শহীদ আমানের পরিবারের জন্য একটি খাশি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। আমি শহীদ আমানের ছোট ভাই আব্দুর রহমানকে খুলনায় আসতে বললাম। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি খাসি কিনে আব্দুর রহমানকে দিয়ে বললাম বাড়িতে কুরবানী করার জন্য। ঐ দিন রাতেই মা ফোন করলেন, বললেন খাশি যখন দিয়েছো তোমাকে এসেই কুরবানী করতে হবে। কোন ভাবেই আমি আমার সে সময়ের ব্যস্ততার কথা মা'কে বুঝাতে পারিনি। অবশেষে কথা দিলাম ঈদের পরের দিন যাবে। কথা অনুযায়ী ঈদের পরের দিন সকালে আমি শহীদ আমানের বাড়িতে পৌঁছালাম। আমার সাথে সাতক্ষীরা জেলা সভাপতি ও খুলনা দক্ষিণ জেলা সভাপতি ছিলেন। আমাদের আগমণ উপলক্ষে মা তাঁর সকল মেয়ে জামাই ও নাতি নাতনীদের উপস্থিত করলেন। মায়ের ইচ্ছা অনুযায়ী আমি নিজ হাতে খাসি জবেহ করলাম। রান্না করা হলো। মায়ের মনের আবদার মিটানোর জন্য তাঁর গ্রামের ১০-১২টি বাড়িতে আমরা গেলাম। মা সবার সাথে আমাদেরকে তাঁর বা'জান হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মায়ের আনন্দে আমরাও খুব আনন্দ পেলাম। দুপুরে মায়ের জামাই, নাতি-নাতনী সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে বসে মজা করে খাওয়া দাওয়া করলাম, ছবি তুললাম। ঐ ঈদের মতো এতো আনন্দ আমি আর কখনও পাইনি।

(তিন)

একটি বিষয়ে আমি এখনও অবাক হই, তা হলো সংগঠনে এবং সংগঠনের দায়িত্বশীলরা যখনই কোন বিপদের সম্মুখীন হতো, খবরটি কিভাবে যেন মা জেনে ফেলতেন এবং অস্থির হয়ে পড়তেন। এ রকম কোন ঘটনা শোনার সাথে সাথে আমাকে ফোন করতেন এবং প্রথমেই বকা দিতেন কেন আমি তাকে খবরটি জানালাম না। এ বিষয়ে সর্বশেষ আমার সাথে কথা হয়েছে গত ১৩/০৬/১২ তারিখে। ঐ দিন সন্ধ্যার পর আমাকে ফোন করেই বকা দিলেন। কেন আমি তাকে

www.icsbook.info

আল্লামা রফীক বিন সাঈদীর ইন্তেকালের খবর বললাম না। অনেক কান্নাকাটি করলেন এবং আল্লামা সাঈদী সাহেবসহ তাঁর পরিবারের জন্য দো'য়া করলেন। ২০১০ সালের ১৫ জানুয়ারি বি.এল. কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের সাথে আমাদের সংঘর্ষ হয়। ছাত্রলীগের অতর্কিত হামলায় তখনকার মহানগরী সেক্রেটারি আতাউর রহমান বাচ্চু ভাই সহ আমাদের কয়েকজন ভাই আহত হন। ঐ দিন রাত ১০ টায় মা আমাকে ফোন করে বকাবকি করলেন এবং খুব কাঁদলেন। সারারাত তিনি ঘুমাননি। নামাজ পড়লেন, আমাদের ভাইদের জন্য দো'য়া করলেন এবং ফোন করে রাতে আরো ২/৩ বার ভাইদের খোঁজ খবর নিলেন। রাতের বেলায় মায়ের সাথে কথা বলে আমি অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হলাম।

(চার)

২০১০ সালের মে মাসের শেষ দিকের কথা। আমি তখন মহানগরী থেকে বিদায় নিয়ে কয়েকদিন হলো কেন্দ্রে এসেছি। মা কেন্দ্রীয় সভাপতি, সেক্রেটারি জেনারেলসহ কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের সাথেও প্রায়ই ফোনে কথা বলতেন। সকল দায়িত্বশীলগণই তাঁর সাথে কথা বলে অনুপ্রাণিত হতো। একদিন মা আমাকে ফোন করে আবদার করলেন আমি সাঈদী হুজুরের সাথে কথা বলবো, আমার অনেক দিনের ইচ্ছা, তুমি আমারে একটু কথা বলার ব্যবস্থা করে দাও। ৩০ মে ২০১০ সাল, ঐদিন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যদের নিয়ে কেন্দ্রের টি.সি.। সাঈদী সাহেব হুজুর সেখানকার আলোচক। ঐ প্রোগ্রামই সাঈদী হুজুরের সাথে আমার শেষ প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামে সাঈদী হুজুরের আলোচনা শেষে আমি হুজুরের পাশে বসে মায়ের ইচ্ছার কথা বলতেই হুজুর বললেন ফোন করো। আমি ফোন করে হুজুরকে দিলাম। প্রায় ৩০ মি. হুজুর অত্যন্ত আবেগ ও দরদ দিয়ে মায়ের সাথে কথা বললেন। মা তো খুশিতে আত্মহারা। আমাকে বললেন আমি অনেক খুশি হয়েছি, তুমি আমার ইচ্ছা পূরণ করে দিয়েছো এসব বলে আমাকে দোয়া করতে লাগলেন।

(পাঁচ)

২৯ জুন ২০১০ সাল। সম্পূর্ণ মিথ্যা মামলায় আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, নায়েবে আমীর আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এবং সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে অন্যায়ভাবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকার গ্রেফতার করে।

কেন্দ্রীয় সভাপতিসহ সকল দায়িত্বশীলগণ চরমভাবে মানসিক টেনশনে আছেন। আমি ঐ রাতে কেন্দ্রীয় সভাপতির বাসায় ছিলাম। রাত ১টার দিকে মা ফোন করলেন। হাউমাউ করে কান্না-কাটি করছেন। কেন্দ্রীয় সভাপতি টের পেয়ে বললেন কে? আমি বললাম শহীদ আমানের মা। কেন্দ্রীয় সভাপতি অনেক সময় ধরে মায়ের সাথে কথা বললেন। মা একটু শান্ত হলেন। এরপর আমি আবার কথা বললাম। মা বললেন ওরা আমার বা'জানরে মেরে ফেলেছে তাতে আমি কষ্ট পায়নি। কিন্তু ওরা এতো ভাল মানুষগুলোকে গ্রেফতার করেছে। ওরা শয়তান, ওরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

www.icsbook.info

এসব বলতে লাগলেন আর কাঁদতে লাগলেন। এখনও যখন মায়ের সাথে কথা হয় তিনি ঐ একটা কথাই বলেন-আমি রাতে ঘুমাতে পারিনা, সারারাত নামাজ পড়ি এবং ওদের (আওয়ামী লীগ) জন্য বদ দোয়া করি। ওরা আমার এই নেতাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ইসলামী আন্দোলন ঈমানের অপরিহার্য দাবি। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা একজন মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে বাতিলের পক্ষ থেকে বাধা আসাটা স্বাভাবিক। দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে এ বাঁধা মোকাবেলা করতে গিয়ে যুগে যুগে অসংখ্য আল্লাহুর প্রিয় বান্দারা তাঁর জীবন কুরবানী করে নিজেরা পেয়েছেন শাহাদাতের মর্যাদা আর তাদের রক্তের বিনিময়ে ইসলামী আন্দোলন হয়েছে গতিশীল। খুলনার ইসলামী আন্দোলনের জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম শহীদ আমান উল্লাহ আমান। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শহীদ আমান উল্লাহ আমানকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন এবং তাঁর প্রিয় মাকে কিয়ামতের ময়দানে জান্নাতের সর্বোত্তম মর্যাদা দান করুন।

বাংলার এই যমীনে আজ ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এক কঠিন ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি। বাতিল শক্তি আজ বাংলার এই যমীন থেকে ইসলামী আন্দোলনের কাজকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে চায়। কিন্তু ওরা জানে না এটা তাদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা। কুরআনের ভাষায়-

"ওরা চায় মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে, কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্ত তিনি তার নূরকে প্রজ্বলিত রাখবেনই। অস্বীকারকারীদের কাছে তা যতই অপছন্দের হোক।" (আল কুরআনঃ সূরা সফ্, আয়াত-৮)

সুতরাং আজকের এই সময়ে আমরা যারা শহীদ আমান উল্লাহ আমানের উত্তরসূরি ইসলামী আন্দোলনের কর্মী আমাদেরকে হতে হবে ঈমানের বলে বলীয়ান, ত্যাগী, কর্মঠ এবং সাহসী। তাহলেই শহীদ আমানের রেখে যাওয়া এই আদর্শ, এই কালেমার পতাকা অচিরেই বাংলার এই যমীনে পত-পত করে উড়বেই উড়বে ইনশাআল্লাহ।

উপমহাদেশের প্রথম শহীদ শহীদ আব্দুল মালেকের শহীদ হওয়ার সংবাদে মাওলানা মওদূদী (রঃ) বলেছিলেন, "শহীদ আব্দুল মালেক উপমহাদেশের ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের প্রথম শহীদ হলেও শেষ শহীদ নন"। তার মানেই হলো ইসলামী বিপ্লব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আরো অনেক ভাইকে জীবন দিতে হবে। শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে ইসলামী বিপ্লব ত্বরান্বিত হবে। প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহর রাজত্ব, ধ্বংস হয়ে যাবে সব কুসংস্কার ও বাতিল মতবাদ। হে প্রভু! এই কাফেলায় শরিক রেখো জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে শহীদি মিছিলের সদস্য হিসেবে মনোনীত হবার আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।

লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, খুলনা মহানগরী।

www.icsbook.info

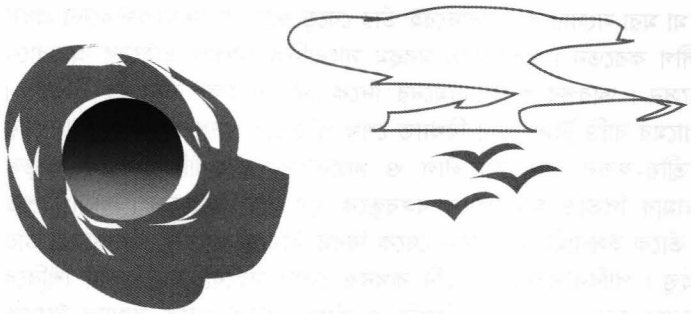

শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান
কিছু কথা

অধ্যাপক আজিজুল ইসলাম টিপু

যুগে যুগে পৃথিবীতে কিছু মানুষের আবির্ভাব ঘটে যারা হৃদয়ের গভীরে সত্যকে ধারণ করে স্বীয় সমাজটিকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে আল কুরআনের সুশীতল ছায়ায় সবাইকে দীক্ষিত করতে চান এবং প্রয়োজনে এই নান্দনিক কাজের জন্য নিজের জীবনের মায়া তুচ্ছ করে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে সামান্যতম কুণ্ঠা বোধ করেন না। শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান ছিলেন তাদেরই অগ্রজ। তিনি ছাত্রজীবনে এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখতেন যেখানে থাকবেনা সম্পদের অসম বন্টন থাকবে না কোন শোষণ থাকবে না ধনী-গরিবের মাঝে ব্যবধান, থাকবে না কোন আর্তের আহাজারি, যেখানে থাকবে শুধুই আল কুরআনের শাসন। এমন একটি সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্নীল প্রত্যাশা নিয়েই তিনি স্কুল জীবনেই শাহাদাতের তামান্নায় উজ্জীবিত ছাত্রসংগঠন শহীদি কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরে যোগদান করেন। তাঁর প্রধান দায়িত্বশীল ছিলেন শহীদ নির্ভীক সাংবাদিক শেখ বেলালউদ্দিন। তাঁর অন্যান্য দায়িত্বশীল ছিলেন অধ্যাপক সাইফুদ্দিন ভাই। আল আমিন ভাই। শেখ কামরুল আলম ভাই। ইলিয়াস ভাই, গোলাম কুদ্দুস ভাইসহ অনেকে। সবার কাছেই বিমান ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ব্যক্তিত্ব। আমি তাঁর ছোট ভাই হিসেবে খুব কাছে থেকে তাঁকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। তিনি ছিলেন নূরনগর ওয়াপদা স্কুলের একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। তিনি ছিলেন মৃদুভাষী এবং মিশুক প্রকৃতির। তাঁর সবচেয়ে বড়গুণ হিসেবে যেটি আমার কাছে ধরা পড়েছে সেটি হল তাঁর তাকওয়া। এদিক থেকে অনেকের জন্যই তিনি আদর্শ। তিনি ছিলেন

www.icsbook.info

প্রতিবাদী। মা মরা সংসার বড় অনাদরেই তাঁর বেড়ে ওঠা। তিনি ছাত্রজীবনের প্রথম দিকে ছাত্রলীগ করতেন। পরবর্তীতে মরহুম সাংবাদিক বেলাল ভাইয়ের আহবানে শিবিরে আসেন। তারপর শুধুই সামনের দিকে এগিয়ে চলা বিমানের গতিতে। আমাদের গ্রামের বাড়ি টুঙ্গিপাড়ার বিখ্যাত শেখ পরিবারে। সঙ্গত কারণে আমাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। আমার পিতাও মনে প্রাণে বঙ্গবন্ধুকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তথাপি শত প্রলোভনও তাঁকে ইসলামী আন্দোলন থেকে বিরত রাখতে পারেনি। এখানেই তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব। পারিবারিকভাবে তিনি কখনও কোন সহযোগিতা পাননি শিবিরে রাজনীতি করার জন্য। শত বাধা বিপত্তি ও তাঁকে আদর্শ থেকে সামান্য টলাতে পারেনি। এলাকার সকলের কাছেই বিমান ছিল অনুপম চরিত্রের অধিকারী এক নিষ্ঠাবান সেবক। তাই তাঁর শাহাদাতের পরেরদিন অর্থাৎ ২৬ মার্চ, ১৯৯২ সারা খুলনায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সেই হরতালে পিকিটিংয়ে অংশ নিয়েছিল সকল দল ও মতের লোকেরা যা বর্তমানে বিরল ঘটনা। আমার মনে আছে ঐদিন বিমানকে হারিয়ে খুলনা মহানগরী শোকের নগরীতে পরিণত হয়েছিল যার কারণে গাছের একটি পাতাও ঐদিন নড়েনি। বিমানের মৃত্যুর পর বরিশালের কায়েছ সাহেব হুজুর (মরহুম) স্বপ্নে দেখেছিলেন বিমানকে এভাবে যে বেহেশতের বাগানে সে ঘোরাফেরা করছে অত্যন্ত খোশমেজাজে। এ কথাটি তিনি ওয়াপদা মসজিদের তৎকালীন ইমাম সাহেব লতিফ হুজুরকে বলেছিলেন। তিনি ইমাম সাহেবকে আরো বলেছিলেন বিমান খুব পরহেজগার ছিলেন। বিমান ৩টি টিউশনি করত। সেই টাকা পরিবারে না দিয়ে শিবিরের দুজন কর্মীকে (নজরুল ও বারেক ভাই) দিয়ে দিত। এলাকার যে কোন মানুষ বিপদে পড়লে সে সবার আগে এগিয়ে যেত। তাঁর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় ঠিকানা ছিল মসজিদ। সে নিয়মিত তাহাজ্জুত নামাজ আদায় করত। আমল আখলাকে বিমান ছিল অদ্বিতীয়। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই সে বি.এল. কলেজে শিবিরের ক্যাম্পাস শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিল। মূলত তাঁর এই জনপ্রিয়তার জন্যই ইসলাম বিরোধী শক্তির নিকট তাঁর জীবন দিতে হয়েছিল। বিমানকে হত্যা করে হত্যাকারী বা শিবিরের অগ্রযাত্রাকে রুখতে চেয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে যেটি সম্ভব হয়নি। যার ফলে বিমানের পরিবারসহ অনেকেই আজ ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রায় বিশ্বাসী। আমাদের সকলের আগামী জীবনের জন্য পাথেয় হিসেবে রয়ে গেছে শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমানের আদর্শ। এই আদর্শকে লালন করেই বাংলার তৌহিদি ছাত্রজনতা একদিন বাংলার সবুজ শ্যামল প্রান্তরে ইসলামের বিজয় কেতন উড়াবেই উড়াবে ইনশাআল্লাহ। মহান রাব্বুল আলামিন তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করুক। আমিন॥

লেখক ঃ সহোদর, শহীদ শেখ আমিনুল ইসলাম বিমান

www.icsbook.info

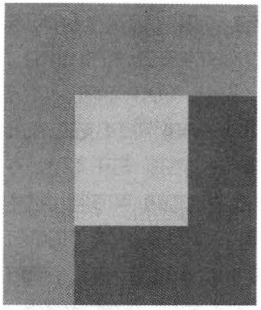

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম
যাকে হারিয়ে আজও কাঁদে বি.এল.কলেজ ক্যাম্পাস

মুন্সী আব্দুল হাফিজ কচি

"Brother জোহরের নামাজ পড়ব, কলেজের মসজিদটা কোন দিকে? ৬ সেপ্টেম্বর '৯৫ বি.এল. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাসের পিচঢালা কালো পথে অপরিচিত এক ভাইয়ের প্রশ্নের মুখোমুখি হলাম। আমি তাকে মসজিদ দেখানোর সাথে বললাম আমিও জোহরের নামাজ পড়ব চলেন একসাথে যাই। কলেজ বাণিজ্য ভবনের পাশ দিয়ে আমরা এখন হাঁটছি। এর মধ্যে দু'জনের পরিচয়টা সেরে নিলাম। আমাকে পরিচয় দিলেন আজিজুর রহমান। নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলায় বাড়ি। ভর্তি সংক্রান্ত কাজে বি.এল. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এসেছে। মনে মনে আমি ভাবলাম বিএল কলেজে ভর্তি হতে এসেছে, ক্যাম্পাস ঘুরছে অথচ কলেজ মসজিদ চেনে না। যে মসজিদকে ঘিরে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে, যে মসজিদকে ঘিরে একটি শহীদি ঈদগাহ গড়ে উঠেছে, যে মসজিদের প্রতি ছাত্র-যুব তথা ইসলামপ্রিয় মানুষের একটা দুর্বার আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে- সেই মসজিদ আজিজ ভাই চিনতে পারলো না। এরকম চিন্তা করতে করতেই জানতে চাইলাম- বি.এল. কলেজে আগে কখনও এসেছেন কি? আজিজ ভাই "না" জবাব দিলেন। তবে তিনি জানালেন বি.এল. কলেজের আসার ও ক্যাম্পাস ঘোরার সখ তার দীর্ঘ দিনের। পরের প্রশ্নে আমি বললাম বি.এল. কলেজ ক্যাম্পাসে আসার সখ কি জন্য একটু জানাবেন? কি সবুজ নয়নাভিরাম ক্যাম্পাস দর্শন না ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যাপীঠে পাঠ লাভের আশায়? আমার এ প্রশ্নে উনি বেশ বিব্রত অবস্থায় পড়লেন। জানালেন, না এমনি, তবে বি.এল. কলেজের ময়দানের প্রতি আমার আলাদা একটু টান রয়েছে। এমন সময়ে আমরা মসজিদে উপস্থিত হলাম। উনি অযু করতে গেলেন। আমার অজু ছিল। দেখি আজিজ ভাই পুকুরে অজু করতে নামলেন। আমি বললাম মসজিদের টিপকলে অযু করুন। উনি 'না-

www.icsbook.info

না' বলে পুকুরের সিঁড়িতে বসলেন। আমি মসজিদের বারান্দায় এসে উঠলাম। (এখানে বলা বাহুল্য বি.এল. কলেজের মসজিদ ও পুকুরের অবস্থান একেবারে পাশাপাশি)। ক্যাম্পাস থেকে মসজিদ বাউন্ডারিতে ঢোকার পর থেকে উনার মধ্যে কেন একটা ভারাক্রান্ত ভাব বিরাজ করছিল। অযু করতে নেমে পুকুরে কিছু সময় নীরব হয়ে বসে রইলেন যেন হটাৎ বিপদ এসেছে কোথাও থেকে। আমি তখন চিন্তায় উনি হঠাৎ কি ভাবছে? অজু করতে দেরি করছে কেন? মসজিদের বারান্দার পিলারের আড়াল থেকে দেখছি উনি (আজিজ ভাই) কি করছে। এবার দেখলাম তার চোখের পানি অঝোরে গড়িয়ে পড়ে পুকুরের পানিতে মিশে যাচ্ছে। বুঝতে পারলাম আজিজ ভাই (নতুন পরিচয়) কোন সমস্যায় পড়েছে। না জানি কি বড় বিপদ তার ঘাড়ে চেপে বসেছে। ৭/৮ মিনিট পর তিনি হাত পানিতে রাখলেন। অযু শুরু করলেন। অজু শেষে দেখলাম তিনি মসজিদ এবং সমগ্র পুকুরটা একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখলেন। মসজিদে ঢুকলেন। অতঃপর দু'জন পাশাপাশি অবস্থান নিয়ে নামাজ আদায় করলাম। নামাজ শেষে বাইরে এসে উনি আমাকে বিদায় জানালেন। বললেন- 'ঠিক আছে ভাইজান, আবার দেখা হবে।' আমি তার বিদায়কে বিদায় না বলে একটু তড়িঘড়ি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা আপনার কি কোন সমস্যা হয়েছে নাকি? এবার হাসতে হাসতে আজিজ ভাই না, না জবাব দিলেন। আমি উনার কথায় স্বস্তি পেলেও মনের দিক থেকে পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে পারিনি। কেননা আজিজ ভায়ের সঙ্গে কিছু সময়ের এই কথাবার্তার মধ্যে একটি শব্দ আমার যেন "টক অব দ্য মাইন্ড'- এ পরিণত হয়েছিল একজন আমার জিজ্ঞাসা তখনও রয়েছে। আস্তে আস্তে জানতে চাইলোম" আজিজ ভাই আপনি নামাজের পূর্বে বলেছিলেন বি.এল. কলেজের ময়দানের প্রতি আলাদা একটা টান রয়েছে" সে টান কিসের? একটু জানাবেন? দীর্ঘ একটি শ্বাস ছেড়ে আজিজ ভাই আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন এভাবে বি.এল. কলেজের ইতিহাসে, বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায় রয়েছে। ১৯৯৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর এ কলেজের সুযোগ্য নির্বাচিত জি.এস. খুলনার ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের প্রিয় নেতা আর ছাত্রসমাজ নড়াইলের নয়ন মনি তিনি হলেন শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম। যার স্থান ছিল এ কলেজের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর হৃদয়ের মনি কোঠায়। আমার সেই মহান শহীদকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি ঠিকই কিন্তু তাঁর স্মৃতি বিজড়িত সেই রক্তমাখা কলেজ মসজিদ এবং শহীদ হালিমের রক্তে লাল পুকুরকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। রক্তে রঞ্জিত মসজিদ ও পুকুর কিয়ামতের কঠিন দিবসে সাক্ষ্য দিবে। আমি সেই বিদ্যাপীঠে ভর্তি হতে চাই। শহীদ আব্দুল হালিমের আদর্শকে আঁকড়ে ধরে নিজের ক্যারিয়ার গড়তে চাই। আমি তখন উনার দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রয়েছি। সর্বশেষ উনি বললেন, আমার ইচ্ছা শহীদ আব্দুল হালিমের কবর আমি জিয়ারত করতে চাই। আমি তখন আর চেপে না রাখতে পেরে বলে ফেললাম "আজিজ ভাই চলেন আমি আপনাকে শহীদ আব্দুল হালিম ভাইয়ের কবর জিয়ারত করিয়ে আনবো। আমি আব্দুল হাফিজ সেই আব্দুল হালিম ভাইয়েরই ছোট ভাই। শুনে তাৎক্ষণিক আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। দু'জনাই আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সে ছিল এক মিল খুঁজে পাওয়া যেন দু'টি পথের একটি গ্রাম। আর তখন মনে এল শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম

www.icsbook.info

ভাইয়ের সব সময়ের গাওয়া প্রিয় ইসলামী গানের এই কলিটি" পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়, মরণ একদিন মুছে দিবে সকল রঙিন পরিচয়।"

সন্তান হারা মায়ের আহাজারি আজও থামেনি

কলিজার টুকরো প্রিয় সন্তান মুন্সী আব্দুল হালিম। সেই ১৯৯৩ সালে আদরের হালিমকে হারিয়ে আজও আর্তনাদ আজও আহাজারি যেন থামেনি আমার মায়ের। আজও সেই পুরোনো প্রশ্ন-কি অপরাধ ছিল আমার হালিমের? প্রতিটি নামাজের ওয়াক্তে প্রিয় হালিমের জন্য জান্নাতের উচ্চ আসনে মর্যাদা চেয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে। আর কেঁদে কেঁদে বলে, "তোমার সাথে ইহকালে দেখা না হলেও যেন কাল কিয়ামতে সাক্ষাৎ হয়।" অত্যন্ত অসুস্থ, নিজের কিডনি এক মেয়েকে দানকারী (যদিও পরে বোন লতিফা ইন্তেকাল করেছেন-ইন্না....রাজেউন) আমার মা এখনও প্রায়ই বলে," শুধুমাত্র ইসলামের কাজের জন্যই আমার হালিম বাড়িতে আসার সময় পেত না। আমি সব সময় তার আসার অপেক্ষায় থাকতাম। আমি যা কিছু তার কাছে চাইতাম তা যেভাবেই হোক দেওয়ার চেষ্টা করত।"

এই তো সেদিনও আমার মা কেঁদে কেঁদে দো'আ করছিল" হে আল্লাহ তুমিতো জানো সন্তান হারানো ব্যথা কত কষ্টের। হালিমকে হারিয়ে আমার বুকটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। কোথাও খুঁজে পাইনি আমার কলিজার টুকরোকে। মা বলে কোন দিন ডাকবে না। বলবে না-মা ভাত দাও। বেহেশেতের সুন্দর পরিবেশে তার সাথে আমার দেখা করার ব্যবস্থা করে দিও।"

আমি সহ অন্য ভাইয়েরা মাকে কোন চিন্তা না করার জন্য বলি। শুধু বলি, দোআ করো। কিন্তু ঈদসহ বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে মায়ের কষ্ট যেন বেড়ে যায়। বিশেষ করে দু'ঈদে। প্রায়ই ঈদগুলোতে মা আক্ষেপ করে বলে, ঈদের নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় আমার বড় ছেলে আব্দুল হাই একে একে আব্দুল হামিদ, আব্দুল হাকিম, আব্দুল হাসিব, আব্দুল হাফিজ কচি (এ প্রতিবেদক) যখন বলে যায় যে-মা ঈদের নামাজ পড়তে যাচ্ছি দো'আ করো। তখন আমার আব্দুল হালিমকে পাই না। তখন আমার খুব কষ্ট লাগে। মনে হয় হৃদপিণ্ডে একটা বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। যা ভরাট হবার নয়। কিন্তু নামাজের ২/১ ঘন্টা পর যখন দেখি আমার হালিমের আন্দোলন-এর সহকর্মী গোলাম সরওয়ার, গোলাম কুদ্দুস, ভিপি জাকির, ওয়াদুদ, মাহফুজা, বাচ্চু, মামুন সহ অসংখ্য সাথীরা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে, ইসলামী আন্দোলনের জন্য দোয়া করতে বলে তখন আমার ধৈর্য আরও দৃঢ় হয়। সাহস ফিরে পাই।

জান্নাতের পথে আলো পথিক

"জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনি জানি
শহীদি রক্তে হেসে উঠে যবে জিন্দেগানি।"

নশ্বর এ পৃথিবীতে হক-বাতিল, সত্য-মিথ্যা, সুন্দর- অসুন্দরের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। এ দ্বন্দ্ব পৃথিবীতে ছিল, আছে এবং থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। সভ্যতা যখন শিহরিত, মানবতা যখন বিপন্ন, বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে ইসলাম যখন তামাম পৃথিবীতে বিজয়ের আসন

www.icsbook.info

গেড়ে নিচ্ছে, ঠিক তখনই এ দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে পৃথিবী ছেড়ে জান্নাতে যেতে হলো পিতা-মাতার আদরের দুলাল, ভাই-বোনদের প্রিয় ভাই, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের একান্ত আপনজন মেধাবী ছাত্রনেতা নিষ্পাপ উজ্জ্বল একটি নক্ষত্র জি.এস মুন্সী আব্দুল হালিম ভাইকে। যিনি আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভালবাসেননি। ভয় করেননি কাউকে। ইসলাম ও জান্নাত ছাড়া কিছুই পছন্দ করেননি। শাহাদাতই ছিল কাম্য যার।

২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩। আমার গোটা জীবনের সবচেয়ে বড় বেদনাদায়ক স্মৃতি হালিম ভাইকে হারানোর বেদনা। কারণ অতি অল্প সময়ে ইসলামী আন্দোলনে যেভাবে এগিয়ে ছিলেন আমরা যেভাবে দেখেছিলাম, যেভাবে পেয়েছিলাম তা সত্যিই ভুলবার নয়। তাই আজও আমি যেন গানের সুরে, গল্পের মাঝে হালিম ভাইকে খুঁজে পাই। মনে হয় তিনি যেন আমাদের আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে আছেন। যখনই তাকে মনে হয় তখন তার লেখাগুলো বের করে পড়ি। আর গুন গুন করে তারই কণ্ঠের সেই গানটি গেয়ে উঠি-

"আজও সেই কোরআন আছে
হাদীস আছে
সেই ঈমান আর মানুষ কে।"

হালিম ভাই অনাগত ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় একটি নাম। যার মাঝে লুকায়িত ছিল নানা ধরনের প্রতিভা, মেধা ও যোগ্যতা। অনেকের পরে এসে আগে গিয়ে রেখে গেছেন বিরল কৃতিত্ব। যা প্রত্যেকের চলার পথের প্রেরণা। এখানে উল্লেখ্য যে, হালিম ভাই জি.এস. থাকাকালীন সময়ে বি.এল. কলেজের সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যা সর্বজন স্বীকৃত।

হালিম ভাই চলে গেলেন জাতির এক দুঃসময়ে। তাঁর নেতৃত্বের বড় বেশি প্রয়োজন ছিল তার শাহাদাতের সৃষ্ট শূন্যতা কখনও ভরাট হবার নয়। দুনিয়াবী বিবেচনায় হয়ত একটি সম্ভাবনাময় গোলাপ অকালে ঝরে গেল। কিছু মহান আল্লাহর দরবারে হালিম ভাই শাহাদাতের মৃত্যুর সৌভাগ্য অর্জন করে ধন্য হয়েছে। যে দিন মুন্সী আব্দুল হালিম হত্যাকাণ্ডের খবর পত্রিকার পাতায় শিরোনাম হল, সেদিনই হয়তো কেউ সড়ক দুর্ঘটনা বা তড়িতাহত হয়ে কেউ না কেউ নিহত হয়েছে। কাজেই মৃত্যু অনিবার্য। এ থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সুন্দর করতে প্রয়োজন দুনিয়ায় আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। কুরআন আর সুন্নাহর আইন বাস্তবায়নের সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা। হালিম ভাই এ দায়িত্ব টুকু সঠিকভাবে পালন করে চলে গেছে তাঁর প্রভুর দরবারে। আমরা সকলে যেন আমাদের পথের দিশারি শহীদ আব্দুল হালিমের রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজকে সর্বশক্তি দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, মহান মা'বুদের কাছে সেই প্রার্থনাই করছি।

লেখক ঃ সহোদর,শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম

www.icsbook.info

২৫ মার্চের সেই ভয়াল রাত্রি

মিসেস নাসিমা খাতুন

আমি বিমানের বড় বোন। অনেক কিছু মনে হয়। জানি না সব কিছু লিখতে পারবো কিনা। শরীরের শক্তি এবং মনের বল সব কিছুই কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। তারাবী নামাজ পড়ে খাওয়া দাওয়া সেরে বিমানের রুমে শুয়ে ছোট মেয়েটাকে নিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিলাম এরই মধ্যে টিপু এসে সংবাদ দিল আপা দাদা হাসপাতালে। সংবাদ শুনে বললাম, ও বেঁচে আছে? টিপু উত্তর দিল, হ্যাঁ। তেমন কিছুই হয় নাই। টিপুর সঙ্গে যেয়ে দেখি বিমান অচেতন অবস্থায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে। ধরতে গেলাম, কিন্তু ধরতে আমাকে দেওয়া হলো না। ওর শরীরের প্রতিটা আঘাত মনে হচ্ছিল আমার শরীরের ভেতরে। শুধুমাত্র বেঁচে থাকবে সেই আশায় নিজেকে সংযত করে রাখলাম। রাত্র দশটার সময় বাসায় যেয়ে নামাজ পড়ে যখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছিলাম তখন মোনাজাতে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল অন্য একটা কথা। তখন মোনাজাত ছেড়ে হাসপাতালে যাই। যেয়ে দেখি বিমানের রক্ত লাগবে। দৌড়ে গেলাম রক্ত পরীক্ষা করাতে কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস, রক্ত মিললো না। চলে এলাম নিচে। এসে দেখি ব্যান্ডেজ রক্ত মানছে না। তখনও মনে করি নাই যে এত সহজেই ও ইহ জগৎ ত্যাগ করবে। হাসপাতালের ডাক্তাররা যে এত ভাল ব্যবহার করতে পারে তা জানতাম না। অনেক বিরক্ত করেছিলাম ডাক্তারদের কিন্তু উনারা কোন রকম খারাপ ব্যবহার করলেন না। রাত্র ১২টা ৫ মিনিটে বিমান আমাদের সকলকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে আপন প্রভুর ডাকে সাড়া দিল। অনেক পাগলামি করেছি। কিন্তু এখন আর না। কারণ যখন বুঝতে পারি তার মৃত্যু এভাবেই আছে পৃথিবীর সব শক্তি একত্রিত হলেও বিমানকে সেদিন মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই দিতে পারতো না। মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী তখন আর মৃত্যুকে ভয় করা উচিৎ নয়। তবে বিমানের মৃত্যু সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। এরকম মৃত্যু শুধু কামনা করলেই হয় না। আমাদের সকলের দোয়া করা উচিত আল্লাহ তা'য়ালা যেন বিমানের শাহাদাত কবুল করেন। আমরা যেন বিমানের রক্তের বদলা ইসলাম কায়েমের মধ্যে দিয়ে নিতে পারি। আপনাদের সকলের প্রতি অনুরোধ বিমানের জন্যে একটু দোয়া করবেন। আমি আর লিখতে পারছি না, সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে শেষ করছি।

লেখিকা ঃ শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান এর বোন

www.icsbook.info

শহীদ পরিবারের কিছু বাঙময় স্মৃতি

আইনুন নাহার আনজু

"আল্লাহর পথে যারা দিয়েছে জীবন
তাদেরকে তোমরা মৃত্যু বলো না।"

গত বছর শহীদ হালিমের বাড়িতে বসে জামিলা, ফাইজা, বোরাকের কণ্ঠের হৃদয়ছেঁড়া আকুতি সমস্ত পরিবেশকে মথিত করে। হৃদয়ের রক্ত ক্ষরণের উপর নতুন এক আবেগের প্রলেপ স্বর্গীয় সুষমায় কম্পিত করে তুলছিল। অজস্র চোখের নীরব অশ্রু শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে ফরিয়াদ করছিল। রাব্বুল আলামীন এ কেমন শাহাদাৎ! তোমার প্রিয় বান্দাদের মিছিলে তাকে শামিল করে নিয়ো। হালিম নামের পূর্বে শহীদি রাজটিকা পরিয়ে দিয়েছ। লাখো কোটি শুকরিয়া। শহীদি প্রাঙ্গণে ডানা মেলে থাকা মুক্ত সবুজ বিহঙ্গ আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাক। ২৩শে অক্টোবর '৯৪। বসুপাড়া পাঠান বাড়ি শহীদি প্রদীপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আরশের পানে ছুটে চলা শহীদি মিছিলে সংযোজিত হলো আরেকটির নাম শহীদ আবুল কাশেম পাঠান। নূরজাহান, জামিলা, ফাইজা, বোরাকের কণ্ঠে আজ স্তব্ধ। শহীদ জননী নির্বাক। হৃদয়ের অলিন্দে উঠলে উঠা রক্তের ঢেউ চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুর নদীতে বয়ে যাচ্ছে। কে মুছে দেবে ঐ সন্তানহারা, ভাইহারা একান্ত স্বজনদের অশ্রুধারা। কাশেম পাঠানের টগবগে রক্ত স্রোত এমন হিম শীতল কেন? সদা হাস্যময় মিষ্টভাষী অগণিত স্বজেনর, বান্ধবের, মুরুব্বির, শিক্ষকের হৃদয়ের মনি কোঠায় তুলে রাখা গোলাপটি এমন অসময়ে ঝরে গেল। কেন? কেন?? কেন???

www.icsbook.info

জবাব কি আমরা পেয়েছি? পিতৃহারা শহীদ কাশেম পাঠান ছিলেন পরিবারের সকলের আশা এবং ভরসার স্থল। পাঁচ ভাই, তিন বোনের মধ্যে চতুর্থ হলেও পরিবারে যাবতীয় ব্যাপার তিনিই দেখাশুনা করতেন। অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্বও তাকে বহন করতে হতো। একদিকে নিজের পড়াশুনা, সাংগঠনিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা, অন্যদিকে পরিবারের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করা দেখে অনেকে আশ্চর্য হয়ে যেত। বড়বোন নূরজাহান বললেন, এতটুকু ছেলে এতবেশি ঝুট ঝামেলার মাঝে কিভাবে যে মাথা ঠিক রাখে, আমি বুঝতে পারতাম না। সব ব্যাপারে সঠিক ফয়সালা করত এবং কোন ব্যাপারে ভেঙ্গে পড়ত না। হাসিমুখে বলত, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।' মাঝে মাঝে আমার ভয় লাগত এমন ছেলে আমাদের মাঝে থাকবে তো? সত্যিই সে থাকল না। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীন তাকে যে নিজের কাছে সম্মানিতভাবে ডেকে নেবেন, সেটা হয়ত কেউ ভাবেনি। কিন্তু শহীদ কাশেম পাঠান সকল কাজের মাঝে তৎপর থেকেও কোন ফাঁকে কখন যে শহীদি কাফেলায় নাম লেখাবার দরখাস্ত প্রিয়তমের দফতরে পাঠিয়ে নিয়োগ লাভ করেছিল সেটা কেউ জানতে পারেনি।

"আমার ইচ্ছা হয় আমি শহীদ হই আবার জীবিত হই এবং পুনরায় শাহাদাতের অমিয় পেয়ালা পান করি"-আল হাদীস। শহীদি রক্তের নজরানা পেশ করার তীব্র আকুতি একি খুবই সহজ? নিশ্চয়ই নয়। তাহলে এই আলো ঝলমল রূপ-রস-গন্ধ ভালবাসা-স্নেহ-প্রেমময় দুনিয়া ছেড়ে কিসের আকর্ষণে ছুটে যেতে চায় ঐ অনন্তলোকে। যে দিন কাশেম পাঠানের ডায়েরির পাতা থেকে শাহাদাতের আবেদন সম্বলিত দরখাস্তের অনুলিপি পাওয়া গেল সেদিন নূরজাহান আপা বললেন, আমি আর কাঁদব না। যে নিজেই তার প্রভুর সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল থাকে প্রভু নিজের সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিদের কাতারে শামিল করেছেন। আমরা কেন বোকার মতো কেঁদে মহামিলনের শুভ লগ্নটিকে ম্লান করে দিব।"

যেন আল কুরআনের সেই আয়াতের প্রতিধ্বনি "হে প্রশান্ত আত্মা! ফিরে চলো তোমার প্রভুর পানে এমন অবস্থায় যে তুমি সন্তুষ্ট তাঁর প্রতি। তিনিও সন্তুষ্ট তোমার প্রতি।"

বি.এল. কলেজের ম্যাডামরা চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে উচ্চারণ করলেন, "কাশেম পাঠানের শূন্যস্থান কেউ কোনদিন পূর্ণ করতে পারবে না।"

"হে আল্লাহ! তুমি তাকে যোগ্য মর্যাদায় বিভূষিত কর।"

লেখিকা ঃ প্রভাষক অর্থনীতি বিভাগ শহীদ স্মৃতি মহিলা কলেজ

www.icsbook.info

বয়সে ছোট হলেও পাঠান ছিল আমাদের সকলের অভিভাবক

নূর জাহান পাঠান

কি লিখব! কলম চলে না! ভাষা হারিয়ে ফেলেছি! একটা কথা আছে 'অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর' তাই হয়ে গিয়েছি। ভাই হারানো বেদনা খুব মর্মান্তিক, তবে ভাইয়ের মত ভাই হতে হয়। কাশেম ছিল কলিজার টুকরা নয়নের মণি। একদিন চোখের আড়াল হয়ে থাকলে অস্থির হয়ে যেতাম, মনে পড়ে শাহাদাৎ-এর কয়দিন আগে দু'দিন বাসায় আসেনি, কলেজে ছিল। এত ব্যস্ত থাকত একটা টেলিফোনও করেনি। আমি তো অস্থির হয়ে এখানে-সেখানে টেলিফোন করি। ওয়াদুদ ভাই ওকে বলে দেয় বাসায় টেলিফোন করার জন্য। কাশেম যখন টেলিফোন করে, তখন আমি ওকে বলি 'তুই একটা টেলিফোনও করতে পারিস না! আমাদের চিন্তা হয় না। কাশেম হা-হা-করে হেসে বলে-কি হয়েছে, আমি এইত আছি। তখন আমি কেঁদে দিয়ে বলেছিলাম, 'তুই কি বুঝবি!' আজ সেই কলিজার ভাইকে কত দিন দেখিনা, তবে ওই জগতে গিয়ে দেখতে পাব বলে বড় শান্তি পাই। এমন কোন দিন নাই আমার মা না কেঁদে থাকে। শুধু কি আমরা কাঁদি?

যারা আমার ভাইকে মেরেছ তাদের কাছে আমার প্রশ্ন কাশেমকে মেরে তোমরা কি লাভবান হয়েছো? আমার মন বলছে তোমাদেরই ক্ষতি হয়েছে, ক্ষতি হয়েছে খুলনাবাসীর। আমার ভাই একটা আদর্শবান ছেলে ছিল। তার আলাদা একটা দল থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য দলের সাথে ভাল সম্পর্ক ছিল। সে বেঁচে থাকলে খুলনার মানুষ একজন যোগ্য নেতা পেত। ওরা ভেবেছে কাশেমকে মেরে ওরা দলের দিক থেকে জিতে যাবে আসলে ওরা বোকা, সাময়িকভাবে একটু না হয় ক্ষতিই হয়েছে শিবিরের এবং তার ফ্যামিলিরও। আল্লাহ আমাদের একটু পরীক্ষায় ফেলেছেন, আসলে কাশেম লাভবান হয়েছে, লাভবান হয়েছে কাশেমের দল। লাভবান হয়েছে তার ফ্যামিলিও। কারণ, 'যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বল না তারাতো জীবিত বরং তোমরা তাদের জীবন অনুভব করতে পার না।' (সূরা বাকারা-১৫৪)

www.icsbook.info

'যদি তোমরা আল্লাহর পথে বা ইসলামী হুকুমাত কায়েমের লক্ষ্যে নিহত হও অথবা মৃত্যু বরণ কর তাহলে এর বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ক্ষমা ও মেহেরবানি পাবে তা ঐ সমস্ত জিনিস হতে উত্তম যা এরা (অবিশ্বাসীরা) সঞ্চয় করেছে।' (সূরাঃ আল ইমরান-১৫৭) সত্যিকারে লাভবান হয়েছে কাশেম ইসলামী মনোভাবাপন্ন এক অহিংস চরিত্রবান যুবক। তার শাহাদাৎ বরণ বৃথা যেতে পারে না, সত্যিকারের পথটাই বেছে নিয়েছিল সে। নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বয়ং তাকে পুরস্কৃত করবেন।

আমার পুঁজিবাদী ভাইরা, দুদিনের দুনিয়ায় ঐ সব ভাঁওতাবাজি দল ছেড়ে আল্লাহর পথে এসো, যে পথে আছে শান্তি। আমাদের বড় সান্ত্বনা আমার ভাই ভাল পথে জীবন দিয়েছে। আজ হোক আর কাল হোক মরতে তো হবেই সবাইকে। সেই মৃত্যু আশা করা দরকার, যে মৃত্যু সিরাতুল মুস্তাকীম-এর অনুসারী।

এক কাশেম চলে গেছে হাজারো কাশেম তৈরি হবে ইসলামের জন্য ইন্‌শাআল্লাহ। কাশেম সংগঠনকে এত বেশী ভালবাসত তার নমুনা-খুব সম্ভব সেদিন বুধবার ছিল শাহাদাতের চারদিন আগের কথা। আমার এক চাচাত ভাই বলেছিল ওনার সাথে কি কাজে যাওয়ার জন্য। কিন্তু কাশেম বলেছিল, 'ভাই, আমাকে মাফ করতে হবে, আমি আপনাকে সময় দিতে পারছি না। আগে আমার সংগঠন তারপর অন্য কাজ।' শেষের দিকে খুব একটা বিশ্রামও নিত না আর সব সময় বলত আমার টাকা-পয়সা হলে আমি সংগঠনেই ব্যয় করব বেশি। আর বলত, 'নিজের ভাইয়ের চেয়েও সংগঠনের কর্মী ভাইরা আমার কাছে বেশি প্রিয়।

শুধু বাইরে নয়; ঘরের প্রতিও ছিল তার খুব খেয়াল। পরের সমালোচনা করা মোটেও পছন্দ করত না। সমালোচনা শুনার সাথে সাথে সতর্ক করে দিত- 'গিবত করা হচ্ছে।' পর্দার ব্যাপারে তার ছিল সতর্ক দৃষ্টি।

আমার ছোট ভাই একবার একটা ক্যাসেট কিনেছিল এবং গোপনে নিয়ে গান শুনতো। কাশেম একদিন জানতে পেরে ক্যাসেট বিক্রি করে দিয়েছিল। বলেছিল, 'তুই গান শুনবি আর আমাদের গোনাহ হবে। কাশেমের তাক্‌ওয়া ছিল প্রচুর। সবার সামনে সবকথা বলতো না। গোপনে নফল নামাজ পড়তো। গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়া ছিল তার অভ্যাস। কোন বিপদ আসলে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করতে দেখেছি। বলতো, "কুরআন তেলায়াত করলে মনটা খুব ফ্রেশ লাগে" আমাদের ভিতর সবচেয়ে বেশী ভালবাসত আমার মাকে। খুলনাবাসীর নিকট আমার একটাই দাবি-আমার ভাই হত্যার বিচার করবেন আল্লাহ। কিন্তু আল্লাহ মানুষকে তো বিবেক দিয়েছেন, দিয়েছেন সিদ্ধান্ত নেয়ার শক্তি। আপনারাই চিন্তা করে দেখুন কিসের কারণে? কি অন্যায় করেছিল আমার ভাই? কি করে ওদের মাথায় ঢুকলো, আমার ভাইকে হত্যা করতে হবে? আপনারা ওদের জিজ্ঞাসা করুন? আল্লাহ আমাদের ধৈর্য ধরার তৌফিক দিন।

www.icsbook.info

সত্য কথা বলতে দ্বিধা নেই, আমার আব্বা মারা যাবার পরেও আমরা এত ব্যথিত হইনি। কষ্ট পাইনি। যতটা না কাশেমকে হারিয়ে কষ্ট পাচ্ছি। এক কথায় আমরা যে কি হারিয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।

কেন তোমরা এত সুন্দর একটা ফুলের জীবনকে এভাবে ঝরিয়ে দিলে? এত সুন্দর একটা ভাই তোমরা কি কোন দিন দিতে পারবে? না। খুলনা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও হয়ত এত সুন্দর সব দিক দিয়ে ভাল ছেলে পাবে না। কতই বা কাশেমের বয়স হয়েছিল? ও একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বু আমার কত বয়স হয়েছে?' তখন আমার মা হিসাব করে বলেছিল ২৫ বছর। তখন কাশেম বলেছিল, 'তাই নাকি, তাহলে সবাই আমার বয়স এর বেশি বলে কেন? বেশি বলে বিএনপি'র ছাত্রদলের ছেলেরা। আমি নাকি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।' তখন আমি তাকে বলেছিলাম, 'তুই সব সময় ব্যায়াম করবি তাহলে তোকে হয়ত এমনটি আর বলবে না।'

২১শে অক্টোবর শুক্রবার দুপুর বেলা বাড়িতে শেষ খাওয়া খেয়ে গিয়েছিল। খাওয়ার সময় সে আমাকে কানে কানে বলল, 'বু আমি আজ রাতে আসবো না, মাকে বলেনি, মা-রাগ করবে তাই।' আর বলেছিল, 'বু, জামা- কাপড়গুলো পরিষ্কার করে রেখো। আমি এসেই পরবো'। কিন্তু কাশেম আর ফিরলো না। আমার দুঃখ-ও আমার ধোয়া জামা-কাপড় আর পরতে আসবে না। শুধু আমার সাথে শনিবার টেলিফোনে কথা হয়েছিল, 'বলেছিল, বু, ভীষণ ব্যস্ত আছি। মাকে বুঝিয়ে বলো। আমার ফিরতে দেরি হবে।' কিন্তু এখনো কানো স্পষ্ট শুনতে পাই, 'আমার ফিরতে দেরি হবে।' কিন্তু ও তো আর কোন দিন ফিরবে না!- হে মাবুদ! তুমি জান্নাতের ভেতর কাশেমের সাথে আমাদের দেখা করার ব্যবস্থা ক'রো কারণ তুমি শহীদদের পরিবারের সদস্য সহ ৭০ জন সাথীকে জান্নাতে নিয়ে যাবার সুপারিশের অধিকার তো শহীদদের দিয়েছো। তুমিতো তোমার অঙ্গিকার ভঙ্গ করো না।

আমার ভাই খুব নরম প্রকৃতির ছিল। একটু অসুখ হলেই আল্লাহকে ডাকতো আর আমাদেরকে ডেকে জড়ো করতো। কিন্তু যখন কাশেম সংগঠনের ব্যাপারে খুব পরিশ্রম করতো, তখন 'ভাইটি আমার' নরম থাকত না। প্রায়ই দুপুর বেলায় খেতে বসে বলতো, এখনো সকালের খাওয়া হয়নি। বলতো সংগঠনের ভাইরা প্রচুর কষ্ট করে সময়মত খেতে, গোসল করতে পারে না। নিজের কথা চিন্তা করার চেয়ে সংগঠনের ভাইদের কথা এত ভাবতো ও!

একটা ঘটনা আজ আমাকে বড় কষ্ট দিচ্ছে ১৯৭১ সাল। দেশে তখন স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছে। মানুষ জীবন বাঁচানোর তাগিদে শহর থেকে গ্রামে যাচ্ছে, আমরাও খুলনা থেকে গ্রামের বাড়ি চলে গিয়েছিলাম নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে। তখন কাশেমের বয়স দুই-আড়াই বছর হবে। কাশেম বরাবরই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল। একদিন বড় চাচা ওকে কোলে করে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে একটি বাঁশের সাঁকো পার হচ্ছিল। হঠাৎ করে বড় চাচার কোল থেকে খালের পানিতে পড়ে গিয়েছিল কাশেম। চাচা তাড়াতাড়ি খালের পানিতে নেমে গেলেন। অনেক খোঁজাখুজি করলেন। বেশ কিছু

www.icsbook.info

পরে কাশেম বড় চাচার পা আঁকড়ে ধরলে তিনি ডুব দিয়ে তাকে তুলে এনেছিলেন। সে দিন কাশেমের বাঁচার কথা না। কাশেম যদি সেদিন মারা যেত, তাহলে আমরা হয়ত এত দুঃখ পেতাম না। কিন্তু আল্লাহ তার পথে শহীদ হিসেবে কবুল করবেন বলেই ২৩শে অক্টোবর'৯৪ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

ছোটবেলা থেকেই কাশেম পরিবারের কাউকে কখনো কষ্ট দেয়নি। আমরা এমন কিছু পাইনি তার চরিত্রে যে তাকে শাসন করতো। ইসলামের অনুশীলন করার ব্যাপারে ছোটবেলা থেকেই ছিল দারুণ উৎসাহী। তখন বয়স ৬-৭ বৎসর হবে। দুপুরে একটু দেরিতে বাসায় আসলে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, যোহরের নামাজ পড়েছিস? মলিন মুখে বলল, 'না'। তারপর নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল, 'বললাম, নামাজ না পড়লে দুপুরে ভাত খেতে পারবি না।' তখন ও ভীষণ দুঃখ পেয়ে নীরবে বাড়ির বাহিরে গিয়ে উঠোনের পাটিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। পরে শুনেছি ও যোহরের নামাজ পড়েছিল। তখন আমিও ভীষণ দুঃখ পেয়েছিলাম। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে, আব্বা কাশেমের বড় দু'ভাই থাকতেও তার যাবতীয় ব্যবসায়িক দায়িত্ব কাশেমকে বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব ছিল তার উপর। শত সমস্যার মধ্যেও তাকে কখনো হতাশ হতে দেখেনি। সব সময় তার মুখে ছিল চরম নির্ভরতার আশ্বাস। শুধু বলতো 'বু, ভেঙ্গে পড়ো না, ধৈর্য ধরো, কোন চিন্তা করো না সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।'

শাহাদাতের কয়েক দিন পূর্বের কথা, ছোট বোন দুটি টিভিতে অনুষ্ঠান দেখছিল, আমি ওদেরকে রাগ করছি, জোরে জোরে কথা বলছি, নিষেধ করেছি অনুষ্ঠান দেখতে। কাশেম সে সময় মুচকী হেসে বলেছিল, 'ছোট মানুষ, কিছু সময় দেখে দেখুক'। তারপর বাড়ি থেকে সাংগঠনিক কাজে বেরিয়ে গেল। রাত বারটা'র দিকে বাড়ি ফিরে ছোট বোন দুটিকে ডেকে টিভি দেখে অযথা সময় নষ্ট না করার পরামর্শ দিয়েছিল। বলেছিল, 'তোমাদের কাছ থেকে আমি কখনো এরূপ আশা করিনি। আশাকরি এরকম আর করবে না।' এভাবে ছোট ভাই-বোনদের শুধরে দিত।

বাড়িতে মাঝে মাঝে আমাদেরকে নিয়ে দারসে কুরআনের আসর করতো। ইসলামী আন্দোলনে নারীদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা বলতো।

হে আল্লাহ যে ভাইটিকে আমি কখনো তোমার অবাধ্য হতে দেখিনি, মিথ্যা কথা বলতে শুনিনি। ইসলামের প্রতি যে ছিল অটল অবিচল তুমি তাকে জান্নাত নসিব করিও। আর তোমার ওয়াদা অনুযায়ী তুমি আমাদেরকে এবং শহীদের অগণিত সাথীদেরকে জান্নাতে যাবার ব্যবস্থা করিও। আমি, আমার পরিবারের সকলেই সে আশায় বুক বেঁধে আছি। মাত্র কয়দিন পরেই তো কাশেমের সাথে আমাদের দেখা হবে। মাত্র কয়টি দিন.....!

লেখিকা ঃ শহীদ আবুল কাশেম পাঠান এর বড় বোন

www.icsbook.info

রক্তে ভেজা জামা

মুহাম্মদ আব্দুল গফ্‌ফার

"Man is the best creation of God.
God has dressed the world with
the beautiful objects."

"আল্লাহ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ। তিনি এই পৃথিবী অতিসুন্দর আকৃতি-প্রকৃতিতে সাজিয়ে রেখেছেন"।

সৃষ্টি জগতের সকল কিছুই সুন্দর। তাই বলে সব সুন্দরকে একভাবে বিচার করা যায় না। কিছু কিছু থাকে অতি সুন্দর। আর সেগুলো পাওয়ার জন্য মানুষ খুব বেশি উৎগ্রীব থাকে। অতি সুন্দর সৃষ্টিই ক্ষণস্থায়ী। ইচ্ছা করলেই তাকে বেশি দিন ধরে রাখা যায় না।

অতি সুন্দরের অন্তর্ধানে মানুষ খুব বেশি মুষড়ে পড়ে, দুঃখ পায়, শূন্যতা অনুভব করে। অতি সুন্দরের অন্তর্ধানে মানুষের মনোজগতে চিরস্থায়ী বেদনা ও ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তেমনই এক অতি সুন্দর ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টি শহীদ আবুল কাশেম পাঠান।

২৩শে অক্টোবর'৯৪ খুলনার সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজের সামনে ছাত্রদলের ঘাতক বুলেটের আঘাতে এই নশ্বর জগৎ থেকে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন খুলনার আপামর ছাত্র-জনতার প্রাণপ্রিয় নেতা শহীদ আবুল কাশেম পাঠান।

বিএল কলেজের কর্মমুখর ময়দান থেকে ছুটে এসেছেন সিটি কলেজে নবাগতদের স্বাগত জানাতে আবুল কাশেম পাঠান। বিশাল র‍্যালি রয়্যাল হোটেলের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সিটি কলেজের সামনে। হঠাৎ মিছিলের সম্মুখভাবে আক্রমণ হলো।

www.icsbook.info

বিকট বোমা শব্দ ও মুর্হূমুহূ গুলির আওয়াজ। দু-তিন মিনিটের মধ্যেই সব ফাঁকা হয়ে গেল। নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার শ্লোগানে রাজপথ উদ্বেলিত। আমি, ওয়াদুদ ভাই, আবুল কাশেম পাঠান ভাই, সাখাওয়াত ভাই, আইয়ুব ভাইসহ কয়েক জন সিটি কলেজের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট জনশক্তির প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করছি। হঠাৎ ছোট্ট একটা আহ---আ---হ, শব্দ কানে ভেসে আসলো। সেই সাথে "আল্লাহু-আকবর" আর্তচিৎকার শুনলাম। চোখ ফিরিয়ে দেখি আবুল কাশেম পাঠান ভাই পড়ে গেলেন সিটি কলেজের সামনে পিচঢালা কাল পথের উপর। রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল রাজপথ। কাছে এগিয়ে গিয়ে দুই/তিনজন ধরা-ধরি করে রিক্সায় উঠলাম। আমার কাঁধের উপর মাথা রেখে শরীর নেতিয়ে দিলেন আমার শরীরের উপর। আমার গায়ের সাদা শার্ট রক্তে সিক্ত হলো। পরের মুহূর্তটা বড় করুণ, হৃদয় বিদারক। কান্নায় বুক ফেটে যায়। কাশেম ভাই কয়েকবার যেন গোঙানোর মত শব্দ করে কি যেন বলে গেলেন মহান আল্লাহ্ই শুধু জানেন। যে ভাষা বোঝার সাধ্য আমার কেন, বোধ করি পৃথিবীর কারো জানা নেই। মাত্র কয়েকবার। তারপর.....। সব নিস্তব্ধ শান্ত হয়ে এলো কাশেম ভাইয়ের শরীর। শক্তভাবে বুকের সাথে ধরে রাখলাম কাশেম ভাইকে। কিন্তু তখন কিছুই বুঝতে পারিনি। এখন শুধু উপলব্ধি করি কাশেম পাঠান ভাই যেন অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলেন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" আর বললেন "হে আল্লাহ আমার রক্তের বিনিময়ে এ জমীনে তুমি ইসলামকে বিজয়ী করে দাও।" তারপর- কাশেম ভাইকে ক্লিনিকে নেয়া হলো। আধাঘন্টা পরে ক্লিনিকে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ডাক্তার আমাকে পাশে ডেকে বললেন- "Spot Death"

সেই সাদা শার্টটি যা আমার গায়ে ছিল এখনও সযত্নে আমার কাছে রক্ষিত আছে কাশেম পাঠান ভাইয়ের স্মৃতির স্বাক্ষর হিসেবে। মাঝে মধ্যে দেখি আর নিজের নাকের কাছে নিয়ে শহীদি রক্তের ঘ্রাণ নেই আর প্রেরণা খুঁজে পাই দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ অতি সুন্দর সৃষ্টি শহীদ আবুল কাশেম পাঠান ভাইয়ের কর্মমুখর স্মৃতি আরো অনেকের মত এখনও আমাকেও ঘিরে বিচরণ করে। যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন ভুলব না সেই বেদনা-বিধুর স্মৃতি। আর কখনও হাতছাড়া করবো না আমার কাছে সযত্নে রাখা সেই রক্তে ভেজা শার্টটি যা' আমার চিরদিন প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

লেখক ঃ সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, খুলনা জেলা।

www.icsbook.info

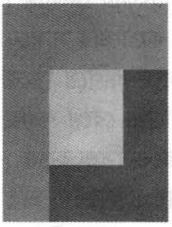

জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু

শেখ মিজানুর রহমান মিজান

শহীদ আবুল কাশেম পাঠান, শহীদ হালিম, বিমান, আমান, রহমত, মিল্লাতের গৌরব, দুর্যোগের রাহবার। অন্ধকারের অমানিশায় হেরার গুহা থেকে উৎসারিত আলোকিত রাজপথে সত্যের মশালবাহী জিন্দাদিল মুজাহিদের নাম। জাতির অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে দিশার ধ্রুব তারা

"As the stars that are starring in the time of our darkness"

তারা আজ জাতির বধির কর্ণে কানফাটা চিৎকার।

ইসলামের জন্য জীবনাহুতি দিয়ে তারা চিরঞ্জীব, নিজ জীবনের বিনিময়ে গ্রহণ করেছেন এমন জীবন যাতে মৃত্যুর কোন স্পর্শ নেই। এদের সম্পর্কে আল কুরআন সাবধান করে বলেছে- তোমরা তাদেরকে মৃতদের মধ্যে শামিল করো না। যারা আল্লাহর রাহে জীবন দিয়েছে।"

বছর ঘুরে অক্টোবর মাস এসেছে। এ মাসের শুরু থেকেই মনের মধ্যে অস্বাভাবিক একটা অস্থিরতা অনুভব করছি। ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছি বারবার। কারণ খুঁজতে গেলে হৃদয়পটে ভেসে আসছে শহীদি খুনে রাঙ্গা একটি পবিত্র মুখোচ্ছবি। যে মুখোচ্ছবিতে রয়েছে বাংলাদেশের এই সবুজ ভুখণ্ডে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আত্মোৎসর্গের জন্য পরিতৃপ্তির অম্লান হাসি। শহীদি তাজাতপ্ত খুনে উজ্জ্বল অম্লান এই মুখোচ্ছবিটি আমাদের সকলের প্রিয় খুলনার আপামর ছাত্র জনতার প্রাণপ্রিয় নেতা আবুল কাশেম পাঠানের। ঠিক আজ থেকে কয়েক বছর আগে ২৩শে অক্টোবর' ৯৪ তৎকালীন ক্ষমতাসীন বি.এন.পির ছাত্র নামধারী পেশাদার গুণ্ডাদের নির্মম বুলেটে তিনি নশ্বর এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন এক অনন্ত জীবনে। যেখান থেকে আর কেউ ফিরে আসে না। আসাও যায় না। তাইতো আমাদের প্রাণপ্রিয় আবুল কাশেম পাঠান আর কোনদিন মা মা বলে ছুটে এসে মায়ের বুকে মুখ লুকাবেনা। ছোট ভাই বোনদেরকে যিনি আদরে আদরে ভরিয়ে দিতেন তিনি আর আসবেন না। খুলনাবাসীদের স্নেহে ধন্য এ যুবক খুলনাকে নিয়ে, দেশকে নিয়ে বড় বেশি স্বপ্ন দেখতো, স্বপ্ন দেখতো আল্লাহর এই জমিনে ইসলামী বিপ্লবের। তিনি আজ মায়ের হৃদয়ের তন্ত্রী ছিঁড়ে, বোনের ভালবাসার জাল ছিন্ন করে

www.icsbook.info

বড় ভাইয়ে স্নেহের পরশ ছেড়ে, ছোট ভাইয়ের ভাইয়া ডাকের মায়া ত্যাগ করে গ্রামের, শহরের দেশবাসীর সকল স্বপ্নসাধ ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেছেন।

"জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনি জানি
শহীদি রক্তে হেসে ওঠে যবে জিন্দেগানী"

শাহাদাতের সুধা পান করে টগবগে এ যুবক চলে গেছেন আল্লাহর কাছে। আজ হয়ত তিনি আল্লাহর জান্নাতের সবুজ চঞ্চল পাখি হয়ে ঘুরে ফিরছেন। ছাত্রদলের পাষণ্ড তথা জবাই করে মানুষ হত্যা করার জনক বি.এন.পি'র খুনিচক্র খুলনার লক্ষ লক্ষ মানুষের নয়নের মনি আবুল কাশেম পাঠানকে আর থাকতে দিল না এ পৃথিবীতে। শহীদ আবুল কাশেম পাঠানের মত মর্যাদাবান শহীদকে নিয়ে লেখার মত যোগ্যতা ও হিম্মত আমার নেই। তবুও আজ আবুল কাশেম পাঠানের অনেকগুলি স্মৃতি বিবেকে আবেগে কশাঘাত করছে। চেতনায় তোলপাড় সৃষ্টি করছে বারবার। তাই আবেগকে প্রাধান্য-দিয়ে অযোগ্যতা নিয়ে কলম ধরেছি। লিখতে বসেছি এ আশায় যে পাঠানের প্রিয় সাথীদের হৃদয়ে অন্ততপক্ষে একটি স্মৃতিচিহ্ন সংযোজিত হবে। অধিকন্তু আবুল কাশেম পাঠানের সাথে এক সময় একই ময়দানে কাজ করতাম এ দাবিতেও তার অম্লান স্মৃতিগুলো তার সাথীদের জানাতে হয়।

আবুল কাশেম পাঠানের শাহাদাত প্রেক্ষাপটের দু'টি কথা, যা না বললে বিষয়টি কিছুটা অপূর্ণাঙ্গই থেকে যায়। বিধায় অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি পঙক্তি সংযোজন করছি। ১৯৯৩ সাল। শুরু থেকেই আন্তর্জাতিক নীল নক্শার আওতায় বিদেশী মদদপুষ্ট অপশক্তি বিশেষত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাসের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়। এর মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের তল্পিবাহকরা দেশ জুড়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে জাতির মেধা ধ্বংস, উন্নয়ন রুদ্ধ এবং একই সাথে ইসলামের মূলোৎপাটন করতে উঠে পড়ে লেগে যায়। পুঁজিবাদী, সমাজবাদী, নির্বিশেষে জড়বাদের পূজারী এই চিহ্নিত মহলটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা- সার্বভৌমত্ব নস্যাৎ করে বিজাতীয় আগ্রাসনের পথ সুগম করার স্বার্থে অত্যন্ত সুচতুর ভাবে এদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীদের ঘাড়ে চেপে এক পর্যায়ে জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জিকির তুলে। এহেন মানসিকতার পশ্চাতে যে দ্বীন ও ঈমানকে উৎখাত করার শয়তানী মতলবই মুখ্য ছিল তা সুস্পষ্ট। এদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এক পর্যায়ে সুপরিকল্পিত ভাবে ছাত্রদলকে ব্যবহার করে। এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আপসহীন শিবিরকে জিঘাংসার টার্গেট বানায়। তাই দেখা যায় ৬ই ফ্রেব্রুয়ারি' ৯৩ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এদের সার্বিক যোগান ও মদদে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ ছাত্র হত্যার ঘটনা ঘটে। ছাত্রশিবিরের দু'জন নেতা রবিউল ও মুস্তাফিজকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। রাজশাহী সরকারি কলেজে আক্রমণ করে ইয়াহিয়াকে হত্যা করা হয়। অতঃপর তাদের নীলনক্সা আরো একধাপ এগিয়ে যায় ঘটনার ধারাবাহিকতায়। সেপ্টেম্বর মাস এসে যায়। এ সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বামপন্থী-ঘাদানিক ও ছাত্রদলের সমন্বয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়- "১২ ঘন্টার মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিবির উৎখাত করতে হবে।" তাদের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১৮ সেপ্টেম্বর রাত ৩ টায় ছাত্রদলের নেতৃত্বে ছাত্রমৈত্রীসহ সকল বাম ছাত্র সংগঠন এক যোগে ঘুমন্ত শিবির কর্মীদের উপর

www.icsbook.info

আক্রমণ চালায়। উল্লেখ্য এ হামলার সময় শেরেবাংলা হলে আক্রমণের সময় হলের সাধারণ ছাত্রদের প্রতিরোধের মুখে হামলাকারীরা পালাতে গিয়ে দোতলার ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পালানোর সময় নিজের ব্যাগে রাখা বোমা বিস্ফোরণে জোবায়ের চৌধুরী রিমু নিহত হলে এটাকে পুঁজি করে সরকারি মদদ ও অস্ত্রপ্রাপ্ত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল দেশব্যাপী শ্বেত সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। যার নির্মম পরিণতি ২০শে সেপ্টেম্বর '৯৩ সরকারি বি.এল. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও খুলনা আলিয়া মাদ্রাসার পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। সরকারি বি.এল. কলেজে সেদিন যে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয় তার সরেজমিন প্রতিবেদন সংগ্রহ করতে যেয়ে মনে হয়েছে, না-শুধু মনেই হয়নি। এ ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এ হত্যাকাণ্ড সুপরিকল্পিত। এতে ছাত্রদলের খুনিদের গুলি করা ও বোমা ফাটানো আর ছোরা চালানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আর যার মূল পরিকল্পনায় রয়েছে বিএনপি'র শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের কয়েকজন। তারা দক্ষিণ বাংলার শ্রেষ্ঠতম বৃহৎ বিদ্যাপীঠ বি.এল. কলেজের জি.এস.কে হত্যা করে মোটামুটিভাবে বৃহৎ খুলনায় দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল হালিম, রহমত, আমানের শহীদি রক্তের বরকত কর্মীদের উদ্যম, আবুল কাশেম পাঠানের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব খুলনার ময়দানে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জোয়ার আসতে দেখে। জবাই করে মানুষ হত্যাকারী কসাইদের নেতা তৎকালীন স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী ও হুইপ আশরাফের পরিকল্পনায় আবুল কাশেম পাঠানকে নিঃশেষ করে দেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়। আর তারই করুণ পরিণতি ২৩শে অক্টোবর '৯৪ সরকারি সিটি কলেজে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় আবুল কাশেম পাঠানের এই নির্মম হত্যাকাণ্ড। পাঠানকে হত্যা করে খানজাহানের স্মৃতি বিজড়িত মাটি থেকে ইসলামকে মুছে ফেলার মিথ্যা স্বপ্ন সাথে ওরা বিভোর। কিন্তু তা হয় না। এক কাশেমের রক্ত থেকে লক্ষ কাশেমের জন্ম হবে এটাই শহীদি খুনের দাবি।

আবুল কাশেম পাঠানের সাথে প্রথম পরিচয় ১৯৮৫ সালে তৎকালীন শিবিরের খুলনা মহানগরী কার্যালয় ১৮, ইসলামপুর রোডস্থ অফিসে। পাঠান তখন সবেমাত্র ৯ম শ্রেণীর ছাত্র এবং শিবিরের কর্মী। প্রায় প্রতিদিন বিকেলে তিনি একটি সাইকেল চালিয়ে শিবির অফিসে আসতেন। অফিসের নিচে পত্রিকার দোকানে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ পত্রিকা পড়তেন, দু'একটি কিনতেনও। তারপর শিবির অফিসে আসতেন এবং কাজ সেরে সন্ধ্যায় বসুপাড়ার বাসায় ফিরে যেতেন। এটা যেন তার নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। এমনকি অনেক সময় কাজ না থাকলেও তিনি অফিসে আসতেন। জানার প্রবল আগ্রহ ছিল তার। কর্মী থেকে সাথী হওয়ার জন্য তিনি পাগল প্রায় ছিলেন। ঠিক এ সময়েই এই মর্যাদাবান শহীদের সবচেয়ে কাছে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। তৎকালীন খুলনা সদর পশ্চিম থানার সভাপতির অনুপস্থিতিতে অগ্রসর কর্মীদের কয়েকটি ষ্টাডি ক্লাস নেয়ার দায়িত্ব আমার উপর বর্তায়। এই ষ্টাডি ক্লাসগুলিতে সবচেয়ে প্রথমে যে উপস্থিত হতেন তিনি আবুল কাশেম পাঠান। সবচেয়ে বেশি নোটভিত্তিক পড়ালেখা করতেন যিনি তিনি আমাদের পাঠান ভাই আর প্রশ্নও সবচেয়ে বেশি করতেন পাঠান। প্রশ্নের ধরন দেখে মনে হতো আবুল কাশেম পাঠানের সৃষ্টিই হয়েছে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে একটা বড় অবদান রাখার জন্য। অবশ্য শাহাদাতের মাধ্যমে তিনি সবচেয়ে বড় অবদানই রেখেছেন।

www.icsbook.info

যতটুকু মনে পড়ে '৮৬ সালের শেষের দিকে আবুল কাশেম পাঠান সংগঠনের সাথী হয়ে যান। তখন তার কর্মতৎপরতা আরো বেড়ে যায়। খুলনায় থাকা অবস্থায় আমি প্রতিটি মিছিলে কাশেমকে দেখেছি। আবুল কাশেম পাঠান যখন মিছিলে নারায়ে তাকবীর শ্লোগান তুলতেন তখন জনশক্তির মাঝে দুরন্ত আবেগ সৃষ্টি হত। মিছিল হতো আরো বেগবান। সুগঠিত বিশাল দেহের অধিকারী পাঠান অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারতেন। শিশু-কিশোরদের মন জয় করার বিরল বৈশিষ্ট্য ছিল তার মধ্যে। তৎকালীন শিশু কল্যাণের খুলনা মহানগরীর পরিচালক মন্টু ভাই মাঝে মধ্যে তাকে দু'একটি কাজ দিলে খুলনা মহানগরী সভাপতি বেলাল ভাই নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন তার প্রতি বেশ প্রেসার দেয়া হচ্ছে, তাকে বি.এল. কলেজে খুব প্রয়োজন। অবশ্য বেলাল ভাইয়ের এই স্বপ্ন সাধ পূর্ণ হয়েছিল। আবুল কাশেম পাঠান '৯২ বি.এল. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়ে এ.জি.এস. (সহ-সাধারণ সম্পাদক) নির্বাচিত হয়েছিলেন। বি.এল. কলেজের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর প্রিয় নেতা ছিলেন তিনি। শাহাদাতের পর অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছে খুলনার ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে পাঠানের মত জনপ্রিয় নেতার জন্ম হয়নি। শুধু ছাত্র আন্দোলনই নয় খুলনার আপামর জনতার নেতা ছিলেন তিনি। দলমত নির্বিশেষে সকল মহলে ছিল তার সরব পদচারণা। সকলের ভালবাসাও পেয়েছিলেন তিনি। তার শাহাদাতের পরের দিন ২৪ অক্টোবর '৯৪ খুলনার প্রায় সকল পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে হত্যাকাণ্ডকে জঘন্য, পাশবিক হিসেবে নিন্দা করা হয়। অপরদিকে আবুল কাশেম পাঠানের অকাল বিয়োগে খুলনার যে অপূরণীয় ক্ষতি হলো তা উল্লেখ করা হয়।

যেমন ঐ দিনের দৈনিক প্রবাহে লেখা হয়, "বড়ই অমায়িক ছিল ছেলেটি, রাজনৈতিক দলের প্রতিপক্ষের গুলিতে নিহত হল। অপূরণীয় ক্ষতি হল খুলনাবাসীর, লাখ লাখ খুলনাবাসী আজ থমকে গেছে। খুলনার ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত যে সকল নেতার নেতৃত্বকে আমরা স্বনামে চিনি তাদেরই একজন হারিয়ে গেল। একটি ছাত্রসংগঠন হারালো তার যোগ্যতম নেতাকে, দেশ হারালো সম্ভাবনাময় এক তরুণকে। ছাত্ররাজনীতির অঙ্গন থেকে শূন্য হল একটি নেতৃত্ব।"

দৈনিক জন্মভূমির সম্পাদকীয় কলমে উল্লেখ করা হয়- "আবুল কাশেম পাঠান মানে এক হাস্যোজ্জ্বল তরুণ। শুধু বি.এল. কলেজেই নয়, প্রত্যেকটি কলেজের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর প্রিয় ছিল পাঠান। মেধাবী স্বাস্থ্যবান এই তরুণ ছাত্র নেতা বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়াত সব সময়। প্রতিপক্ষকে সব সময় বন্ধুসংগঠনের ভাই হিসেবে সম্বোধন করতেন।"

সাংবাদিকতার প্রতি প্রবল ঝোঁক ছিল পাঠানের। নবম শ্রেণীতে পড়াকালেই তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্র অফিসে যেতেন এবং লেখালেখির অভ্যাস করতেন। আমি নিজেও এমন কত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি কয়েকবার। তিনি হয়ত মনে করতেন আমি লিখতে জানি কিন্তু আসলে আমি সাংবাদিকতার 'স'টিও জানতাম না। যাই হোক ৮৫ থেকে ৮৮ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের ধারাবাহিকতায় অনেক স্মৃতি মনে পড়লেও কলেবর বেড়ে যাওয়ার ভয়ে সব বলতে পারছি না। তবে একটি স্মৃতি আজ খুব মনে পড়ছে শাহাদাতের প্রায় দুই সপ্তাহ আগে কলাবাগান সেন্ট্রাল মেসে বসে আছি এমন সময় টেলিফোন করলেন আবুল কাশেম পাঠান, সালাম বিনিময়ের পর প্রথমেই প্রশ্ন

www.icsbook.info

করলেন ২০শে সেপ্টেম্বর হালিম ভাইয়ের শাহাদাত বার্ষিকীতে এলেন না কেন? আমি অবশ্য কেন্দ্রীয় সভাপতির একটি বিদেশ সফরের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সভাপতির দেয়া একটা জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকায় হালিম ভাইয়ের শাহাদাৎ বার্ষিকীতে যেতে পারিনি। তখন আবুল কাশেম পাঠান বললেন, "আমরা বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদ ভবনের এক প্রান্তে হালিম-রহমত মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করতে চাই, এজন্য ইতিহাস বিভাগের পরামর্শ এবং সহযোগিতা দরকার। আপনি বাড়ি এলে অবশ্যই আসবেন এবং আমাদেরকে মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার কাজে সহযোগিতা করবেন।" আমি ওয়াদা করেছিলাম আসব এবং সহযোগিতা করব। কিন্তু আমি সেই ওয়াদা পালন করার আগেই আমাদের প্রিয় আবুল কাশেম পাঠান চলে গেল আল্লাহর কাছে।

১৯৯৩ সালের সদস্য সম্মেলনের কথাটি আজ বড় মনে পড়ছে। আমি অফিসে সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত থাকায় সম্মেলন স্থলে আসতে দেরি হয়ে যায়। এজন্য প্যান্ডেলের সবচেয়ে পিছনে বসার সুযোগ পাই। কিছুক্ষণ বাদে ডান দিকে তাকিয়ে দেখি আবুল কাশেম পাঠান কেন্দ্রীয় সভাপতির উদ্বোধনী ভাষণ ডায়েরিতে লিখে যাচ্ছেন। সম্মেলনের শেষের দিন ১৯৯৪ সালের ১ম দিন আমি সম্মেলনের অফিসে বসে কাজ করছি এমন সময় আবুল কাশেম পাঠান একটি নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ড দিয়ে গেলো। আমি দেখলাম তার হাতে অনকেগুলি শুভেচ্ছা কার্ড কমপক্ষে এক শত হবে। এ কার্ডগুলি তিনি কলেজের সাধারণ ছাত্র এবং শিক্ষকদের মাঝে শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য কিনেছেন বলে জানালেন।

আবুল কাশেম পাঠানকে যখনই দেখেছি, দেখেছি তার মধ্যে সীমাহীন ব্যস্ততা তবে সব ব্যস্ততা ছিল তার সুমহান ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে। ইসলামের জন্য এত আন্তরিকতা ও দরদ ছিল তার যে ১৯৯০ সালে চাকসু নির্বাচনে শিবিরের কাফেলার কাজে নিজকে শরিক করার জন্য সুদূর খুলনা থেকে ছুটে গিয়েছিলেন চট্টগ্রাম। এভাবে প্রতিটি সাংগঠনিক কাজে তিনি সবার আগেই থাকতেন। পাঠান শহীদ, হালিম শহীদ, রহমত শহীদ, বিমান শহীদ, আমান শহীদ তারা আজ আমাদের প্রেরণার উৎস। দুনিয়ার জীবন্ত জাতি সমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ কথার সাক্ষ্য মেলবে যে, তাদের অস্তিত্বের পেছনে রয়েছে একদল মানুষের জীবনাহুতি। কোন মরণাপন্ন জাতিকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন জীবিতদের খুন। আজকের সম্বিত হারা জাতিকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন শাহাদতের তাজা খুন। খানজাহানের পদচারিত খুলনার সম্বিত হারা মানবতার হৃদয় শহীদদের তাজা খুন কি কোন তোলপাড় তুলছে না? তুলবে নিশ্চয়, শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না কখনও বৃথা যেতে পারে না। হায়েনাদের হাতে রয়েছে কিরিচ, বন্দুক, বল্লম, মেশিনগান আর গ্রেনেডসহ মানুষ মারার আধুনিক হাতিয়ার। ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, দুর্জয় সাহসে বলীয়ান হয়ে যারা পাঠান, হালিম, রহমত, বিমান, আমানের মত এগিয়ে যায় শাহাদাতের অদম্য জজ্‌বা নিয়ে বাঁধার ব্যারিকেডগুলো তাদেরকে কুর্নিশ করে পথ ছেড়ে দেয়। তাদেরকে শহীদ করা যায় পরাজিত করা যায় না, তারা অপরাজেয়। তারা অপ্রতিরোধ্য।

লেখক ঃ সাবেক সদস্য, কেন্দ্রীয় অফিস বিভাগ,বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

www.icsbook.info

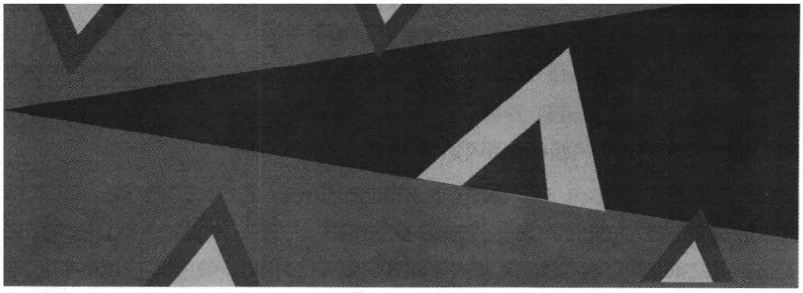

একটি বেদনার স্মৃতি

শেখ মাহমুদ এ রিয়াদ

২রা অক্টোবর '৯৪। শহীদ শেখ রহমত আলী ভাইয়ের ১ম শাহাদাত বার্ষিকী। রহমত ভাইয়ের প্রিয় জন্মভূমি তালাতে এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে শাহাদাত বার্ষিকী পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু ঐ তারিখে মেহমান না পাওয়াতে তারিখ পরিবর্তন করা হয়। হঠাৎ করেই তারিখ পরিবর্তন করাতে দূরের ভাইয়েরা সংবাদ ঠিকমত পাননি অবশ্য আমরা চেষ্টা করেছিলাম সব জায়গায় পরিবর্তিত তারিখ জানিয়ে দেওয়ার জন্য।

সেদিন শহীদ রহমত ভাইয়ের যোগ্য উত্তরসূরী শহীদ আবুল কাশেম পাঠান ভাইসহ জাকির ভাই, মোস্তফা আল মুজাহিদ ভাই ছুটে এসেছিলেন রহমত ভাইয়ের শাহাদাত বার্ষিকীর সংবাদ পেয়ে।

২রা অক্টোবর সকাল ১০টার দিকে সংগঠনের অফিসে বসেছিলাম হঠাৎ গাড়ীর শব্দে পিছনে তাকালাম, দেখলাম গাড়ি থেকে নেমে অফিসের দিকে এগিয়ে আসছেন সদা হাস্যোজ্জ্বল আবুল কাশেম পাঠান ভাই সাথে ভিপি জাকির ভাই এবং মহানগরী সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা আল্ মুজাহিদ ভাই। উনাদের আকস্মিক উপস্থিতিতে আমি বুঝতে পারলাম যে শাহাদাত বার্ষিকীর সংবাদ পেয়ে তারা এসেছেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর কাশেম ভাই বললেন, প্রোগ্রাম কোথায় হচ্ছে চলুন সেখানে যাই। উত্তর দিতে আমি বিব্রত বোধ করছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল আজ প্রোগ্রাম হবে না-এ কথা শুনলে হয়তো মেহমানরা রাগ করবেন। আমি অতি সংকোচে সংগঠনের সিদ্ধান্ত জানালাম। কাশেম ভাই স্বভাবগত ভঙ্গীতে মৃদু হেসে বললেন "মোস্তফা ভাই, রহমত ভাইয়ের শাহাদাত বার্ষিকীতে যখন এসেছি তখন

www.icsbook.info

আর এমনি ফিরে যাব না"। মোস্তফা ভাইকে এ কথা বলে কাশেম ভাই আমাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, আপনি কলেজের একটি রুমে ছাত্রদের দাওয়াত দিয়ে একত্রিত করতে পারবেন? আমি বললাম, "সত্যিই একটা চমৎকার পরামর্শ কাশেম ভাই, আমি এক্ষণি ব্যবস্থা করছি।" তালা সরকারি কলেজের পার্শ্বেই আমাদের বাড়িতে মেহমানদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করলাম।

তাৎক্ষণিক এ প্রোগ্রামের জন্য উপস্থিত দায়িত্বশলীদের সাথে পরামর্শ করে তড়িঘড়ি দাওয়াতী কাজে নেমে গেলাম। কলেজ ক্যাম্পাসে ঐ দিন চলছিল সকল সংগঠনের ইন্টারমিডিয়েট ভর্তি কোচিং এর ক্লাস। প্রতিটি ভর্তি কোচিং এবং ক্লাসে যখন ক্যাম্পিং করছিলাম তখন মনে হচ্ছিল প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী যেন জাকির ভাই, কাশেম ভাইকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, কারণ তারা 'জাকির-হালিম-কাশেম' ভাইয়ের নাম এতদিন শুধু শুনেছে, এখন বাস্তবে দেখবে। ছাত্রদের প্রোগ্রামে আসার উৎসাহ দেখে কিছুটা হাল্কা হলাম, ভয় হচ্ছিল হঠাৎ প্রোগ্রামে ছাত্রদের উপস্থিতি নিয়ে।

সকাল ১১টায় প্রোগ্রাম শুরু করলাম। মেহমানদের ক্যাম্পাসে আনা হলো, মুহূর্তের মধ্যে বিশাল কক্ষ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। কাশেম ভাইয়ের পাশে বসে অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিলাম। অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করার জন্য কাশেম ভাই আমাকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছিলেন যা আজো আমার চোখে ভাসে।

"কাশেম ভাই স্বভাবগত ভঙ্গীতে মৃদু হেঁসে বললেন "মোস্তফা ভাই, রহমত ভাইয়ের শাহাদাত বার্ষিকীতে যখন এসেছি তখন আর এমনি ফিরে যাব না"। মোস্তফা ভাইকে এ কথা বলে কাশেম ভাই আমাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, আপনি কলেজের একটি রুমে ছাত্রদের দাওয়াত দিয়ে একত্রিত করতে পারবেন? আমি বললাম, "সত্যিই একটা চমৎকার পরামর্শ কাশেম ভাই, আমি এক্ষণি ব্যবস্থা করছি।"

একে একে মেহমানরা বক্তব্য রাখলেন, কাশেম ভাই তাঁর প্রদত্ত বক্তব্যে শহীদ রহমত ও তার দীর্ঘদিনের স্মৃতিকথা সুন্দরভাবে তুলে ধরে বলেছিলেন, "হালিম ভাই-রহমত ভাই, আজ বি.এল. কলেজ ক্যাম্পাসে ইসলামী আন্দোলনকে কয়েক যুগ এগিয়ে দিয়ে গেছে। আজ সদস্য বেড়েছে, সাথী বেড়েছে, কর্মী বৃদ্ধি পেয়েছে। শিবিরের প্রতি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সমর্থন বেড়েছে, বাতিল শক্তি জানে না যে, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের হত্যা করে আন্দোলন স্তব্ধ করা যায় না।" প্রধান অতিথি মোস্তফা আল মুজাহিদ ভাইয়ের বক্তব্যের পর প্রোগ্রাম শেষ হলে। তাৎক্ষণিকভাবে একটা সুন্দর সার্থক কর্মসূচী পালন করতে পেরে মহান আল্লাহকে শুকরিয়া জানালাম। এরপর সবাইকে নিয়ে শহীদ রহমত ভাইয়ের বড় ভাই রজব আলী ভাইয়ের বাসাতে দেখা করতে গেলাম, ঘরে প্রবেশ করতেই আমাদের দেখে কেঁদে

www.icsbook.info

উঠলেন রহমত ভাইয়ের ছাট ভাই ও বোন। কিছুক্ষণের জন্য পরিবেশটা ছিল নিস্তব্ধ, ভাই হারা দু'ভাই ও বোন আমাদের দেখে খুঁজে পেয়েছিল রহমত ভাইয়ের প্রতিচ্ছবি, কাশেম ভাই সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এগিয়ে গিয়ে বললেন, "কেঁদো না, কাঁদলে তো ভাইকে পাওয়া যাবে না, আমরা তো আমাদের ভাই, এক ভাই নেই, আমরা তো লক্ষ ভাই তোমাদের কাছে আছি, ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে, আর আমাদের সকলকে আজ হোক কাল হোক আল্লাহর দরবারে চলে যেতে হবে"- এভাবে সান্ত্বনা দিলেন কাশেম ভাই। কিছুক্ষণ অবস্থানের পর আমরা জোহর নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে চলে আসি। নামাজ বাদ দোয়া-মুনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মুনাজাতের সময় সেদিন কাশেম ভাই শিশুর মত করে আল্লাহর দরবারে কেঁদেছিলেন। রহমত ভাইয়ের আত্মার মাগ্‌ফিরাতের জন্য, যা উপস্থিত সকলেকে অবাক করে দিয়েছিল।

এবার বিদায়ের পালা, বিদায়ের সময় আমার এম.এ (পূর্ব ভাগ) ভর্তির জন্য কাশেম ভাইকে বললাম। কাশেম ভাই আমাকে বললেন, আমরা খুব শীঘ্রই গাইড বের করবো, ভর্তির তারিখ এ মাসেই দিবে, আপনি ১৯/২০ তারিখের দিকে আমার ওখানে আসেন।

১৯/২০ তাং আমি কাশেম ভাইয়ের কাছে যেতে পারিনি কিন্তু ২৩ তারিখ শুনেছি তাঁর শাহাদাতের খবর। ছাত্রদলের খুনীরা খুলনা সিটি কলেজের সামনে কাশেম ভাইকে খুন করেছে, এ সংবাদ শুনে আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, তবুও বিশ্বাস করতে হলো কারণ বিশ্বাস ঘাতকরা যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের এভাবে রক্ত ঝরিয়েছে।

পরশ পাথরের মত তালার মাটিতে ছোঁয়া দিয়ে এসেছিলেন কাশেম ভাই যে ছোঁয়ার পরশ আজও প্রিয়জনদের দোলা দিয়ে যায়, মনে করিয়ে দেয় ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী মুজাহিদ কাশেম ভাইয়ের কথা-আগামী দিনের ইসলামী আন্দোলনের সোনালি সূর্যোদয়কে ছিনিয়ে আনার বিপ্লবী শপথের কথা.... আর..... একটি বেদনার স্মৃতির কথা।

লেখক ঃ সাবেক দফতর সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, খুলনা মহানগরী।

www.icsbook.info

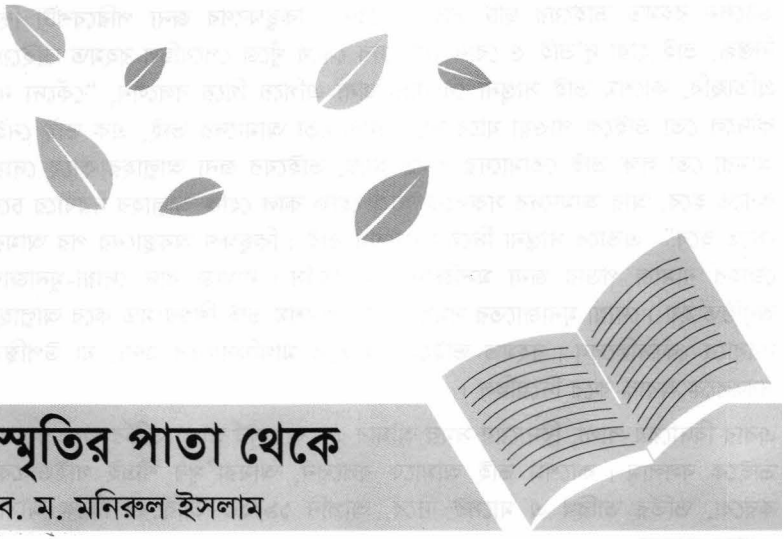

স্মৃতির পাতা থেকে

ব. ম. মনিরুল ইসলাম

ডাগর ডাগর চোখ। গোলগাল শক্ত মুখমণ্ডল আর পুরুষ্ট শরীর। সবচেয়ে আকর্ষণীয় তার কুচকুচে কালো ছোট ছোট শ্মশ্রুরাজি। উজ্জ্বল চকচকে চোখ দুটো তখনও কি যেন খুঁজে ফিরছিল। গায়ে তার হাফ শার্ট না গেঞ্জি এতদিন পরে তা মনে নেই। প্রথম সাক্ষাতে এবং কথাতে তিনি আমাদের আল হেরা মসজিদ দেখিয়ে দিলেন। পরে দেনেছিলাম তিনি শিবিরের অতন্দ্র প্রহরী সাথী। নাম জেনেছিলাম আমিনুল ইসলাম বিমান। বিমান নামটা শুনে মনে মনে বেশ হাসিও পেয়েছিল। এ আবার মানুষের কেমন নাম– বিমান। একটু Uncommon, সবার সাধ থাকে বিমান চালাবে, বিমানে চড়বে। এ বিমান কিন্তু সে বিমান নয়। এ বিমান মহাশূন্য পাড়ি দিয়ে চলে গেছে সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দরে। দীর্ঘদিন তার নামটা মনে ছিল। সেকি তার Uncommon নামের কারণে না চোখ মুখের উজ্জ্বল দীপ্তি দেখে– তা বলতে পারব না। ৯০-এর শেষের দশকে খুলনায় আসলাম পড়াশুনা করতে। বয়রাতে স্থান হল। একেবারে তার বাড়ির পাশেই। বাহ! এ যে সেই বিমান ভাই। যাক একজন সাংগঠনিক বন্ধু পেলাম। কিন্তু উভয়ের রিক্সা বিপরীতমুখী হওয়ার কারণে কথা হল না।

দু'দিন পরে নূরনগর স্কুলে S.S.C কৃতী ছাত্রদের সংবর্ধনা, ভালভাবে পরিচিত হলাম বিমান ভাইয়ের সাথে। শুরু হল বন্ধুত্ব পরে ভ্রাতৃত্ব। আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হল তাঁর উপশাখার বায়তুলমাল সম্পাদকের, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে Transfer করা হল অন্য উপশাখায়। তারপরও সব সময় দেখা হতো, কথা হতো, মতবিনিময় হতো। বিকাল ৩ টা গড়িয়ে গেছে– দেখতাম বিমান ভাই এক বালতি কাপড় নিয়ে পুকুরে হাজির। কি বিমান ভাই এখন কাপড় কাচবেন? ছোট্ট উত্তর

www.icsbook.info

"বাইরে একটু কাজ ছিল"। বিভিন্ন প্রয়োজনে বিমান ভাইদের বাড়িতে যেতাম। বুঝতে পারতাম না এটা ভবিষ্যতে শহীদের বাড়ি হবে। ছাত্র সংবাদ, কিশোর কণ্ঠ, নিউজলেটার তার টেবিলে থাকত। বর্ষার দিনে বিমান ভাইদের বাড়িতে ঢোকার পথে খুব কাঁদা হত। একেবারে গেঁয়ো কাঁদা যাকে বলে। বিমান ভাই তখন আমাকে সাবধানে আসার জন্য বলতেন। বিমান ভাই রাগ করতেন কিন্তু সে রাগ বেশিক্ষণ থাকত না। বিমান ভাই এর অট্টহাসি কখনও শুনিনি। যখন তিনি মুচকি হাসতেন তখন সত্যিই সে হাসি দেখতে ইচ্ছা হত। একবার এক ওয়ালরাইটিংয়ে আমার যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমি যেতে পারিনি। পরের দিন তিনি আমাকে শুনিয়ে সালাম ভাইকে বললেন, রাত্রে একজনের আসার কথা ছিল কিন্তু তিনি কেন জানি আসেননি। তখন আমি লজ্জিত হলাম। আমার ঈর্ষা ছিল বিমান ভাইয়ের সাইকেলটা নিয়ে। কারণ সাইকেলটা পুরানো হলেও তিনি খুব যত্ন করতেন এবং সাইকেলটা ছিল খুব চালু। অথচ আমার সাইকেলটা অত চালু ছিল না। দুর্ভাগ্য যে ৯১ সংসদ নির্বাচনের সময় যখন আব্বাস আলী খান খুলনায় আসেন তখন সাইকেলটা চুরি হয়ে যায়। কিন্তু তিনি এ নিয়ে মোটেই বাড়াবাড়ি করেননি। বিমান ভাইয়ের সাথে আমার মাঝে মাঝে একটু রাগারাগি হতো। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। একবার থানার একসাথী বৈঠকে বিমান ভাইয়ের আসতে দেরি হয়েছিল। দেরি হওয়ার কারণ হচ্ছে বিমান ভাই বি.এল. কলেজে একটা ছেলেকে ভর্তি করার ব্যাপার নিয়ে। আমি বলেছিলাম বিমান ভাই সামাজিক কাজ একটু বেশি করেন তো। তাই বিমান ভাই প্রতিউত্তরে বলেছিলেন তাদের জন্যও তো কাজ করতে হবে। এমন ছিল বিমান ভাইয়ের উদার মন। নিজের বাড়ির আশেপাশের এলাকার পরিবেশ কাজের অনুকূল ছিল না বলে তিনি কাজ করতেন সিএন্ডবি এলাকায়। থাকতেন বেশি ওখানেই। কারো কোন কাজ করতে হলে যদি নিজের টাকাও যেত তিনি তা একেবারে নিঃস্বার্থ ভাবে করতেন। কখনও কখনও বিমান ভাইকে দেখতাম রাত ১২/১ টার দিকে বাসায় যেতে। জিজ্ঞেস করতাম এত রাত হল যে? বলতেন, কি করব একটা ঝামেলায় পড়েছিলাম, ছাড়াতে একটু দেরি হয়েছে। এইভাবে তিনি বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ঝামেলার সমাধান করতেন। সিএন্ডবি নুর নগর এলাকায় এমন কেউ ছিল না যে বিমান ভাইকে চিনত না। তার

"বিমান ভাই কখনও জাঁকজমক পোশাক পরতেন না। একবার বি.এল. কলেজে নির্বাচনের সময় এক কর্মী বিমান ভাইকে বলেছিল, কলেজের বেতন পরিশোধ না করলে সে ভোট দিতে পারবে না। পরোপকারী বিমান ভাই তার সমুদয় বেতন পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দেন।"

www.icsbook.info

ছিল অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। নূরনগর বিশ্বাস পাড়ায় তার ব্যক্তিত্বের কারণে এক বিবাহের আপ্যায়নের দায়িত্ব ছিল আমাদের উপর। সেদিন দেখেছি বিমান ভাই কত সামাজিক। বলতে গেলে তারই পরিচালনায় বিয়ের আপ্যায়নটা আনন্দঘন হয়েছিল। সংসদ নির্বাচনে তারই পরিচালনায় এবং প্রায় এককভাবে তারই আর্থিক সহযোগিতায় যুবক ভাইদের নিয়ে চা চক্র অনুষ্ঠানটা সুন্দর হয়েছিল। এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরেও বিমান ভাই কখনও জাঁকজমক পোশাক পরতেন না। একবার বি.এল. কলেজে নির্বাচনের সময় এক কর্মী বিমান ভাইকে বলেছিল, কলেজের বেতন পরিশোধ না করলে সে ভোট দিতে পারবে না। পরোপকারী বিমান ভাই তার সমুদয় বেতন পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দেন। এভাবে বিমান ভাইয়ের কৃতিত্ব উল্লেখ করতে গেলে আদৌ শেষ করা যাবে কিনা সন্দেহ।

১৯৯১-৯২ সেশনে বিমান ভাই এর দায়িত্ব আসল বি.এল. কলেজে এবং আমি চলে আসলাম পশ্চিম থানায়। যদিও স্থান পরিবর্তন হল কিন্তু ভ্রাতৃত্বের বন্ধন পরিবর্তন হল না। বিমান ভাই, আরিফ ভাই বি.এ পাস করল এবং ইয়াছিন ভাই পাস করল পলিটেকনিকের সর্বোচ্চ ডিগ্রী। সেই সুবাদে বয়রার একটা মসজিদে এশার নামাযের পর একটা আনন্দ ঘন পরিবেশে চললো মিষ্টি খাওয়ার অনুষ্ঠান। আজ আমাদের মাঝে বিমান ভাই নেই, ইয়াছিন ভাই নেই কিন্তু যতদিন পৃথিবীতে থাকবো ততদিন মনে হয় সেই স্মৃতি মনে বেদনা দিবে। শহীদ তারাই হয় যাদের আল্লাহ বাছাই করে নেন। সংগঠনের সাথীর কাজ হচ্ছে সংগঠনের সামগ্রিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া। কিন্তু বিমান ভাই সংগঠনকে জীবনের একমাত্র কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সংগঠনের এমন কোন কাজ হতনা যেখানে বিমান ভাই থাকতো না। সর্বত্র বিমান ভাইকে হাসি মুখে পাওয়া যেত। বিমান ভাই আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তার কর্মচঞ্চল জীবন আমাদের মাঝে আছে। তিনি শহীদ হওয়ার কিছুক্ষণ আগেও আমাকে একটি বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিমান ভাই আজকে জান্নাতে অবস্থান করছেন। আমরাও যেন তার মাড়িয়ে চলা সিঁড়ি বেয়ে মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছাতে পারি।

লেখক ঃ সাবেক সদস্য, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, খুলনা মহানগরী।

www.icsbook.info

যেমন দেখেছি তাঁকে

মুহাম্মদ ইকবাল আমীন

শহীদ আবুল কাশেম পাঠান ভাইয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিনের তবে কোথায় কবে কিভাবে প্রথম তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল তা আমার মনে পড়ে না। তবে তার সঙ্গে যে একটা গভীর সম্পর্ক ছিল সেটা এখন বুঝতে পারি ঠিক তখনই যখন চিন্তা করি-'সে আর আসবে না।' আসবে না বললে ভুল হবে কারণ আসবে স্মৃতির জগতে।

'স্মৃতি মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে' কথাটি বিশ্বাস করার প্রয়োজনীয়তা পূর্বে অনুভব করিনি। তখন অনুভব করেছি যখন ১লা জানুয়ারি '৯৪ সদস্য সম্মেলনে দেওয়া কাশেম ভাইয়ের ভিউ কার্ডটি আমার সামনে দেখছি। ভিউকার্ডে লিখেছিলেন "ইকবাল ভাই বেশি মোটা হয়ে যাচ্ছেন। পরে নড়তে পারবেন না।" কেন এই মোটা হবার কথা লিখেছিলো জানিনা তবে এখন মনে হয় তার কথা চিন্তা করে শরীরটা খারাপ, মুখটা মলিন করতে হবে এই চিন্তা করে হয়ত।

কাশেম ভাইকে আমি সব সময় দেখেছি চঞ্চল হয়ে ছুটাছুটি করতে। আর সব সময় মুখের মধ্যে থাকত এতটুকরা দারুচিনি অথবা একটা চকলেট। সাধারণের সঙ্গে কথা বলতো অনর্গল ক্লান্তি নেই মোটেই। এ অভ্যাস বৃদ্ধি পেয়েছে তার পিতার মৃত্যুর পর থেকে। কারণ তিনি জানতেন তার পরিবারের দেখাশুনা একদিন তাকেই করতে হবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দেখাশুনা মনে হয় তিনি করতেন। তা না হলে ২৩শে অক্টোবর'৯৪ বিকালে একজন শ্রমিককে এমনভাবে কাঁদতে দেখেছিলাম, দেখে মনে হয়েছিল লোকটি তার পুত্র হারিয়েছে। ২৪শে অক্টোবর '৯৪ কাশেম ভাইয়ের কফিন দাফনের পর কবর খানা মসজিদের দক্ষিণপূর্ব কোনায় একজন যুবককে অসাড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। কাশেম ভাইয়ের চাচার কাছে জানলাম ঐ ছেলেটি নাকি কাশেম ভাইয়ের বাড়িতে থাকতেন এবং ছোট বেলা থেকে কাশেম ভাই এর সাথে একজন আপন ভাইয়ের মত বেড়িয়েছে একসঙ্গে। সেই দিন একজন দারোগার সঙ্গে কথা হচ্ছিল তখন তিনি বললেন, 'আমি আপনাদের রাজনীতি করি না, তবে কাশেমের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক ছিল তাতে আমার ইউনিফর্ম খুলে কাঁদতে ইচ্ছা করছে।' আর একজন দারোগা বললেন, 'চাকুরী করার ইচ্ছা আমার শেষ হয়ে গেছে। এর কারণ জানতে চাইলে সে বলছিল থানায় কাশেমের আসা যাওয়া, রাস্তায় দেখা হলে তার কথা বলার ভঙ্গি, লোকদেরকে আপন করে নেয়ার যোগ্যতা পুলিশ প্রশাসনের অনেককে কাঁদিয়েছে। সেদিন গিয়েছিলাম জেলখানায়। সেখানে উচ্চ পদস্থ একজন কর্মকর্তার সঙ্গে

www.icsbook.info

আলাপকালে তিনি বলেছিলেন, কাশেম এখানে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আসত আলাপ করত আমাদের খোঁজ খবর নিত, আমাদের মনেই হয় না যে কাশেম দুনিয়াতে আর নাই। আমরা তার মৃত্যুতে মর্মাহত হয়েছি।'

হাসপাতালে আমার এক আত্মীয়কে দেখতে গিয়ে সেখানে ডাক্তারের সাথে আলাপকালে তারা বলেছিলেন, 'কাশেম ছাত্রসমাজের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।' বিভিন্ন সময় আসত এখানে বিশেষ করে ২০ সেপ্টেম্বর '৯৩ এর পর থেকে হাসপাতালে আসা যেন তার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। আর তারই কারণে ২৩শে অক্টোবর '৯৪ একটি রাত সে কাটাল হাসপাতালের মর্গে। ২৪শে অক্টোবর বিএল কলেজের একজন ছাত্রী যিনি ২০শে সেপ্টেম্বর '৯৩ উপলক্ষে "রক্তের আখরে" নামক একটি কাব্য গ্রন্থ লিখেছেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। তিনি বললেন, কাশেম ভাইকে আমি চিনতাম কলেজে। অনেক দিন আগ থেকে তার সঙ্গে কথা হয়েছে। তবে তাকে আমার স্মৃতিতে ধরে রাখার মত ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, 'জাকির-রহিম-কাশেম' পরিষদের মিছিল দেখছিলাম আমরা কয়জন বান্ধবী মিলে। তখন দেখেছিলাম হাত উঁচু করে মিষ্টি মিষ্টি হাসিতে-মিছিল চলাকালে কাশেম ভাইয়ের Atitute আর মুক্তি মজুসদার ম্যাডাম যে দিন ক্লাস ক্যাম্পিং করতে না দেওয়ার জন্য অভিনব কায়দায় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তার মনের কথা উপস্থাপন করার প্রক্রিয়া। তিনি আরো বললেন, 'কাশেম ভাই বি.এল. কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন বলে আমার ধারণা।'

গত ২৮শে অক্টোবর'৯৪ শুক্রবার জুম্মার নামাজ পড়েছিলাম বি.এল. কলেজ মস্‌জিদে সেখানে কলেজের অধ্যক্ষের পক্ষ থেকে কাশেম ভাইয়ের রুহের মাগফেরাত কামনার জন্য দোয়া মোনাজাতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানে দেখেছিলাম ষ্টাফ সহ সকল শিক্ষকদের। আমার মনে হয় তারা সরকার দলীয় গুণ্ডাদের ভয়ে সামনে আসতে পারছে না।

আমি গিয়েছিলাম ২৪শে অক্টোবর দু'পুরের পর বসুপাড়া কবরস্থানে। সেখানে দাফন কাজ শেষ হবার পর সাধারণ জনতা, এলাকাবাসী, আত্মীয় স্বজনসহ শিবির কর্মীদের যে আহাজারি দেখেছিলাম তাতে আমার মনে হয় কাশেম ভাই বেহেশতের আঙিনায় পৌঁছে গেছে তার বন্ধুদের রেখে। কাশেম ভাই সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে যা বলা দরকার তা অন্যদের ভাবধারা বা মানসিক অবস্থা বিচার করার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করছি। তবে কাশেম ভাই মারা যাবার ঘন্টাখানেক পূর্বে দৌলতপুরে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখনকার মুখের প্রকৃতি আমার চোখের সামনে ভাসছে। মনে হচ্ছিল তিনি যেন কর্মীদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য পাগল। কাশেম পাঠান ভাই কেমন ছিল তা জোরাল ভাষায় প্রচার করার প্রয়োজন পড়ে না, শুধু বলতে হবে যারা তাকে খুন করেছে তাদের হৃদয় কি একবারও কেঁপে ওঠেনি। তাদের মনে কি মানবিকতার ছোঁয়া একটুও ছিল না। প্রশাসনের কি খুনিদের গ্রেফতার করার মত যোগ্যতা নাই? আমরা সাধারণ মানুষেরা বুঝতে পারছি না! এখানে কোন অস্পর্শ বাধা কাজ করছে যার জন্য খুনিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খুনিরা কি আসলে পেশাদার খুনি যাদেরকে পরবর্তীতে প্রশাসনের কাজে লাগানোর জন্য সতেজ ও সজীব রাখা হচ্ছে? শক্তি ধরেরা একবার চিন্তা করে দেখবেন-কাল সাপ কখনো দুধ-কলা দিয়ে পোষা যায় না।

লেখক ঃ সাবেক ভি.পি. দৌলতপুর দিবা-নৈশ কলেজ, খুলনা।

www.icsbook.info

কারাগারে শুনি যার নাম

মুহাম্মদ আলমগীর হোসাইন

পৃথিবীতে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব আছে যাদের চরিত্রের মূল্যায়ন তাদের উপস্থিতিতে বুঝা কষ্টকর। এ সুন্দর ভুবন যখন ছেড়ে ওপারে পাড়ি জমায় তখন বেরিয়ে আসে তাদের জীবন চিত্র মানুষের মাঝে। দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে তাদের কর্মময় জীবনের বহুরূপী চিত্র। এ জন্য কথা প্রসঙ্গে আমরা বলি, "কারও সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় জীবিত অবস্থায় নয়, যখন সে মারা যায়"। ঠিক তদ্রুপ দিনের পাতা যতই উল্টাই ততই পরিস্ফুটিত হচ্ছে আমাদের দৃশ্যপটে গণনেতৃত্বের অধিকারী আমার সহযোদ্ধা প্রিয় ভাই আবুল কাশেম পাঠানের জীবন চিত্র। দিন গড়িয়ে যাচ্ছে আর বেরিয়ে আসছে তার বহু প্রতিভাপন্ন জীবনেতিহাস। তার সুনাম শুনেছি প্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বি.এল. কলেজের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের স্মৃতির পাতা থেকে, প্রতিবেশী ও শহরের সাধারণ মানুষের মাঝ থেকে। বিশেষ করে মনে পড়ছে শাহাদাতের পর আমরা যখন শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্কুলগুলোতে ধর্মঘটের জন্য গেলাম তখন কাশেম ভাইয়ের নাম নিতে নিতেই ছোট ছোট ছাত্র ভাইয়েরা বেরিয়ে আসল, তারা বলল আমাদের পাঠান ভাই, কেউ বলল কাশেম ভাই, কেউ বলল সিটি কলেজের সামনে হারিয়ে যাওয়া জিএস কাশেম ভাই এভাবে সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্লাস বর্জন করল। তাদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল কাশেম ভাই যেন তাদের কত দিনের চেনা। তিনি ছিলেন ছোটদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব এর প্রমাণ পেয়েছি যখন আমি স্কুল শাখার দায়িত্ব পালন করেছি। তখন তাকে সাথে করে যে সকল স্কুলে গিয়েছি সেখানেই দেখেছি তার প্রতি সাধারণ ছাত্র বন্ধুদের ভালবাসা।

www.icsbook.info

অর্থাৎ ১৯৯৪ সালের ২৩শে অক্টোবর দ্বিপ্রহরের পূর্বক্ষণে সিটি কলেজের পিচঢালা পথে হায়েনার হাতে শহীদ হওয়ার পরে তার সম্পর্কে বেশি কিছু অবগত হওয়া সম্ভব হয় নাই কেবল এ মুহূর্তটা কেটেছে আমার কারা অভ্যন্তরে। কারা অভ্যন্তরে থেকেও আমি যেদিন শুনেছিলাম কারাবন্দীদের মুখে শহীদ কাশেম ভাইয়ের প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসার কাহিনী। সঙ্গত কারণেই আমি দীর্ঘদিন কারা অভ্যন্তরে তার যে নাম শুনেছি সেটাই হবে আমার লেখার বিষয়বস্তু।

খুলনা জেলা কারাগারের অধিকাংশ কারাবন্দী দক্ষিণাঞ্চলের থানা থেকে আগত। কাশেম ভাইকে আমি সাধারণতঃ শহরের সন্তান হিসেবে, শহর কেন্দ্রিক তার সুনাম মূল্যায়ন করেছি কিন্তু কারাগারের মধ্যে গিয়ে আমার সম্পূর্ণ ধারণা পাল্টে যায়। আমি কখনও বুঝতে পারিনি যে আমাদের কাশেম ভাই এই তিলোত্তমা শহর থেকে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের হৃদয়ের মাঝে রেখাপাত করবেন। কারা অভ্যন্তরে দক্ষিণ খুলনার কারাবন্দীদের কাছ থেকে যখন কাশেম ভাইয়ের কথা শুনছিলাম তখন মনে হচ্ছিল কাশেম ভাই যেন তাদেরই এলাকার সন্তান। কাশেম ভাইকে মাঝে মাঝে শহর থেকে বাইরে যেতে দেখতাম বিশেষ করে পারিবারিক ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে খুলনা দক্ষিণ এলাকাগুলোতে। এবং এক নাগাড়ে বেশ কিছুদিন অবস্থানও করতেন। এই সুবাধে তিনি দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের বেশ মনের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেই এলাকায় গিয়ে তিনি কিভাবে মিশতেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের সাথে? অনেক সময় তিনি সেখানে নেতৃত্ব দিয়েছেন অবৈধ ঘেরব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের হয়ে। নিজের ব্যবসার পাশাপাশি তিনি আর্থিক সাহায্য দানে ভাগ্য ফিরিয়ে এনেছেন এমন বন্দীদের সাথে কথা হচ্ছিল। বন্দী জীবনের মানুষের মাঝে তিনি যেভাবে জুড়ে ছিলেন তা শুনে আমি অবাক হলাম। একজন আলেম যিনি কারা অভ্যন্তরে ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি কাশেম সম্পর্কে বললেন, '১৯৯০ সালের দিকে আমি পারিবারিক মামলায় এখানে বাইরের জগতে কয়রা থানায় গ্রামের শুধু পরিচয় হয়েছিল কাশেম ভাইয়ের সাথে তারপর এই কারা অভ্যন্তরে দেখে গেছেন যা আমার কোন নিকটাত্মীয়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি।'

এভাবে কারা অভ্যন্তরে শুনছিলাম কাশেম ভাইয়ের সাথে গড়ে ওঠে সাধারণ মানুষের সখ্য। সেখানে দীর্ঘ ১৮০ দিনের মাঝে গড়ে ওঠেছিলো জীবনে শিবিরের পরিচয় প্রদানে যত না পরিচিত হয়েছি তার চেয়ে বেশি পরিচয় লাভ করেছি শহীদ কাশেমের সঙ্গী হিসেবে। মাঝে মাঝে শিবির নেতাদের ওয়ার্ডগুলোতে ভিড় জমতো তার সম্পর্কে উৎসুক জনতার। অনেক সময় কারা কর্মকর্তাদের সাথেও আলাপ হতো শহীদ কাশেম সম্পর্কে। সেখানেও দেখেছি জি.এস. কাশেমের ভাইয়ের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ।

এজন্য শুধু কলেজ ক্যাম্পাস, মহল্লা ও সাথীদের মাঝেই তিনি অম্লান নয় তিনি এখনও স্মৃতিতে অম্লান আছেন কারাবন্দীদের হৃদয়ে হৃদয়ে।

লেখক ঃ সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, সরকারি আযমখান কমার্স কলেজ খুলনা।

www.icsbook.info

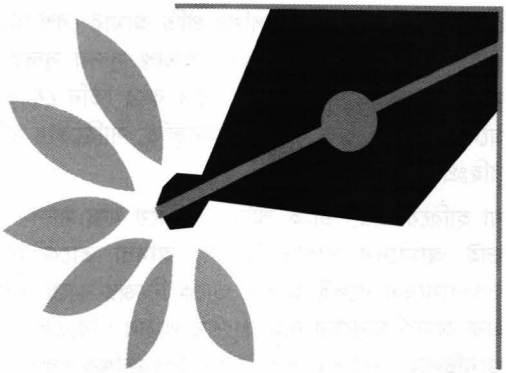

স্মৃতির সৈকতে দাঁড়িয়ে

কাজী মেহেদী হাসান সুজন

শহীদ আবুল কাশেম পাঠান ভাইয়ের সঙ্গে বি.এল. কলেজের হাজী মহসীন হলের ৩০৬ নম্বর কক্ষে প্রথম পরিচয়। সে কক্ষে থাকতেন আরেক শহীদ, হালিম ভাই। এই রুমেই আমি কাশেম ভাইয়ের কাছে গিয়ে পরিচয় দিলাম। কাশেম ভাই জড়িয়ে আদর করেছিলেন আমাকে। পরদিন বি.এল. কলেজের গেটে আমার সাথে তাঁর দেখা। আমাকে দেখেই অত্যুজ্জ্বল হাসিতে ভরা মুখ নিয়ে আমাকে বললেন "আরে সুজন, কেমন আছ?" কি মায়াবী কণ্ঠস্বর! কি উচ্ছ্বাস! মনে হল তিনি আমার কত দিনের চেনা, এক নিবিড় আত্মীয়তায় বাঁধা রয়েছি আমরা।

কয়েকদিন পরেই ছিল একাদশ শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা। নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষা শেষে কাশেম ভাইয়ের সাথে দেখা করলাম। 'পরীক্ষা কেমন হলো?' জানতে চাইলেন তিনি।

"আল্লাহর ইচ্ছায় ভালই হয়েছে" আমি বললাম।

চান্স পাবে তো?

ইন্‌শাআল্লাহ চান্স পাব।

"মনে হয় না।"

মুখের ভেতর চাপা হাসি নিয়ে চলে গেলেন তিনি। আমার বেশ দুঃখ লাগল। কাশেম ভাই আমাকে এভাবে বলতে পারলেন? পরে জানলাম, অন্যদের কাছে তিনি বলেছিলেন "সুজন অবশ্যই চান্স পাবে।" রাসূল (সাঃ)-এর একটি হাদীসকে তিনি আমার বেলায় প্রয়োগ করে, আমাকে ভালবেসে গেলেন। জীবনের অতি ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে এভাবেই কাশেম ভাই ইসলামের কথাগুলো মেনে চলেছেন।

www.icsbook.info

ছোটবেলা থেকেই লেখালেখির প্রতি আমার বেশ আগ্রহ। প্রায়ই আমার তৈরি করা পান্ডুলিপি তিনি পড়তেন এবং অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর পরামর্শ দিতেন। আমার মত সামান্য এক কর্মীর পাণ্ডুলিপি পাঠ করে তিনি যে উদারতা দেখিয়েছেন, এটা তার মনের আলাদা এক জগতের অনুভূতি, সাহিত্যের প্রতি স্বভাবসুলভ ঐকান্তিকতারই বহিঃপ্রকাশ।

যা হারিয়ে যায়, তা-ই স্মৃতি। হারিয়ে যায় সম্পদ। অসম্পদ হারায় না। কাশেম ভাই আমাদের সম্পদ ছিলেন, আমরা তাকে হারিয়ে ফেললাম। আল্লাহ খুব ভালবাসতেন বলেই আল্লাহ তাকে নিজের কাছে নিয়ে নিলেন। সুন্দর স্বভাবে ভরা এক আদর্শ মানুষের নাম কাশেম পাঠান। বি.এল. কলেজে পড়ার আগেই যার নাম শুনেছিলাম। কাশেম ভাই ছিলেন কিংবদন্তির পুরুষ। কল্পনার কাশেম ভাইয়ের চেয়ে বাস্তবের কাশেম ভাই ছিলেন আরো বেশি সুদীপ্ত। এজন্য স্মৃতির পাতা উল্টাতে গেলেই হোঁচট খেতে হয়, প্রতি পদে পদে যেন পিছিয়ে যাচ্ছি আমি।

শাহাদাতের আগের দিন, অর্থাৎ ২২শে অক্টোবর '৯৪ বি.এল. কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা। সকাল ৯টা। আমি দৌলতপুরে পড়তে গিয়েছিলাম। পথে কাশেম ভাই-এর সাথে দেখা। বললেন "আজ থাকতে হবে"। আমি বাসা থেকে নাস্তা করে আসতে চাইলাম। তিনি বললেন "না, আমার সাথে যাবে।" কিন্তু কাজের চাপে আমাকে নিয়ে যেতে পারেননি কাশেম ভাই। দুপুরে সবার জন্য খাবার ব্যবস্থা হল পাউরুটি এবং কলা। আমি খাচ্ছি, এমন সময় কাশেম ভাই একটি অতিরিক্ত কলা আমার হাতে দিলেন এবং বললেন, "সকালের কাফ্ফারা"। "এত কমে কাফ্ফারা আদায় হয় না" আমি উত্তর দিলাম। "ঠিক আছে অন্য একদিন কাফ্ফারা আদায় করে দেব" বলে হাসতে হাসতে চলে গেলেন তিনি। এরপর কাশেম ভাইয়ের সাথে আমার আর কোনদিন কথা হয়নি। তিনি যে অন্য দিনের কথা বললেন, সেটা হয়ত বেহেশতের কোন একটা দিন। আমি সে দিনের অপেক্ষাতেই আছি।

কাশেম ভাইকে হারানোর বেদনা ভুলবার নয়। দুঃখের কাল-কাপড়ে আমাদের হৃদয় আবৃত। মনের ভিতর থেকে নিস্তব্ধ কান্নার শব্দ শুনি-

আর কোনদিন আমি শুনিব না সে কথা
দেখিব না কোনদিন সে হাসি আর
অপূর্ণ জন্ম আমার হারানোর বেদনায়
যাকে আমি চিনতাম, এখনও চিনি
স্মৃতির সৈকতে দাঁড়িয়ে,
আজও যে তাকে খুঁজি।

লেখক ঃ সাবেক সাথী, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

www.icsbook.info

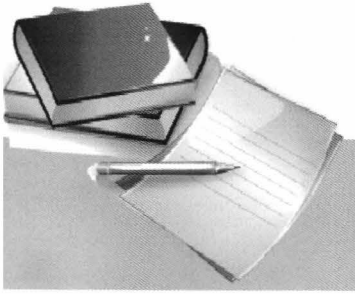

শহীদের ডায়েরি থেকে

(শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম)

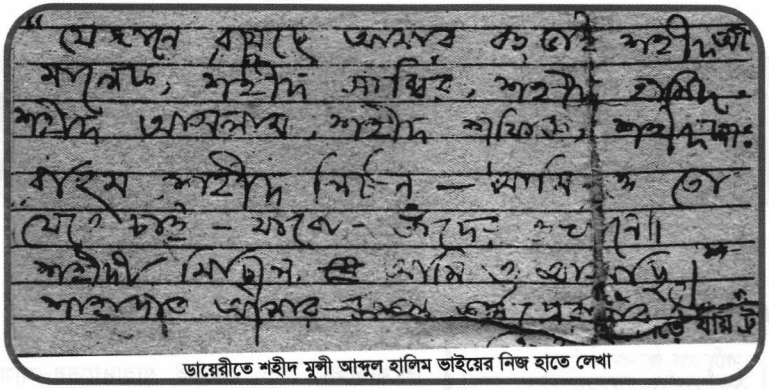

ডায়েরীতে শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম ভাইয়ের নিজ হাতে লেখা

মুন্সী আব্দুল হালিম এক অবিনাশী আত্মা। যিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এবং জিন্দাদিল মুজাহিদ। মর্যাদা তিনি শাহাদাতের আকাঙ্খা করতেন। তিনি বুঝতেন, শহীদি মৃত্যুর মর্যাদা অনেক অনেক বেশি। আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে হলে শহীদ হওয়ার বিকল্প নেই। তিনি তার সকল কর্মপ্রেরণার উৎস হিসেবে শাহাদাত কে মনে করতেন। শাহাদাতের তামান্না নিয়েই তিনি ক্যাম্পাস করতেন। তাই তো তিনি বাতিলের সকল রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে বি.এল. কলেজ ক্যাম্পাসে বীরের মত চলাফেরা করতেন। শাহাদাতের পর তার ডায়েরির পাতায় আমরা তার সে তীব্র আকাঙ্খার প্রতিফলন দেখতে পেয়েছি। তিনি তার ডায়েরিতে লিখেছেন ঠিক এভাবেই-

শাহাদাত আমার সকল কর্মপ্রেরণার উৎস ঃ

যেখানে রয়েছে আমার বড় ভাই শহীদ আব্দুল মালেক, শহীদ সাব্বির, শহীদ হামিদ, শহীদ আসলাম, শহীদ শফিক, শহীদ আব্দুর রহিম, শহীদ লিটন- আমিও তো সেখানে যেতে চাই- যাবো তাদের ওখানে।

শহীদি মিছিলে আমিও আসছি।

শাহাদাত আমার সকল কর্মপ্রেরণার উৎস।

www.icsbook.info

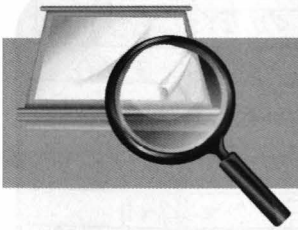

শহীদের ডায়েরি থেকে

(শহীদ আবুল কাশেম পাঠান)

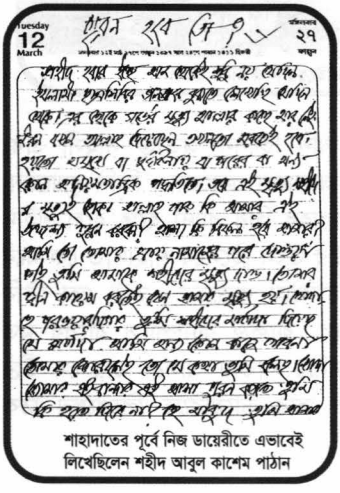

Tuesday 12 March ২৭

পূরণ হবে তো?

শাহাদাতের পূর্বে নিজ ডায়েরীতে এভাবেই লিখেছিলেন শহীদ আবুল কাশেম পাঠান

শহীদ আবুল কাশেম পাঠান এক জিন্দা শহীদ। যখন থেকে শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে বুঝতে শিখেছিলেন তখন থেকেই শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করার জন্যে ছিলেন ব্যাকুল তার সেই বাসনা লালন করতেন অতি সংগোপনে। শাহাদাতের পরে তার ডায়েরির পাতায় পাতায় আমরা তার সে তীব্র আকাংখার প্রতিফলন দেখতে পেয়েছে। নিম্নে তার ডায়েরির কিছু অংশ তুলে ধরা হলো। '৯১ সালের ১২ই মার্চ ডায়েরিতে লিখেছেন এভাবে।

পূরণ হবে তো?

শহীদ হবার ইচ্ছে আজ থেকেই শুধু নয় যেদিন ইসলামী ছাত্রশিবির বুঝতে শিখেছি সেদিন থেকে। এর থেকে গর্বের মৃত্যু আল্লাহর কাছে আর নেই। জীবন যখন আল্লাহ দিয়েছেন-তখনতো মরতেই হবে। হয়ত বা অসুখে বা দুর্ঘটনায় বা অন্য কোন অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। তবে এই মৃত্যু শহীদের মৃত্যুই হোক। আল্লাহ পাক কি আমার এই উদ্দেশ্য পূরণ করবেন? আশা কি বিফল হবে আমার? আমি তো তোমার প্রায় নামাজের পর দোয়া চাই তুমি আমাকে শহীদের মৃত্যু দাও। তোমার দ্বীন কায়েম করতেই যেন আমার মৃত্যু হয়। খোদা হে পরওয়ারদেগার তুমি

www.icsbook.info

শহীদের মর্যাদা দিয়েছ যে মর্যাদা আমি অন্য কোন কাজে পাব না। তোমার কুরআনেই তো তুমি সে কথা বলেছ। খোদা তোমার এই বান্দার এই আশা পূরণ করতে তুমি কি হতে দিবে না? হে মাবুদ তুমি আমার এই ছোট আশাটি পূরণ নিশ্চয়ই করবে। তোমার তো এতে কোন ক্ষতি হবে না। কোন কিছু তোমার কমবে না তবে কেন তুমি এই প্রথম এবং শেষ আমার আশাটি মিটাবে না। তুমি স্পষ্টভাবেই জান এর মধ্যে দুনিয়া হাসিলের কোন ইচ্ছা আমার নেই। শহীদ হলেতো এই একটিই ইচ্ছা তা হল তোমার দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করে যাওয়া বা চেষ্টা আর তোমার দিদার লাভ করা।

খোদা তুমি আমার এই ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ করবে-করতেই হবে। তুমি নাকি খোদা দয়ালু। তোমার কাছে আবেদন করে যদি পূরণ না হয় তবে তুমি দয়ালু হলে কি ভাবে? দুনিয়ার কোন স্যারের কাছে দরখাস্ত করলে সমস্যা থাকা সত্ত্বেও গৃহীত হয়। আর তুমিতো তাদের থেকেও সীমাহীন দয়ালু। তবে কেন আমার এই দরখাস্ত তুমি মঞ্জুর করবে না?

৪ঠা মার্চ তিনি লিখেছেন এভাবে ঃ প্রত্যেকটি মানুষের মৃত্যু হবেই

'মৃত্যু' এমনই একটি বিষয় যা প্রত্যেকটি জীব-জানোয়ার, মানুষ যে হোক মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান, জৈন বিশ্বাস তার করতেই, করতেই হচ্ছে-মৃত্যু হবেই। এককথায় ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সবাই স্বীকার করে মরতে হবেই। তাহলে পৃথিবী নামের এই ক্ষণিক মরীচিকার পিছনে কেন আমরা এভাবে ধাবিত হচ্ছি? কেন এমন মারামারি রাহাজানি হত্যা ছিনতাই! আমাদের এখনো ভেবে দেখবার সময় আছে। মৃত্যুর পর মানুষের সাথে শুধু একটি জিনিসই যাবে তার সাথে তাহল তার আমলনামা। কাজকর্মের এই ফলের দিকে তাই আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। খোদা আমাকে মাফ কর।

পহেলা জানুয়ারি '৯১ সালে তিনি যা লিখেছেন তাতে জাতীর প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে তিনি লিখেছেন-

ভিন জাতির সংস্কৃতি হলেও সামাজিক অবস্থার কারণে জীবনের প্রথম আত্মস্মৃতি ধরে রাখার প্রায়াসে এই সাল থেকেই শুরু করতে হচ্ছে। স্বীয় আচার-আচরণ যখন বিদেশী সাহিত্য সংস্কৃতির কাছে বন্দী তখন হাত গুটিয়ে বসে না থেকে এর জন্য কিছু একটা করার চিন্তা-ভাবনা করা দরকার যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়।

আজ সত্যই জীবনের প্রথম একটি ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটে গেল। নতুন বছর শুরু বলে নয় ২৭ তারিখের তাফসীর মাহফিলে হামলার উদ্দেশ্যে আগত শত্রুদের পেয়েও ছেড়ে দিয়ে আমি স্বীয় সংগঠনের কাছে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে আজ সেই বাবলুই ডেকে আমাকে আমার কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাল বলল- 'জীবনে যদি পারি তোমার জন্য কিছু করবো।' যদিও এতে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থই রয়েছে। কিন্তু আমি তা চাইনি। আমি চেয়েছি সে উদারতা দেখে আমাদের সংগঠনে আসুক- তার বদলে সে আমাদের নিরীহ ছেলেদের মেরেছে।

www.icsbook.info

৪ঠা জানুয়ারি তিনি লিখেছেন

২৭শে ফেব্রুয়ারি নির্বাচন ঃ মুসলিম হিসেবে এক অস্তিত্বের প্রশ্ন।

আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারির নির্বাচন মুসলিম হিসাবে এক অস্তিত্বের প্রশ্ন। '৭১ এ দেশের জনগণ অধিকারের জন্য লড়াই করেও সে অধিকার তারা আজ পর্যন্ত ফিরে পায়নি। ৭২ থেকে ৭৫ এর সরকার তাদের আশ্বাস পূরণের পরিবর্তে দেশে শান্তরক্ষার নামে ব্যক্তিগত বাহিনী গড়ে তোলা হয়। যাদের কাজ ছিল ক্ষমতাসীন দলের বিরোধীদের নাজেহাল। প্রতারণা, জখম প্রয়োজনে হত্যা করা। যার ফলে তাদের দলে ভেড়ানো সম্ভব হয়নি মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী এমন ১০,০০০ সূর্য সন্তানকে হত্যা করা হয়। নিষিদ্ধ করা হয় ইসলামের নামে সকল রাজনৈতিক কার্যকলাপ। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা শুরু হয় সর্বত্র। কবি নজরুল ইসলাম হলের নামে ইসলাম কেটে ফেলা হয়। এমনকি ঢা.বি. মনোগ্রাম থেকে কোরানের পবিত্র আয়াত মুছে ফেলতে তারা দ্বিধা করেনি। শুধু ধর্মের উপর গাত্রাঘাত করেই তাদের আকাংখা মেটেনি। যে নেতা একদিন পাকিস্তানি শাসক-শোষকদের না খাইয়ে মেরে ফেলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি করতে না পারলেও তা বাঙালী ভাইদের উপর কাটায় কাটায় প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। বাসন্তী নামের মেয়েটি তার লজ্জাস্থাটি পর্যন্ত ঢাকবার কাপড় খুঁজে পায়নি। দেশকে ৫০ পয়সা দরে চাল, ডাল খাওয়ানোর ওয়াদা করা হলেও আদৌ পালন সম্ভব হয়নি। শুধু বড় বড় বুলিই তাদের কাছে থেকে গেছে এখনো যাচ্ছে। জানি না বাংলার মানুষরা তাদের সেই গাল ভরা বুলিতে আবার ভিজে যাবে কিনা? যেতেও পারে কেননা যে সমস্ত লোকদের বড় বড় (আমলা) লোকদের পারমিট দেয়া হয়েছে তারাতো এখনো আছে। নুন খেয়ে একটু গুন না গাইলে কেমন হয়ে যায়। তাই ১৯৯৫ থেকে '৮১ হয়েছে তারাতো এখনো আছে। নুন খেয়ে একটু গুণ না গাইলে কেমন হয়ে যায়। তাই ১৯৯৫ থেকে '৮১ পর্যন্ত সরকার পূর্বতন সরকার থেকে স্বাধীনচেতা, বলিষ্ঠ, উদার হলেও পরবর্তিতে ক্ষমতার মোহ তাকেও ঘিরে ধরেছিল। তদুপরি আমলাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত এই সরকার বিতর্কিত বহু ভূমিকা গ্রহণ করে। গ্রাম সরকার, খালকাটা, ভোট ডাকাতি, সারাদেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি, নীরু, অভি, ইলিয়াস, বাবলুর মত প্রতিভাবান ছাত্রদের অস্ত্র দিয়ে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস কায়েম করা, ক্ষমতার শেষ দিকে ইসলামী দলগুলির প্রতি কুদৃষ্টি দেয়া সবকিছু ছিল তার স্পষ্ট ভুল। যার দরুন তার দলকে পরবর্তিতে চরম মাশুল দিতে হয়েছে---হচ্ছে!

www.icsbook.info

শহীদের পরিবারের প্রতিক্রিয়া

www.icsbook.info

আমার সন্তানের চেয়ে ওদের ভাই হারানোর বেদনাই বেশী

শহীদ বিমানের পিতা

আমি বুঝতে পারিনি আমার বিমান ইসলামের পথে এতো এগিয়ে গেছে।' আজীবন আওয়ামী লীগের একজন নিবেদিত কর্মী, টুঙ্গিপাড়ায় শেখ পরিবারের সন্তান শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমানের পিতা শেখ মুহম্মদ ইদ্রীস কান্নাজড়িত কণ্ঠে একলা বলেন। তিনি বললেন স্কুলজীবন থেকেই বিমানের ব্যক্তিগত জীবনে নামায, সততা ও ইসলামের প্রতি আগ্রহ ছিল। পরিবারে আমরা নিজেরা নিয়মিত নামায রোজা না করলেও বিমানকে আমি কখনো নামায ক্বাজা করতে দেখিনি। তখনও বুঝিনি এর কি কারণ। সে শুধু নিজেই নামায পড়তো না আর বন্ধুদেরকেও এ পথে ডাকতে দেখেছি। যখন আমি জানলাম ও ইসলামী ছাত্রশিবিরে যোগ দিয়েছে তখন তাকে এ পথ থেকে ফেরানোর বহু চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার বিমানকে শত চেষ্ট করেও এ পথ থেকে ফেরাতে পারিনি। শিবিরকে আর দু'পাঁচটি রাজনৈতিক সংগঠনের মতোই মনে করে আমি তাকে এ পথ থেকে ফেরানোর চেষ্টা করেছি।

এস.এস.সি তে প্রথম বিভাগে পাস করার পর আমি তাকে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হতে বলেছিলাম। জবাবে বলেছিলো অবৈধ আয়ের উপর নির্ভরশীল কোন পেশায় সে জড়িত হতে রাজি না। এজন্যই পলিটেকনিকে তাকে ভর্তি করা যায়নি। কলেজে ভর্তি হয়ে যখন সে শিবিরের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলো তখন তাকে শিবির থেকে ফেরানোর জন্য বললাম 'তুই যদি ছাত্রলীগে যোগদান করিস তাহলে তোকে ছাত্রলীগের জেলা সভাপতি করার ব্যবস্থা করে দেব।' জবাবে জানালো– সে লাইসেন্স– পারমিটের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়।

www.icsbook.info

আমরা টুঙ্গিপাড়ার শেখ পরিবারের সন্তান। আমাদের অস্তিত্বের সাথে আওয়ামী লীগ জড়িত। এই বিমান ও স্কুল জীবন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ বা শেখ পরিবারের কারো সমালোচনা সহ্য করতে পারতো না। কিন্তু জানি না কোথা থেকে কি হয়ে গেল। আমার ছেলে বিমান আবেগ দিয়ে নয় যুক্তি দিয়ে আওয়ামী লীগ এবং শেখ পরিবারের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় তুলতো। এ নিয়ে ওর ছোট ভাইয়ের সাথে প্রায়শই কথা কাটাকাটি হত। এক কথায় পরিবারের সকলের সাথে তার আদর্শহত পার্থক্যের কারণে একটা মানসিক দ্বন্দ্ব লেগেছিল। তবে তাকে কখনও মুরুব্বিদের সাথে বেয়াদবি করতে দেখিনি। তাকে দেখলে বা আলাপ করলে মনে হত ইসলামও ইসলামী ছাত্রশিবিরের কাজের জন্যই যেন আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন।

দিনের অধিকাংশ সময় সে বাইরে থাকতো। সাধারণত রাতেই বাসায় ফিরতো। কোন দিন ফিরতোও না জিজ্ঞেস করলে কোন জবাব পাওয়া যেত না।

বিমানকে নতুন লুঙ্গি, শার্ট কিনে দিলে কিছুদিন পর তা আর পরতে দেখা যেত না। জিজ্ঞেস করলে চুপ থাকতো। পরে জানা যেত কাউকে দিয়ে দিয়েছে। আমার বাসা হাসপাতালের সামনে হওয়ায় প্রায়ই চিকিৎসার জন্য আসা রোগী বা রোগীদের আত্মীয় স্বজনদের খাওয়ানোর জন্য বাসায় নিয়ে আসতে দেখতাম। ব্যক্তিগতভাবে আমি হাঁপানীর রোগী। একদিন রাতে আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। সে রাতে বিমান বাসায় ফেরেনি। সকালে আসলে তাকে অসুস্থতার কথা বলায় সে বিমর্ষ হয়ে যায়। পরের দিন থেকে রাতে তার জন্য রেখে দেওয়া ঠাণ্ডা খাবার খেয়ে আমার সুস্থতার জন্য নফল রোজা রাখা শুরু করে। অবশ্য এসংবাদ আমি পরে জেনেছি।

শৈশব থেকে বিমান খুব রাগী ছিল। তার মতের বিপরীত কোন কিছুকেই সে সহ্য করতে পারতো না। কিন্তু শাহাদাতের কয়েক মাস পূর্ব থেকে লক্ষ্য করেছি রাগের পরিবর্তে ধৈর্য ও সহনশীলতা ওর চরিত্রে ফুটে উঠেছে। ওকে দেখতাম যুক্তিতর্ক দিয়ে ওর থেকে বয়সে প্রবীণদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝাতে সক্ষম হতো। বিমান যেদিন শহীদ হয় সেদিন ইফতার করে বাসায় বিশ্রাম করছিলাম তারাবী পড়তে যাবো এমন সময় হঠাৎ করে কারা যেন খবর দিয়ে গেল বিমান Accident করে হাসপাতালে এসেছে। আমি বাদে বাড়ির সবাই দৌড়ে হাসপাতালে ছুটে যায়। তখন আমি বাড়িতে একা। অনেকক্ষণ যাবৎ কেউ ফিরে আসছে না দেখে আমিও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। এমন সময় ওর বড় বোন এসে Accident মারাত্মক নয় বলে জানায়। কিন্তু সবাই না ফিরে আসতে আমার একথা বিশ্বাস হয়নি। তখন নিজেই হাসপাতালে চলে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি আমার বিমান অচেতন অবস্থায় মাথায় রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ নিয়ে শুয়ে আছে। কেন জানি আমার মনে হলো ও বোধ হয় আর আমাকে আব্বা বলে ডাকবে না। ইতোমধ্যে ডাক্তারদের সাথে আলাপ করে এ

www.icsbook.info

বিষয়ে আমার ধারণা আরোও দৃঢ় হলো। এর মধ্যেই হাসপাতালে ও সঙ্গীদের ভিড় জমে উঠেছে। তাদেরই একজন রাশেদের দেয়া রক্ত ওর শরীরে চলছিল। কিন্তু সব চেষ্টা বিফল করে দিয়ে রাত ১২-০৫ মিঃ আমার বিমান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেল। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন।

সারারাত ধরে ওর বোন এবং শিবিরের ছেলেদের বিলাপ ধ্বনি আমাকে নির্বাক করে দিয়েছিল। শিবিরের ছেলেদের কান্না দেখে আমর মনে হচ্ছিল আমার সন্তান হারানোর বেদনার চেয়ে ওদের ভাই হারানোর বেদনাই বেশি। সকালে ওর শত শত সঙ্গীরা ওদের শহীদ বিমান ভাইয়ের লাশ পোস্ট মর্টেমের জন্য পুলিশকে নিতে বাধা দিল। কারণ ওরা ওদের সঙ্গীর লাশের অবমাননা হতে দিতে চায় না।

পরে নেতাদের হস্তক্ষেপে ওরা শান্ত হয়। জানাজার জন্য দিনভর প্রখর রৌদ্রে অপেক্ষমাণ বিমানের হাজার হাজার সাথীর সামনে আবেগ জড়িত কণ্ঠে শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমানের পিতা বললেন, "বিমান হারিয়ে যাওয়ায় আমি শোকাহত কিন্তু বিমানের হাজারো সাথীর মাতম দেখে আমি শোক প্রকাশ করতে পারছি না। বিমানকে হারালেও তোমরাই আমার সন্তান। তোমাদের মাঝেই আমি ওকে খুঁজে পেয়েছি।" জানাজার পর কলেমা শাহাদাৎ উচ্চকিত শহীদের কফিনবাহী মিছিল দেখে শহীদের পিতা বললেন, "জানালায় তো এতো লোক দেখিনি সবাই যেন একই উচ্চতার একই পোশাকের একই চেহারা আমার দৃঢ় বিশ্বাস শহীদের লাশের সাথে এরা আল্লাহর ফেরেশতা।"

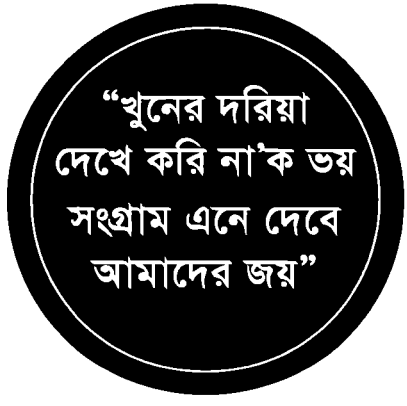

www.icsbook.info

শোক যেন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মদদ জোগায়

শহীদ হালিমের পিতা

জনাব মুন্সী মোহাম্মদ মহানগরী খুলনার উপকণ্ঠে দামোদর গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত বাসিন্দা। ব্যক্তিগত কর্মজীবনে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এই বর্ষীয়ান মানুষটি গ্রামের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। সন্তানদের মানুষ করার ক্ষেত্রে অন্যন্য সাফ্যলের অধিকারী এই বয়ঃবৃদ্ধ পিতার সাফল্যের মুকুটে আরও একটি অমূল্য রত্ন সংযুক্ত হয়েছে। তাহলো তিনি একজন শহীদের গর্বিত পিতা হিসাবে অভিষিক্ত হয়েছেন। আর যার কারণে আজ তিনি সবার পিতার মর্যদায় সমাসীন হয়েছে তিনি খুলনার ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের আকাশ থেকে অকালে ঝরে যাওয়া উজ্জ্বল নক্ষত্র শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম। অত্যন্ত প্রাণ খোলা ও সদালাপী এই পিতা সন্তান হারানোর বেদনায় কাতর হলেও বাংলাদেশে তথা বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্যে যে পরমর্শ দিয়েছেন তা যে কত যুক্তিনির্ভর এবং সময়োপযোগী তা সহজেই অনুমেয়। তার কথায় সন্তান হারানোর ব্যথার চেয়ে ইসলামী আন্দোলনের জন্যে তার পেরেশানিই মূর্ত হয়ে উঠেছে অধিক মাত্রায়। তিনি বলেন, "বর্তমান বিশ্বে ইসলামের বিরুদ্ধ যে ষড়যন্ত্র চলছে তাতে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের তাদের শহীদদের কথা মনে করে শোকাভিভূত হলে চলবে না। বরং শোক যেন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মদদ জোগায় সেদিকেই খেয়াল রাখতে হবে। ইয়াকীন দৃঢ় রাখতে হবে। তবেই সফলতা আসবে।"

তিনি বলেন "হালিম ছিল অত্যন্ত বিচক্ষণ ছেলে। রমজান মাসে ইফতারির জন্যে যে আজান দিত তা আমরা তন্ময় হয়ে শুনতাম। তার আজান শুনে গ্রামের লোকেরা ইফতারি করতো।"

শহীদ হালিম ভাইয়ের স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রফুল্ল কুমার চট্টোপধ্যায় ও সহকারী শিক্ষক সন্তোষ কুমার বিশ্বাস তাদের ছাত্রের জন্যে গর্ব অনুভব করেন। তারা বলেন সত্যবাদী ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন ছাত্র ছিল হালিম আমরা তার জন্যে গর্বিত।

www.icsbook.info

ছাত্রশিবিরের সব ছেলেই আমার ছেলে

শহীদ আমানের মা

শহীদ আমানুল্লাহ আমান ভাইয়ের বিধবা মা মোসাম্মৎ মনোয়ারা খাতুন বললেন, "আমার আমানের কোন জিনিসের উপর লোভ ছিল না। আমাকে বিরক্ত করত না। ছোটবেলায় ওর আব্বা মারা গিয়েছে। ভাই বোনদের সাথে খুবই ভাল ব্যবহার করতো। কোন খারাপ কাজ করত না। খারাপ গোষ্ঠীর সদস্য ছিল। শহীদ হওয়ার ৬ মাস আগে বলেছিল আমি যদি শহীদ হই তোমার কোন অসুবিধা হবে না। তার ভিতর সব সময় শহীদ হওয়ার প্রেরণা কাজ করতো।"

শহীদ শোকাতুরা মা আরও বললেন, "আমি নিশ্চিত যে আমার ছেলে শহীদ হয়েছে। শিবিরের ছেলেরা আমাদের বাড়িতে যাওয়া আসা করে এতে আমি খুবই খুশি। ছাত্র শিবিরের সব ছেলেই আমার ছেলে।"

www.icsbook.info

তোমরা আমার রহমতকে এনে দাও

শহীদ রহমতের আম্মা

সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলা সদর থেকে ৪/৫ কিঃ মিঃ হেঁটে নিভৃত পল্লী দোহার গ্রামে যখন পৌঁছাই তখন প্রায় মধ্য দুপুর। শহীদ রহমতের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত গ্রামের মসজিদের পাশেই তার কবর। সাদামাটা হলেও অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। গ্রামের সবারই যেন একান্ত নিজের সম্পদ এ কবরটি।

একটু এগিয়ে মাটির প্রাচীর ঘেরা ঘরটির সামনে পৌঁছাতেই এক অশীতিপর বৃদ্ধ সামনে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। মাথায় এবং গালে হাত বুলিয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন "এই মুখ একেবারে আমার রহমতের মত। আমার রহমতকে তোমরা কোথায় রেখে এসেছো " শহীদ রহমত ভাই আর আমি এক সংগে পড়তাম শুনে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। কান্নার বেগ কমে এলে বললাম আপনিতে শহীদের মা। আপনার কাঁদা উচিত নয়। শহীদ জননী বললেন, "তাতো বুঝি বাবা কিন্তু মনতো মানে না। আমার রহমত খুব ভাল ছেলে ছিল। তোমরা ওর মত কাজ করে ইসমাল প্রতিষ্ঠা কর।"

শহীদের সেজো ভাই রজব আলী যিনি একটি ছোট খাট চাকুরি করেন বললেন, "রহমত সারা জীবন কষ্ট করে পড়া লেখা করেছে। নিয়্যত করেছিলাম সামনের মাস থেকে ওকে কিছু টাকা অন্তত হাত খরচের জন্যে পাঠাবো। সে আশা অপূর্ণ রয়ে গেলো। যদি এদেশে ইসলামী বিপ্লব হয় তাহলে বলতে পারবো এ বিপ্লবের পেছনে আমার সহোদর রহমতেরও রক্ত রয়েছে। দোয়া করি আপনারা সফল হন।"

www.icsbook.info

কাশেম পাঠানের শাহাদাতে আমি গর্বিত

শহীদ আবুল কাশেম পাঠানের আম্মা

শহীদ আবুল কাশেম পাঠানের আম্মা তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, "কাশেম পাঠানের শাহাদাতে আমি গর্বিত। আজ আমি শহীদের আম্মা হতে পেরে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। কাশেম পাঠানকে আল্লাহ নিয়ে যাবে বলে কয়েকদিন ধরে কাশেম আমার থেকে দূরে দূরে থাকত।"

শহীদের বড় বোন

শহীদের বড় বোন নূরজাহান বলেন, কাশেমকে আমি আল্লাহর একজন মুজাহিদ হিসেবে গড়ার স্বপ্ন দেখতাম। আমি চাইতাম কাশেম যেন দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। আজ আমার কোন অভিযোগ নেই। আমি শহীদের বোন হতে পেরে গর্বিত।

শহীদের বড় ভাই

শহীদের বড় ভাই বলেন, আব্বা মারা যাওয়ার পর কাশেমই সংসার পরিচালনা করত। তার চরিত্রের কাছে আমি পরাজিত। খুনিদের বিচারের ভার আল্লাহর ওপর দিলাম।

www.icsbook.info

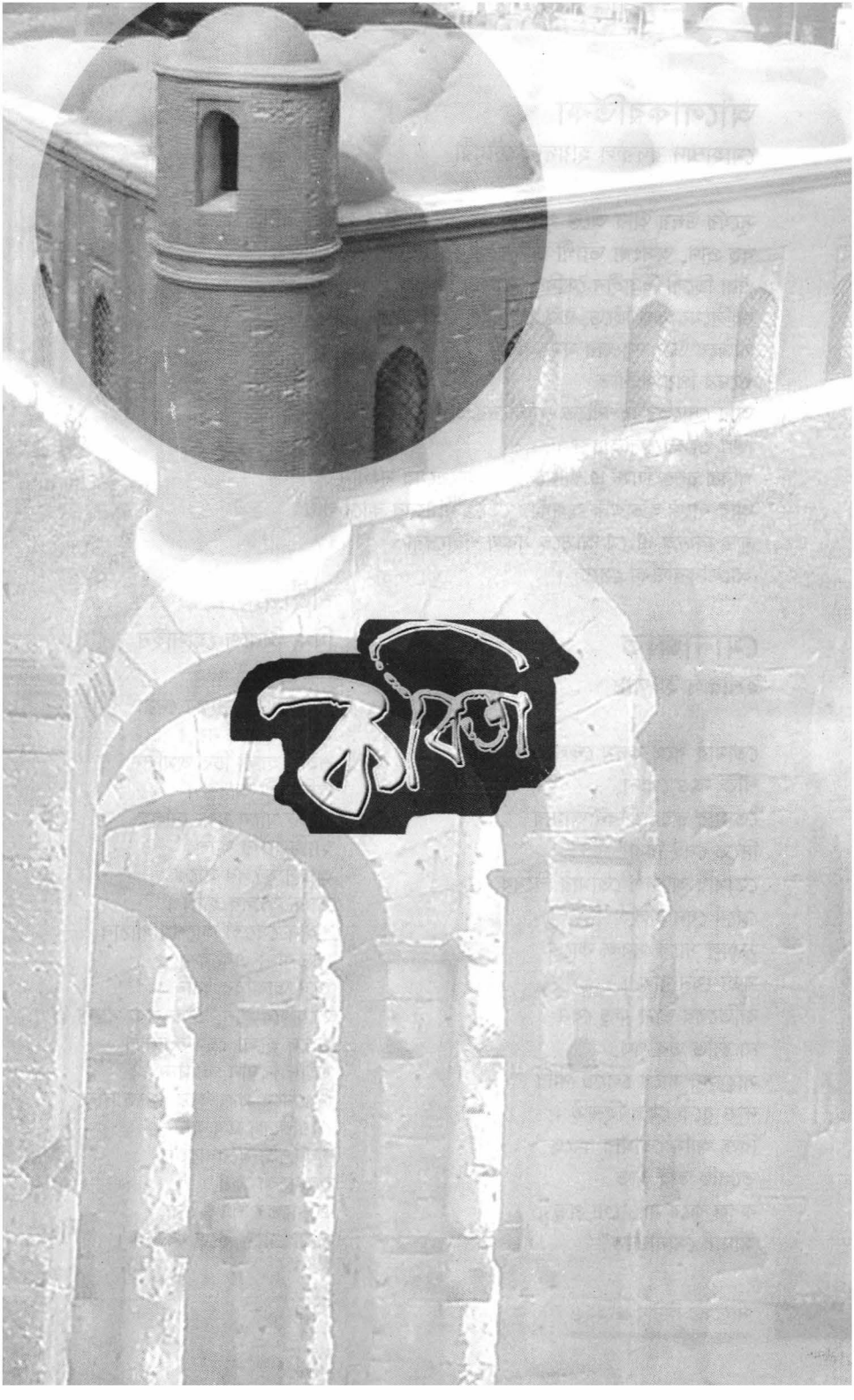

www.icsbook.info

আলোকবর্তিকা

মোহাম্মদ বদরুল হায়দার চৌধুরী

সূর্যের উদয় আর অস্তে পৃথিবীর বিন্যস্ত গতিতে হারিয়ে যায়
বহু প্রাণ, অসংখ্য ত্যাগী জীবন যাদের সত্যের পথে ব্যস্ত ।
ওরা ছিলো দ্বিধাহীন সৈনিক ন্যায়ের জিহাদে
জালিমের কণ্ঠ ছিঁড়ে, তপ্ত বালুরাশি ভেদ করে
গজিয়ে উঠা সবুজের মর্মর ধ্বনি
ওদের প্রিয় সংগীত
আর স্রোতের বিপরীতে নৌযানের অগ্রযাত্রা
ছিল ওদের চলার ছন্দ ।
পবিত্র রক্তে সিক্ত এ জমিনে দ্বীন কায়েমের সংগীন
আর বাজে হতাশার অন্ধকার ভেঙে মুমিনের কাফেলায়
মুক্ত বিহঙ্গে ঐ যে আসছে সকল শহীদেরা
আলোকবর্তিকা সেজে ।

মোনাজাত

ইশারুল ইসলাম

তোমার পথে কদম ফেলার
শক্তি দাও খোদা,
তোমার রাহে জীবন আমার
দিতে সেই দ্বিধা"
তোমার আদেশ তোমার নিষেধ
মেনে যেন চলি,
সকাল সাঝে সকল কাজে
সত্য যেন বলি ।
বাতিলের ভয়ে কভু যেন
না ছাড়ি তব পথ,
সাহসের সাথে চলতে পারি
দাও বুকে মোর হিম্মত ।
রিক্ত আমি তোমার কাছে
তুলেছি তাই হাত
কবুল করে নাও গো প্রভু
আমার মোনাজাত"

শহীদ

মিম. মিরাজ হোসাইন

শহীদ মানে সাক্ষ্য দেয়া
মৃত্যু সে তো নয়,
শহীদ হলো চির অমলিন
অবিনাশী অক্ষয় ।
শহীদ মানে মুন্সী হালিম
হ্যামিলনের বাঁশি,
অজস্র ফুলের মাঝে
তাজা ফুলের হাসি ।
শহীদ সেতো কাশেম পাঠান
প্রতিবাদী এক কণ্ঠ,
শুনে তাকবির ধ্বনি
ভয়ে সব খুনি, ভীত ওরা সন্ত্রস্ত ।
শহীদ হলো রহমত আলী,
শহীদ বিমান, আমান
নিঃশেষে প্রাণ করে গেছে দান,
দেয়নিকো তবু মান ।
শহীদেরা মরেনাতো,
হয়নাকো ক্ষয়,
জান্নাতের পাখি ওরা,
ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় ।

www.icsbook.info

চেতনার অগ্নিমশাল

আজিজুল ইসলাম টিপু

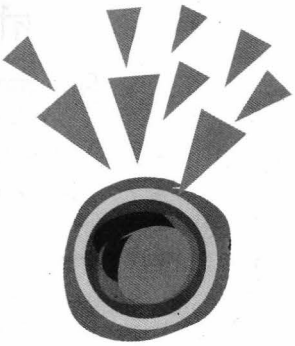

বাবার বড় আশা ছিল
ছেলে তাঁর বড় হবে।
সংসারের চাবি বুঝি
তার হাত থেকে
এবার বুঝে নিবে।
বড় বোনের আশা ছিল
এবার বুঝি তার
দুঃখের অমানিশা ঘুচবে।
ছোট ভাইয়ের আশা ছিল
এবার বুঝি তাদের ঘরে
রাঙ্গা টুকটুকে লালভাবী আসবে
যে তাদের মায়ের আদরে ভরিয়ে দিবে।
কিন্তু বিমান ততক্ষণে চলে গেছে
জিহাদের তপ্ত ময়দানে।
চেতনার অগ্নিমশাল সাথে নিয়ে
দূর হতে বহু দূরে না ফেরার দেশে।
যেখান হতে সে ফিরে আসবে না
আর কোনদিন আমাদেরই মাঝে।

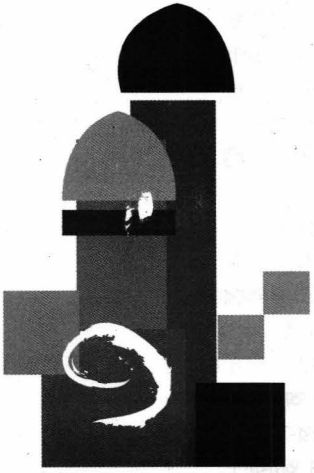

তিন শহীদের এ আযান

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

তিন শহীদের এ আযান
আমি আজ পৌঁছে দেবো–
একটি শাশ্বত বিপ্লবের মহান ধারায়,
সংগ্রাম সংঘাতের উদ্দ্যম ছড়াতে
ফুলকুঁড়িদের বিধ্বস্ত শিরায় শিরায়।।
তিন শহীদের এ আযান,
আমি আজ পৌঁছে দেবো–
গ্রেনেড বুলেট কামানের মতো,
কল্লোলিত সমুদ্রের অশান্ত গর্জনের মতো,
সবকটি দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র
ভেঙ্গে চুরমার করার জন্য।
তিন শহীদের এ আযান,
আমি আজ পৌঁছে দেবো–
সাম্য–সংগতির মহান চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে
সকল মানুষকে
এক অদ্বিতীয় স্রষ্টার সান্নিধ্যে
একাকার হয়ে যাওয়ার জন্যে।

www.icsbook.info

দাঁড়াও দ্বৈরথে

বিপন্ন জনরোষ এখন লাফিয়ে পড়ছে
হার্ডিঞ্জ সেতুর উপর থেকে
পদ্মার স্নিগ্ধ জোয়ারে সুন্দরবনে
যেখানে মাওয়ালী বাওয়ালী এখন
বোবা বদন দূর থেকে দ্যাখে
দক্ষিণ তালপট্টীর উপচে পড়া স্বপ্ন সবুজ ঘাসের ডগায়
বাংলাদেশের ঝিঁঝি, ফড়িং
দারুন উড়ছে দিক বিদিক
খেলছে মাতাল হাওয়ায়, আর-
লঞ্চঘাটের মহিলা কেবিনে
ছমিরন বানু পঞ্চম সন্তানের মুখে ফিডার,
বুকে শ্বশুর বাড়ির দোচালার মটকায়
গুঁজে রাখা শত রজনীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস
জেলেদের জালের উপর বেঁধে রাখা
ভাসমান কালো ড্রামের মত ভাস্‌ছে-
ভাস্‌ছে এই প্রাচীন একত্ববাদী জনপদের শতরঞ্জে
প্রকাশ্য ছিনতাই, পরিনত ব্যভিচার
কুশলী হত্যা, স্কুল পিরীত, কলেজ পিরীত,
অতঃপর এসিড নিক্ষেপ, কুমারী মাতা, তরুনের গলাকাটা
বেশ্যার পারিশ্রমিকে পুলিশের ভাগাভাগি।
কিস্তি, ঘোড়া, গজ, আমলা, মন্ত্রী এবং তাদের ঘষ্টি-ঘোষণ
ভুঁড়িওয়ালাদের সিগারেটের ছাঁইয়ে
চাপাপড়া গাঁয়ের লকলকে লাউডগা
নুরুজ্জামানের উদগ্র খোদারী প্রতিভা,
ইবলিসের পরাজিত ফিরিঙ্গিদের
ড্রেনের মশার মত গুন্‌গুন্‌ লিফলেটে
পঁচা দুর্গন্ধময় দাওয়াই
শুধু ভাসছে, হাসছে তবুও-
নিশুতি রাত্রির ডেরা থেকে
দু'একটা পাতি কুকুর অনন্ত ঘেউ-উ করে উঠে
আর তুমি? তোমার এই
নপুংশক; উজবুক; চালচলনে আর বিশ্বাস নেই।
তবে পালিশ করা চেহারার অন্তরালে
পূর্ব পুরুষের নিখাদ আদৃষ্ট বাদের তিলক দেখে
আমি শাশ্বত যুদ্ধের সঙ্গীন আঁকি।

www.icsbook.info

শহীদ

মোশাররফ হোসেন খান

যাঁদের হৃদপিণ্ড ঝাঁঝরা করেছো
কিংবা মস্তক কেটে দ্বিখণ্ডিত করেছো
চেয়ে দেখ, তাঁরা সবাই নক্ষত্র হয়ে গেছে।

খণ্ডিত মস্তকগুলো বাতাসের সিঁড়ি বেয়ে
নেমে আসে পৃথিবীতে।
খন্ডিত মস্তক থেকে উৎসারিত হয় ভোরের সূর্য।
এবং সূর্যের উত্তাপে পুনরায় জমাটবদ্ধ হয় খণ্ডিত দেহ।

আবদুল মালেক, আবদুল হালিম, রহমত, বিমান, আমান
কোনো মৃত মানুষের নাম নয়। ওরা শহীদ।
এবং শহীদেরা মরে না কখনো।

চেয়ে দেখ, প্রতিটি শহীদই এখন
তোমাদের ঘুমের দরজায় অনড় পর্বত।

ঐ হিংস্র চেখে তোমরা আর ঘুমুতে পারবে না কখনো।
ঐ পাষণ্ড হৃদয়ে আর কখনো দেখবে না সবুজ স্বপ্ন।
আর কখনো পাবে না তোমরা প্রশান্তির আরাম।

তোমাদের অনুভবে, ভাতের থালায়, দৃষ্টির সীমানায়,
ঘুমের বিছানায় শহীদের অগ্নিময় প্রশ্বাস।
ইলেকট্রিক করাতের মতো রাতা এখন তোমাদের মাথার ওপর।
এবং চেয়ে দেখ, প্রতিটি শহীদই এখন
তোমাদের মুখোমুখি প্রজ্বলিত লাভা।

www.icsbook.info

তোমাদের পাঁজর ভেদ করে ঢুকে গেছে যে দুর্ধর্ষ বাতাস
সেই বাতাসের সাথে মিশে আছে
শহীদের ঘৃণার থুথু, দর্পিত প্রশ্বাস।
তোমাদের হলকুমের ওপর একটিই মাত্র অস্তিত্ব–
সেটা হলো শহীদের অকম্পিত পা।
আবদুল মালেক, আবদুল হালিম, রহমত, বিমান, আমান
কোনো মৃত মানুষের নাম নয়। ওরা শহীদ।
এবং শহীদেরা মরে না কখনো।

কাদেরকে পরাজিত করবে?
দেখ, পৃথিবীর প্রতিটি বিশ্বাসী মানুষের এখন
একটিই মাত্র প্রার্থনা–শহীদ
শহীদ হওয়া ছাড়া তাঁদের আর কোনো প্রার্থনা নেই।
এবং দেখ, সমুদ্রের বুকে যে দুর্বিনীত ঢেউয়ের গম্বুজ–
ওটা ঢেউ নয়, শহীদের অন্তিম ক্রোধ।
কাদেরকে পরাজিত করবে?
রক্তের তরঙ্গের ওপরেও বেঁচে থাকে
'শহীদে'র যৌবনদীপ্ত প্রাণী
শহীদেরা মরে না কখনো।

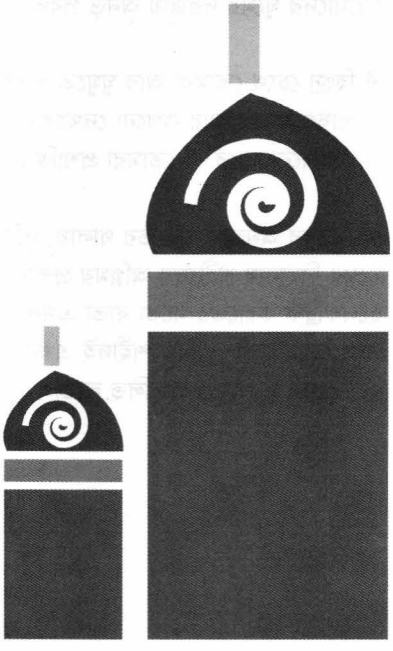

www.icsbook.info

মিছিলের যাত্রী

এ এ এম তাসনীম

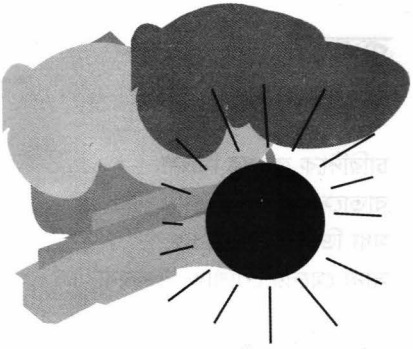

দিগন্ত জুড়ে আকাশের বুকে
শহীদের রক্ত করে পরিহাস-
আমি চেয়ে থাকি অপলক
ক্লান্ত হয় না আমার বিশ্বাস
ক্লান্ত হয় না বিপ্লবী জনতা
আর ক্লান্ত হয় না ইতিহাস।
মেঘের বালুচরে দাঁড়িয়ে সূর্য উঠবে
পাহাড়ের চূড়ায় হেলান দিয়ে সূর্য উঠবে
গভীর রাতের আঁধার ফুঁড়ে সূর্য উঠবে
এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস॥
কে আছ যুবক! মুক্তির প্রত্যাশায় নির্ভীক
দুর্বার ঝড়ো হাওয়া সম্মুখে তোমার।
ক্ষুধার্ত শিশুর ক্রন্দন শুনতে চাই না আমি
বিপ্লবী জনতার মিছিলে রক্ত চাই না আমি
ছেলেহারা মায়ের আহাজারি;
রক্তে মশাল জ্বেলে কে তুমি?
দীর্ঘ রজনী পাড়ি দিতে হবে
মুক্তি-মৃত্যু মুঠি হাতে।
কে আছ যুবক!
সত্য-সুন্দর জীবনের যাত্রী
কারাগার, ফাঁসি, মৃত্যু-ক্ষুধা
তারপর বিজয়; তারপর বিজয়
এ আমার দৃঢ় প্রত্যয়॥

তরী

মো: মনিরুল ইসলাম

যুগে যুগে যে তরী
বেয়ে গেছে ভাই আমার
সে তরী কেমন করে
ছেড়ে দেবো বল না আশায়।

যে তরী বেয়ে ছিল
ওমর, বেলাল,
সে তরী বেয়ে গেছে
মালেক, পাঠান।
সেই তরী ধরতে চায়
আমার এই প্রাণ

হাসানুল বান্না যে তরী বেয়ে
চলে গেছে চিরো সেই জান্নাতে।
যাবো আমি সেই কাফেলা তরীতে,
যে তরীতে গেছে ঐ
মাসুম, সাব্বির, আমান, নোমান।

www.icsbook.info

কতদূর

তুহিনুল আসলাম খলিল

চারিদিকে লাশের মিছিল
বাতাসে বরুদের গন্ধ,
মধ্য ডিঙিয়ে এক যুবক
সাদা মেঘের পোশাক 'রক্তজবা'।

আমাকে দেখেই থমকে দাঁড়ালো
সালাম কুশল সবই হলো
জানতে চাইলো তার অসমাপ্ত কাজ কতদূর?

তার হাতের জৌতি আমাকে আলোড়িত করলো
বুঝলাম অদৃশ্যের টানে ক্ষেপে গ্যাছেন
পুনশ্চঃ করতে সাহস পেলাম না।

জলোচ্ছ্বাসের মতই ব্যস্ত হয়ে উঠলো
সময় নেই দাঁড়াবার
সামনে অনেক পথ।

হাঁটছে তো হাঁটছেই পিছুটান নেই কোন
আমি তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করলাম
কিন্তু শহীদ হাঁটছেতো হাঁটছেই॥

আহবান

মু. মুশিউর রহমান

ঐ শোন, দূর কোন অজানা পথ হতে
আল্লাহু আকবর ধ্বনি ভেসে আসে।
ও যেন ধ্বনি নয়, বজ্রের হুংকার
খোদার আরশে আঘাত হানে।
এমন দিনে তোরা কে আছিস
মসজিদ আর খানকায় বসি।
ঐ দেখ! তাগুতের মসনদ খান খান হয়ে
পড়েছে ধরায় খসি।
ঐ শোন! কোন দূরে শোনা যায়
বাতিলের বুলেটের আঘাতে
আল্লাহর নাম কেড়ে নিল
কাশেম পাঠানের মুখ হতে।
কে কোথায় আছিস তোরা আয় ত্বরা
ছুটে যাই শহীদি মিছিলে,
কাল বিলম্ব সহে না,
এক মুহূর্তের তরে।
ঐ দেখ! ভরেছে আজ পৃথিবীর মসনদে,
বাতিলের সয়লাব।
এখন সময় নেই খানকায় বসে
জপমালা করিবার।
ছুটে আয়! তোরা ডাক এসেছে জিহাদের
জিহাদ জিহাদ বলি ঝাঁপিয়ে পড়ি
বাতিলের শেষ ঘাঁটিটির উপর।

www.icsbook.info

স্বপ্নীল উপনাম ঃ 'শহীদ'

মোল্লা রেজাউল করিম

স্বপ্নের সুষমার উপনাম তোমার
"শহীদ"
আজন্ম লালিত বিশ্বাসের দুয়ারে
জান্নাতী আমেজে উদ্বেলিত
যেখানে জান্নাতী পেয়ালা হাতে
হুরোরা জানায় সাদর সম্ভাষণ।
কপট পৃথিবীর প্রান্তর ছেড়ে
নিবেদিত অলজ্ঘ দৃপ্ত আবাহন।
এ-এক সম্মোহনী চক্রবাক
যার পিচ্ছিল রক্ত ঝরা পথে,
অনেক কাটার আঘাত সত্ত্বেও
তুমি ছিনিয়ে নিয়েছ শাহাদাত॥

তারপর প্রতি পদক্ষেপে
কাঙ্খিত হাতছানি তোমার ঈর্ষা জাগায়
তোমার ভাস্বর আদর্শের ধারায়
আমিও পেতে চাই
সেই সে উপনাম
"শহীদ"

তুমি তো জাননা শহীদি আযানে
প্রতিদিন প্রকম্পিত করে হৃদয়তন্ত্রী
অনুভবের সকল পরেতে পরেতে
বয়ে চলে সদা মরু সাইমুম।
শাহাদাতের সুতীব্র নেশায়
আর আমি খুঁজে ফিরি সিরাতুল মুস্তাকিম॥

ভুলে গেছ?

সিরাজুল ইসলাম উকিল

তোমার রক্তের শ্বেত কণিকাকে
জিজ্ঞেস কর-
২০শে সেপ্টেম্বর, ২৩ শে অক্টোবরের
হায়েনাদের অক্টোপাসের থাবার কথা,
তোমার চোখের উত্তল লেন্সে
ফোকাস মারে-
শকুনের মত টেক্সি থেকে নামিয়ে
হাসানুল বান্নাকে বারুদ দিয়ে
সাজানোর মত মিশরীয় বর্বরতা।
তোমার উর্বর ব্রেনে
এখনও সঞ্চিত-
মসজিদকে সাক্ষী রেখে
১৫ই আগস্ট ঢাকার অক্সফোর্ডে-
ঘটানো হয়েছিল আদর্শের এক
নায়কের উপর হিংস্র সন্ত্রাস।
হৃদয়ের দুয়ার খুলে দেখ-
বসনিয়ার লাশ নিয়ে
পাশ্চাতের উলঙ্গ
বিপ্লবী কুহুতান।
হে যুবক!
সময় এসেছে বুক সাজাবার
৪২ কোটি বুলেট দিয়ে।
হেমন্তের সৌরভ মেখে
শপথ নাও বসন্তকে আনবই।

www.icsbook.info

চির অম্লান

মোঃ রাশিদুল ইসলাম রাশেদ

আজ আর কেউ তোমরা খুঁজে পাবে না তাকে
খুঁজে পাবে না তোমরা সেই মহান নেতাকে
যে আমরণ সংগ্রাম করেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে
চিরদিন সে লড়েছে শোষিতের পক্ষে।
নিজেকে হারায়ে তবু সে দেয়নি হারাতে সাথীদের
অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন করেছে দান,
কালজয়ী সে পুরুষের নাম আবুল কাশেম পাঠান।
যত ভুলতে চেষ্টাই করি না কেন আমি তাকে
ভুলতে পারি না তার সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখকে।
দুর্বল, অনাথ সত্যসন্ধানী মানুষের হৃদয়ের মাঝে
নিজেকে দখল করেছিল তার অনন্য প্রতিভা দিয়ে।
অজস্র বাঁধা ঘূর্ণি-তুফান শোষকের সন্ত্রাসের তাণ্ডব
নত করতে পারেনি তার উন্নত শির
খোদার কাছে ছাড়া হয়নি নত কখনও সে,
জীবনের সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়েছে নিজে।
সে তার অনন্ত সমস্যার মাঝেও টেনে নিত
সকল দুর্বল মানুষকে নিজের বিশাল বক্ষে।
আমরা আর খুঁজে পাব না সেই উদার হৃদয়কে
এই স্বার্থপর সংকীর্ণ মানুষের অঙ্গনে।
আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও
সে স্বার্থহীন মানব প্রেমিকের প্রসারিত হৃদয়।
এখন দেখি চারিপার্শ্বে শূন্যতা আর হাহাকার
তবুও আমাদের মনে জ্বলে কাশেমের নাম,
প্রেরণার উৎস হয়ে জনতার মাঝে কাশেম চির অম্লান।

www.icsbook.info

শহীদি কাফেলা

আবুবকর সিদ্দীক

আমাদের কাফেলার যাত্রা অনন্তের পথে
আর আমরা সেই অনন্তের অভিযাত্রী।
আমাদের যাত্রা আলোকিত করে ধরাধাম
চলছে চলবে, অবিরত অবিরাম।

আমরা বদর, ওহুদ, খন্দক, তাবুক, মূতা
ইয়ারমুক, আয়ামামা হয়ে এখনো ছুটছি।
আমাদের শরীরে খালিদ, আলী, হামজার রক্ত,
আমাদের বক্ষ তারেক, মূসার সাহসিকতায় সিক্ত।
যে জাতি ছিলো অশান্ত, নিরক্ষর, বর্বর
জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে তাদেরকে
আমরা করেছিলাম সৎ, জ্ঞানবান, উর্বর
অনাদিকাল ধরে প্রবহমান ভ্রান্তি, হয়েছিলো সমাপ্তি।

আমরা সুসভ্য করেছিলাম স্পেন, ইয়ামেন
মরক্কোতে জ্বালিয়েছিলাম আলোর মশাল,
আফ্রিকার অরণ্যে উড্ডীন করেছিলাম কালিমার ঝাণ্ডা
জাগ্রত করেছি সমগ্র বিশ্বে সৌভ্রাতৃত্ববোধ।

আমাদের রক্তে রঞ্জিত ধূসর মরু প্রান্তর
ফোরাত তীরের ঐতিহাসিক কারবালা,
অসংখ্য সবুজ তৃণভূমি হয়েছে লালে লাল
তবুও থামেনি আমাদের কাফেলা।

শাহাদাতের তামান্না নিয়ে সর্বদা ছুটে চলেছে
এ কাফেলার অকুতোভয় কর্মীরা,
এক বিতৃষ্ণ বাসনা নিয়ে ধাবমান, দুর্ভেদ্য গতি
রণাঙ্গনে হার মানে না পিছপা হয় না তারা।

লতা-পল্লবে সুশোভিত এই বাংলায়ও বহমান
সমৃদ্ধ দেশ গড়তে প্রত্যয় দীপ্ত অপ্রতিরোধ্য
দুর্জয় দুঃসাহসী আমাদের এ কাফেলা,
আমরা এর নাম রেখেছি শহীদি কাফেলা

www.icsbook.info

শোক মিছিল

শেখ কামাল উদ্দিন

রংধনুতে লেপ্টে থাকা আসমান
খণ্ড জলরাশির আবেশে উঁকি দেয়
বাতাসের চৌকাঠ মাড়িয়ে
হিম দানবের-ঘাড় মটকানো ভঙ্গিতে-
আড় মোড়া দেয় বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ
ভয়াল বজ্রের আর্তচিৎকারে
শীলা খণ্ডের খৈ ফোটে
পিচ ঢালা পথে
সাদা কার্পেটের আস্তরণ যে সাদা-মারোয়া
শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিল্প
নিমিষেই কর্পূর উবে যায়
হিমালয়ের নিম্নস্রোতে
কালের সাক্ষী হয় নূহের প্লাবন
জলবাষ্পের আবীর মাখা চোখে
স্ফুরিত হয় সূর্য
যেন হীরকের খণ্ড
লণ্ড ভণ্ড হয়ে যাওয়া টাইফুনের পদচিহ্নে আঁকা
লাশ আর বিদগ্ধ সম্পদের রাজত্বে নেমে আসে
উৎসুক জনতার শোক মিছিল।

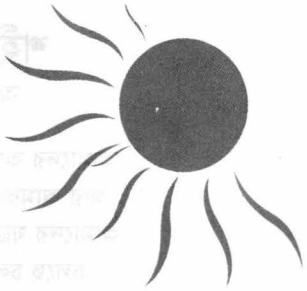

আমি তাদের দলে

এস.এম.আখতারুজ্জামান (সুমন)

আমি তাদের দলে
যারা অন্ধকার থেকে
বেরিয়ে আসতে চায়
ইসলামের ছায়াতলে এসে।

আমি তাদের দলে
যারা কালেমার পতাকা ধরে
উড়িয়ে রাখে আকাশের দিকে
মানুষকে সত্যের দাওয়াত দিতে।

আমি তাদের দলে
যারা জিহাদের ময়দানে
প্রথম সারিতে থাকে
বাতিলকে ধ্বংস করতে।

আমি তাদের দলে
যারা জীবন উৎসর্গ করে
রাসূলের পথে গিয়ে
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে।

আমি তাদের দলে
যারা শ্রেষ্ঠ কিতাব
কুরআনকে সংবিধান মেনে
আমল করে নির্দ্বিধাতে।
আমি তাদের দলে

www.icsbook.info

তাঁরা ক্ষণিক ডেকে যায়

এ.কে.এম.তানজিল

পরম সুখের সিপাহসালারগণ...
সবুজ পাখি হয়ে উড়ছেন।
দক্ষিণ আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র মালা হয়ে,
হাতছানি দিয়ে ডাকে বিশ্বময়।

মর্তলোক চিরে ধেয়ে আসে
গম্ভীর কণ্ঠস্বর....।

"হে বীর মিছিলের যাত্রীরা
মাজলুম আজ অত্যাচারিত,
নিগৃহীত, বঞ্চিত, আক্রান্ত, সর্বহারা।
নয়ন জল বাষ্প হয়েছে,
আসমান জোড়া কাল মেঘের গর্জন।
তপ্ত নিঃস্বাসে
অনুরোনিত, আন্দোলিত, তরঙ্গায়িত
পৃথিবী পৃষ্ঠে ইসলাম।

হতে পারে না....
তা হতে পারে না!!!

পৃথিবী হবে এক কলঙ্কহীন অধ্যায়
সত্যের পতাকা বাহী গৌরবে গাথা।

"এসো হে তরুণ,
রক্ত সাগর পাড়ি দিয়ে,
বীরের মিছিলে
এঁকে দাও পদ চিহ্ন।

ধিক্কার দিয়ে
রাঙা তলোয়ার ছুড়ে দাও।
দিখণ্ড হোক আজাজিলের
অভিশপ্ত রক্তনালী।

হেঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেল,
বাতিলের টুঁটি।
ড্রোন খেপিয়ে উড়িয়ে দাও
যড়যন্ত্রের বিষমঞ্চ"।

"এগিয়ে চল.....
এগিয়ে চল, হে শহীদি কাফেলা।
সপ্ত আসমানে
দামামা বাজিয়ে হেঁকে যায়.....

নক্ষত্র রাজ বেলাল উদ্দিন,
সেনাপতি আব্দুল হালিম,
বাঁশিওয়ালা কাশেম পাঠান,
সাহিত্যিক রহমত আলী,
তেলোওয়াতকারী আমানউল্লাহ
ও শহীদী পতাকা হাতে
আমিনুল ইসলাম বিমান।
সালাম, স্বাগতম.....
হে নক্ষত্র পিয়াসী উল্কা,
তুমি আমন্ত্রিত!!!

www.icsbook.info

তোমাকে যেমন দেখেছি

হাকিম মু. মহর আলী ফারাজী

তোমাকে দেখেছি উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত
তোমাকে দেখেছি পূর্ণিমায় চন্দ্রের মত কমলিত
তোমাকে দেখেছি দ্বি-প্রহরের সূর্যের মত উত্তপ্ত
বাতিলের অস্ত্রাঘাতে তোমাকে দেখেছি ক্ষত-বিক্ষত

কিন্তু....
অস্তায়িত সূর্যের মত ধীরে ধীরে নিভে যায়নি
জীবন প্রদীপ তোমার
সত্যের সাধক তুমি সত্যেরই প্রেমিক,
প্রেমিকের মৃত্যু নাই, তাই তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী
তৌহিদের ঐশ্বর্যে তোমার হৃদয় ছিল ভরপুর।
কল্যাণ সাধনায় তোমার জীবন করেছ উজাড়
তোমার বিয়োগ ব্যথার তীব্র কশাঘাতে,
মনে হয় ভেঙ্গে যাচ্ছে বুকের পাজর
তোমারি আপনালয় উথলে উঠেছে রিক্তের হাহাকার
সৃষ্টি হয়েছে আজকে ব্যথার সাগর
তারি তরঙ্গ মালায় তোমার অসংখ্য স্মৃতির স্বাক্ষর
অন্তিম শয়ানে তুমি: তবু ভাবতে পারিনা
তুমিযে নিস্প্রাণ
তুমি আছ তুমি থাকবে চিরদিন
তোমার স্মৃতির প্রদীপে অনিবার্ণ

www.icsbook.info

আমি সেই দিন হব ক্ষান্ত

এস এম একরামুল কবীর

আরও হাজার কিলোমিটারও
যদি বিস্তৃত হয়।
শত সহস্র ক্ষণও যদি স্থায়ী হয়
এ মিছিল।
তবে এ মিছিল সে মিছিল নয়
যে মিছিলে পেয়েছি আমি
শহীদ আমান উল্লাহ আমান
আমিনুল ইসলাম বিমান।
দশ দিগন্ত প্রকম্পিত হত যে মিছিলে
বজ্র ধ্বনি ভয়ে চুপসে যেত
ভীত সন্ত্রস্ত হত, পরাজিত হত
পৃথিবীর সমস্ত গর্জন
আমি চাই সেই মিছিলের হুঙ্কার
যে মিছিলে গর্জে উঠত
শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম
রহমতউল্লাহ, পাঠান
যে সমাবেশের ঢল
শত মাঠ ছাপিয়ে যেত
উপচে পড়ত মুজাহিদের আগমনে
আমি চাই সেই সমাবেশ
আমি চাই সেই সমাবেশ
যে সমাবেশে টগবগিয়ে ফুটে উঠত
ছাত্র শিবিরের রক্তাবেগ।
আমি চাই সেই ত্যাগ
যে ত্যাগ করে গেছে
আবুল কাশেম পাঠান
সাংবাদিক বেলাল।
যে ত্যাগের মহিমা হবে না কোন অস্ত
আমি চাই সে ত্যাগ যে ত্যাগে প্রসারিত হবে
আমাদের মুক্তির দিগন্ত।
আমি সেই দিন হব ক্ষান্ত
যে দিন দেখবো ইসলামের পতাকা চির উড়ন্ত।

www.icsbook.info

প্রেরণার কষ্টিপাথর

মুহাম্মদ ছাইফুল ইসলাম

শহীদ?
কী সুন্দর একটি অমিয় জীবন
একটি শাশ্বত বিপ্লবের অট্টহাসি
মুক্ত-স্বাধীন সশরীরে আজীবন বেঁচে থাকা
নক্ষত্রে এক রাশ সোনালি আভা!
শহীদ?
এক গুচ্ছ রক্তের সুগন্ধি প্রসুন
যার পরশ ছোঁয়ায় এ মাটি হয় উর্বর, পবিত্র
এবং এর কাণ্ডলো জমাট বেঁধে গড়ে ওঠে
আকাশ ঠেকা এক দুর্বোধ্য প্রাচীর
যার পূর্বে লেখা থাকে শহীদের অতি ক্রোধ
এবং ঘৃণার থুথু দিয়ে
এখানে বাতিলের প্রবেশ নিষেধ
লাল কালি দাগটানা হুঁশিয়ারি!
শহীদ?
এত ধূমকেতু, উল্কা, বাতিল বিধ্বংসী কামান
সীমার এজিদের বসত ভিটা গুঁড়িয়ে নিতে তেড়ে আসা;
সাগরের দুর্বিনীত ঢেউ রোষে ওঠা টাইফুন, টর্নেডো!
শহীদ?
আমান, হালিম, রহমত, বিমান, আবুল কাশেম পাঠান!
ওরা শহীদ;
পাঞ্জেরী, সংগ্রাম, চেতনা!
আমাদের প্রেরণা-প্রেরণা কষ্টিপাথর
আর শহীদেরা এপথে চলার এবং
আত্মত্যাগের এক বিপ্লবী মাধ্যম॥

www.icsbook.info

যুগে যুগে যারা বেয়ে গেল শ্রী

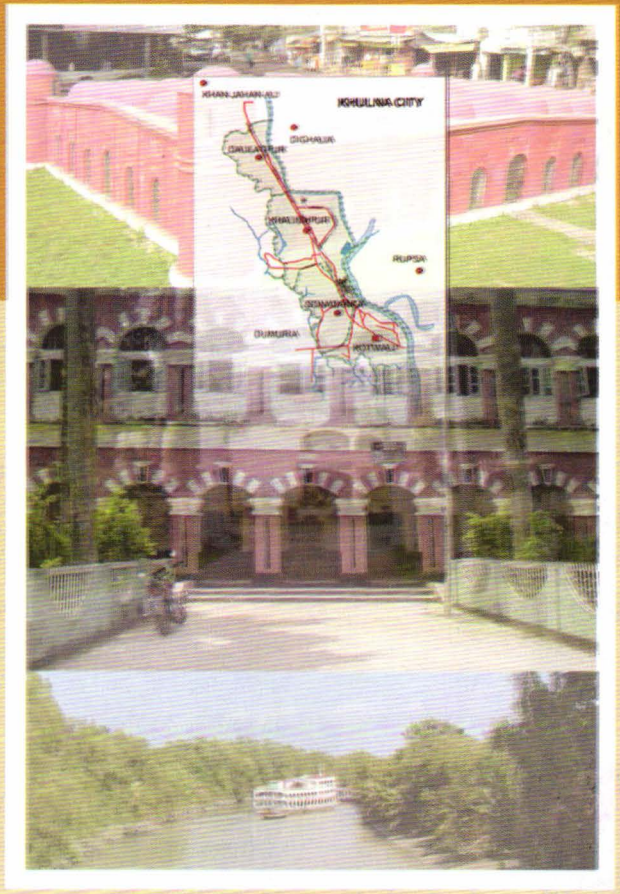

www.icsbook.info

যুগে যুগে যারা বেয়ে গেল তরী

সভাপতি

নাম	মু. আবুল কাশেম
সেশন	১৯৭৭-৭৮
পেশা	শিক্ষকতা
মোবাইল নম্বর	০১৭২৮-৩৭৩২৭২

নাম	অধ্যাপক মু. সিরাজুল ইসলাম
সেশন	১৯৭৮-৭৯, ১৯৮০-৮১
পেশা	অধ্যাপনা
মোবাইল নম্বর	০১৫৫৮-৩৩৮১০৯

নাম	মু. রুহুল আমিন খান
সেশন	১৯৮১-৮২, ১৯৮৩
কর্মস্থল	অস্ট্রেলিয়া
মোবাইল নম্বর	-----

নাম	শহীদ শেখ বেলাল উদ্দিন
সেশন	১৯৮৩-৮৪,৮৬-৮৭
সর্বশেষ পেশা	খুলনা ব্যুরো প্রধান, দৈনিক সংগ্রাম
শাহাদাতের তারিখ	১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

নাম	ইঞ্জিনিয়ার শেখ আল-আমিন
সেশন	১৯৮৪-৮৫,১৯৮৬
পেশা	প্রকৌশলী
মোবাইল নম্বর	০১৭১৫- ০৪৪৮৩৩

নাম	শেখ কামরুল আলম
সেশন	১৯৮৭-৮৮, ১৯৮৯-৯০, ১৯৯১
পেশা	বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
মোবাইল নম্বর	০১৭১৫- ০০১১৮৯

নাম	জি.এম. ইলিয়াস হোসাইন
সেশন	১৯৯১-৯২
কর্মস্থল	ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী
মোবাইল নম্বর	০১৭১৫-৪৮৫০১৬

www.icsbook.info

নাম	এ্যাড. শেখ আব্দুল ওয়াদুদ
সেশন	১৯৯৩-৯৪, ১৯৯৫
পেশা	আইনজীবী
মোবাইল নম্বর	০১৭১১-২৮০২৬৯

নাম	অধ্যাপক মিয়া গোলাম কুদ্দুস
সেশন	১৯৯৬
পেশা	অধ্যাপনা
মোবাইল নম্বর	০১৭১১-৪৬৭১১৫

নাম	গোলাম মোস্তফা আল মুজাহিদ
সেশন	১৯৯৭
পেশা	অধ্যাপনা
মোবাইল নম্বর	০১৭১২-৬৯৯২৫১

নাম	মু. মাহফুজুর রহমান
সেশন	১৯৯৮-৯৯
পেশা	অধ্যাপনা
মোবাইল নম্বর	০১৯১৩-২১৩৫৪১

নাম	এ্যাড. শেখ জাহাঙ্গীর হুসাইন হেলাল
সেশন	১৯৯৯-২০০০
পেশা	আইনজীবী
মোবাইল নম্বর	০১৭১১-২৮০২০৯

নাম	প্রিন্সিপাল শেখ জাহাঙ্গীর আলম
সেশন	২০০১-০২
পেশা	অধ্যক্ষ, সিটি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
মোবাইল নম্বর	০১৭১১-০১৮৬২৩

নাম	অধ্যাপক এ.কে.এম. ফজলুল হক
সেশন	২০০২
পেশা	অধ্যাপনা
মোবাইল নম্বর	০১৭১৮-৩৭৫৩৫৬

নাম	অধ্যাপক জি.এম. শফিকুল ইসলাম
সেশন	২০০৩
পেশা	অধ্যাপনা
মোবাইল নম্বর	০১৮২৩-২৮৭৪৯৬

www.icsbook.info

নাম	অধ্যাপক স.ম. এনামুল হক
সেশন	২০০৪
পেশা	অধ্যাপনা
মোবাইল নম্বর	০১৭১৬-৬৪১০০১

নাম	মু. শামসুর রহমান
সেশন	২০০৫
পেশা	কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
মোবাইল নম্বর	০১৯১৫-৪৯২০০৮

নাম	মু. তারিকুল ইসলাম পিকু
সেশন	২০০৬-০৭
পেশা	অফিসার, ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
মোবাইল নম্বর	০১৯১১-৫১১৪৮০

নাম	মিয়া মুজাহিদুল ইসলাম
সেশন	২০০৭-০৮, ২০০৯
পেশা	বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
মোবাইল নম্বর	০১৭৫৪-৮০৫৯৯৩

নাম	মুকাররম বিল্লাহ আনসারী
সেশন	২০০৯-১০
কর্মস্থল	কর্মকর্তা, ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল, খুলনা
মোবাইল নম্বর	০১৭২০-০০৩৩৭৭

নাম	মু. আতাউর রহমান বাচ্চু
সেশন	২০১০-১১
বর্তমান দায়িত্ব	কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক
মোবাইল নম্বর	০১৯১৫-০৯০৬৬৫

নাম	মু. সাইদুর রহমান
সেশন	২০১১, ২০১২-চলতি...
বর্তমান দায়িত্ব	শাখা সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য
মোবাইল নম্বর	০১৭১২-১৭২৪৭৭, ০১৯১১-৫১৯৩২৪

www.icsbook.info

সেক্রেটারি

নাম	খান মোশাররফ হোসেন
সেশন	১৯৭৭-৭৮
পেশা	এভিপি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
মোবাইল নম্বর	০১৯১৫- ১৬৪৯০৬

নাম	অধ্যাপক শেখ রেজাউল হক
সেশন	১৯৭৮
পেশা	অধ্যাপনা ও সাংবাদিকতা
মোবাইল নম্বর	০১৭২০-৯৯৮০৮১

নাম	মু. গউসুল আজম হাদী
সেশন	১৯৭৯
পেশা	শিক্ষকতা
মোবাইল নম্বর	----

নাম	মু. আলতাফ হোসেন
সেশন	১৯৭৯
পেশা	শিক্ষকতা
মোবাইল নম্বর	০১৬৭৫ ৯৭৮৪৫০

নাম	অধ্যক্ষ সাফায়েত আলী মিয়া
সেশন	১৯৮১-৮২
পেশা	শিক্ষকতা
মোবাইল নম্বর	০১৭১২-৬১৩৫৭৩

নাম	রফিকুল ইসলাম দুলাল
সেশন	১৯৮২-৮৩
পেশা	অধ্যাপনা
মোবাইল নম্বর	০১৭১২-৭৭৩৭৬৭

নাম	অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার
সেশন	১৯৮৪-৮৫
দায়িত্ব	সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল, বা.জা.ই
মোবাইল নম্বর	০১৭১১-২৮০১২৬

নাম	মাওলানা রেজাউল করিম
সেশন	১৯৮৬
পেশা	শিক্ষকতা
মোবাইল নম্বর	০১৭৪০-৮৭৮৩২৯

www.icsbook.info

নাম	অধ্যাপক মু. শহিদুল ইসলাম
সেশন	১৯৮৭-৮৮
পেশা	অধ্যাপনা
মোবাইল নম্বর	০১৭১৫-৮৫৫৯২০

নাম	অধ্যাপক শেখ সাইফুদ্দিন
সেশন	১৯৮৮-৮৯
পেশা	অধ্যাপনা
মোবাইল নম্বর	০১৯১২-৯০০৩২৪

নাম	মু. সিদ্দিকুর রহমান
সেশন	১৯৮৯-৯০
পেশা	চাকুরী
মোবাইল নম্বর	০১৭৪০-৯৯০৯৯৭

নাম	ওয়াছিয়ার রহমান মন্টু
সেশন	১৯৯৩
পেশা	চাকুরী
মোবাইল নম্বর	০১৭১৬-৬৭৮৭৮০

নাম	মু. মাকসুদুর রহমান মিলন
সেশন	১৯৯৪
পেশা	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, রিয়াদ শাখা
মোবাইল নম্বর	০১৭১১-৪৪৮৯৬৯

নাম	শেখ মুরাদ হোসেন
সেশন	১৯৯৪-৯৫
পেশা	অধ্যাপনা
মোবাইল নম্বর	০১৭১৫-৬০৯৫৭৩

নাম	ইকরামুল আমিন মামুন
সেশন	২০০৫
পেশা	চাকুরী
মোবাইল নম্বর	০১৯১১-৬০৩৯৩৮

নাম	গাজী মোর্শেদ মামুন
সেশন	২০১১-১২ (আগস্ট)
বর্তমান দায়িত্ব	সদস্য, কেন্দ্রীয় দফতর বিভাগ
মোবাইল নম্বর	০১৯১২-৫৫০৯৩৯

নাম	মু. আজিজুল ইসলাম ফারাজী
সেশন	২০১২-চলতি
বর্তমান দায়িত্ব	মহানগরী সেক্রেটারি
মোবাইল নম্বর	০১৯১৩-৫৮০৪৯৫

www.icsbook.info

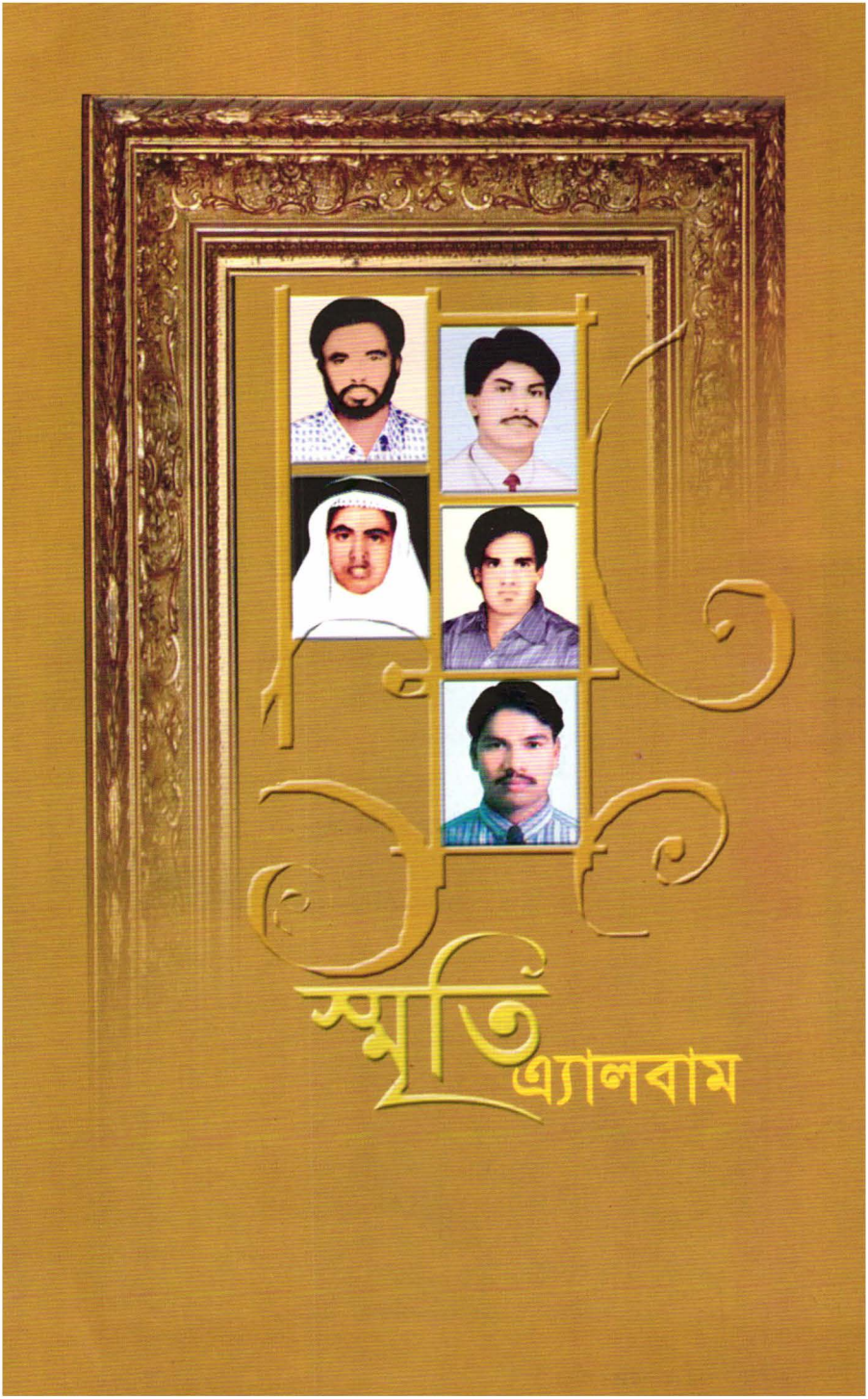

www.icsbook.info

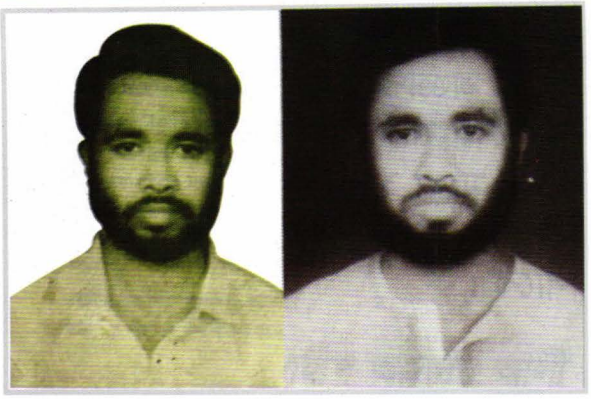

বিভিন্ন সময়ে শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমানের তোলা ছবি

সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত অবস্থায় শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান

শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমানের কফিন

www.icsbook.info

স্মৃতি এ্যালবাম

এখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান

শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমানের খুনীদের ফাঁসির দাবিতে ঢাকার রাজপথে শিবিরের বিক্ষোভ মিছিল

১. শহীদ আমিনুল ইসলাম স্মরণে গড়ে উঠেছে শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান স্মৃতি পাঠাগার।
২. শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান স্মৃতি পাঠাগারের উদ্বোধন করছেন তৎকালীন খুলনা মহানগরী আমীর ও সাবেক এম.পি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

www.icsbook.info

আন্তকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদের জি.এস. শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম।

কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বি.এল. কলেজ শিবিরের সভাপতি ও নির্বাচিত জি.এস. মুন্সী আব্দুল হালিম ভাইকে ব্যাচ পরিয়ে দিচ্ছেন তৎকালীন শিবির নেতা

১. শাহাদাতের পূর্বে হাজী মহসীন হলের এই রুমেই অবস্থান করতেন শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম।
২. বি.এল. কলেজ ছাত্র কমনরুমে দেওয়াল ঘড়ি লাগানোর উদ্বোধন করছেন জি.এস. মুন্সী আব্দুল হালিম, পাশে ছাত্র কমনরুম সম্পাদক রাশিদুল ইসলাম রাশেদ

www.icsbook.info

স্মৃতি এ্যালবাম

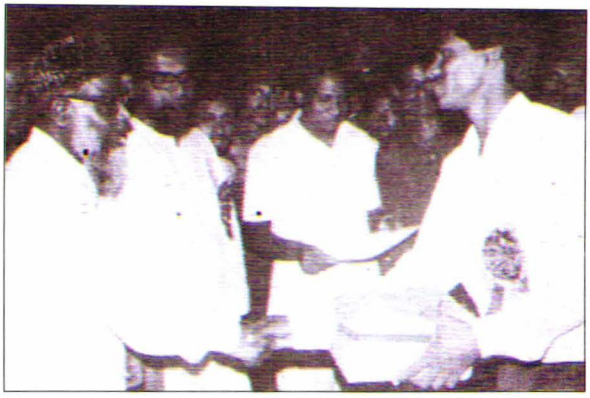

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির নিকট থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম

বি.এল. কলেজ দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পাওয়ার পর অধ্যক্ষের সাথে পুরস্কার হাতে শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম, শহীদ আবুল কাশেম পাঠান ও ছাত্রসংসদ নেতৃবৃন্দ।

বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের সাথে বা থেকে বি.এল. কলেজ ছাত্রসংসদের নির্বাচিত জি.এস. শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম সহ ছাত্রসংসদের নেতৃবৃন্দ।

www.icsbook.info

স্মৃতি এ্যালবাম

অসুস্থ রোগীর শয্যাপাশে শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিমসহ ছাত্রসংসদের নেতৃবৃন্দ।

শাহাদাতের মাত্র ৯ দিন পূর্বে খুলনা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম।

সরকারি বি.এল. কলেজের ছাত্রসংসদের অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি দৈনিক ইত্তেফাক ও দি-নিউ নেশনের সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, পিছনের সারিতে শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিমসহ নেতৃবৃন্দ।

www.icsbook.info

ছাত্রসংসদ এর বাজেট অনুষ্ঠান'৯২ এ বাজেট পেশ করছেন ছাত্রসংসদের নির্বাচিত জি.এস. শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম

ফটো সাংবাদিক আব্দুল গাফ্‌ফার এর উপর হামলার প্রতিবাদে নগরীতে ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ মিছিল, মিছিলে (বাঁ থেকে ২য়) শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম

ছবিতে নির্মমতার চিহ্ন! জবাই করা অবস্থায় শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম

www.icsbook.info

পোষ্ট মর্টেম এর পর শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম

ছাত্রদলের হামলায় ভাংচুরকৃত শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিমের কক্ষ

এই সেই বি.এল. কলেজের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, যে মসজিদের বারান্দায় নৃশংস কায়দায় শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিমকে জবাই করে হত্যা করে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা।

www.icsbook.info

স্মৃতি এ্যালবাম

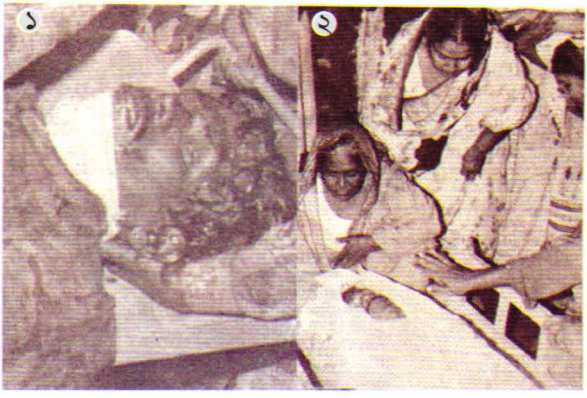

১. শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিমের ক্ষত-বিক্ষত দেহ।
২. শেষ বারের মত কফিনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিমের গর্বিত আম্মা।

পুলিশের বাঁধা উপেক্ষা করে শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিমের জানাযায় মানুষের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ।

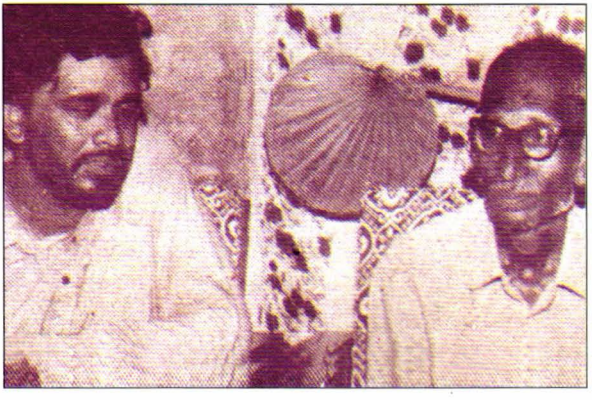

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিমের গর্বিত পিতাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শেখ কামরুল আলম

www.icsbook.info

স্মৃতি এ্যালবাম

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিমের কবর জিয়ারত করছেন তৎকালীন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

এই আম গাছ তলায় চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত জি.এস.শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম

এই বাড়িতে আর কোন দিন ফিরবেন না শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম।

www.icsbook.info

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিমের কবর জিয়ারত করছেন শহীদি কাফেলার সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মতিউর রহমান আকন্দ সহ শিবির নেতৃবৃন্দ।

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিমের গর্বিত মায়ের পাশে মহানগরী সভাপতি সাইদুর রহমানসহ শিবির নেতৃবৃন্দ।

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম সেমিনার (হিসাববিজ্ঞান বিভাগ) উদ্বোধন শেষে মুনাজাত করছেন অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার (তৎকালীন এম.পি) পাশে উপবিষ্ট তৎকালীন কলেজ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিবির নেতৃবৃন্দ।

www.icsbook.info

স্মৃতি এ্যালবাম

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিমের কবর জিয়ারত করছেন শহীদি কাফেলার সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডাঃ ফখরুদ্দিন মানিক, পাশে মহানগরী সভাপতি সাইদুর রহমানসহ শিবির নেতৃবৃন্দ।

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিমের কবর জিয়ারত করছেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ জামায়াত-শিবির নেতৃবৃন্দ।

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিমের ১৯তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবর জিয়ারত করছেন মহানগরী সভাপতি সাইদুর রহমানসহ শিবির নেতৃবৃন্দ।

www.icsbook.info

বিভিন্ন সময়ে তোলা শহীদ আমান উল্লাহ আমানের ফাইল ছবি

শহীদ আমান উল্লাহ আমানের নিথর দেহ।

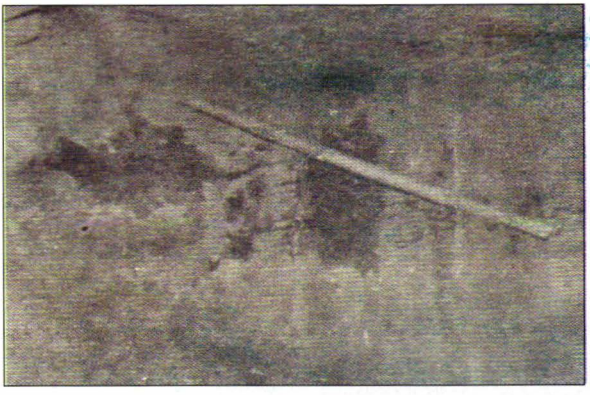

শহীদ আমান উল্লাহ আমান এর রক্তে ভিজে গেছে খুলনা আলিয়া মাদ্রাসার হোস্টেলের সিঁড়ি।

www.icsbook.info

স্মৃতি এ্যালবাম

শাহাদাতের খবর শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন শহীদ আমান উল্লাহ আমান এর স্বজনেরা।

সর্বশেষ এই প্রতিষ্ঠানে লেখা-পড়া করতেন শহীদ আমান উল্লাহ আমান।

পুত্রের পথ পানে চেয়ে আজও বসে আছে শহীদ আমানের বিধবা মাতা। কবে ফিরবে কলিজার টুকরা সন্তান!

www.icsbook.info

স্মৃতি এ্যালবাম

এখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন শহীদ আমান উল্লাহ আমান

শহীদ আমান উল্লাহ আমানের গর্বিত মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন শহীদি কাফেলার কেন্দ্রীয় সভাপতি মোঃ দেলাওয়ার হোসেন

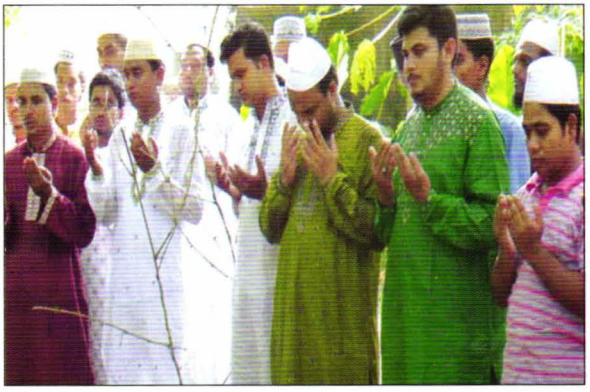

শহীদ আমান উল্লাহ আমান ভাইয়ের কবর জিয়ারত করছেন শিবিরের কেন্দ্রীয় ও মহানগরী নেতৃবৃন্দ।

www.icsbook.info

আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় দেখা যাচ্ছে বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদের সাহিত্য সম্পাদক শহীদ শেখ রহমত আলীকে।

আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদের সাহিত্য সম্পাদক শহীদ শেখ রহমত আলী।

আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদের সাহিত্য সম্পাদক শহীদ শেখ রহমত আলী।

www.icsbook.info

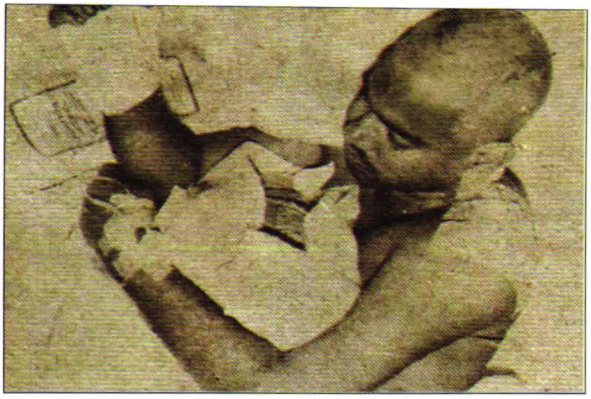

২০ সেপ্টেম্বর'৯৩ ইং এর ঘটনায় মারাত্মক আহত অবস্থায় হাসপাতালের বেডে চিকিৎসাধীন শহীদ শেখ রহমত আলী।

পোষ্ট মর্টেমের পর শহীদ শেখ রহমত আলী।

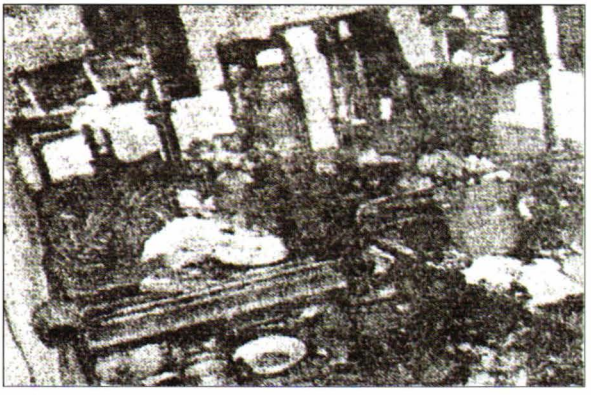

২০ সেপ্টেম্বর'৯৩ ছাত্রদলের সন্ত্রাসী কর্তৃক শহীদ শেখ রহমত আলী ভাইয়ের ভাংচুরকৃত কক্ষ।

www.icsbook.info

স্মৃতি এ্যালবাম

শহীদ শেখ রহমত আলী ভাইয়ের শয্যা কক্ষে বৃদ্ধা জননী। শুধু নেই শহীদ শেখ রহমত আলী ভাই।

এখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বি.এল. কলেজ ছাত্রসংসদের নির্বাচিত সাহিত্য সম্পাদক শহীদ শেখ রহমত আলী ভাই।

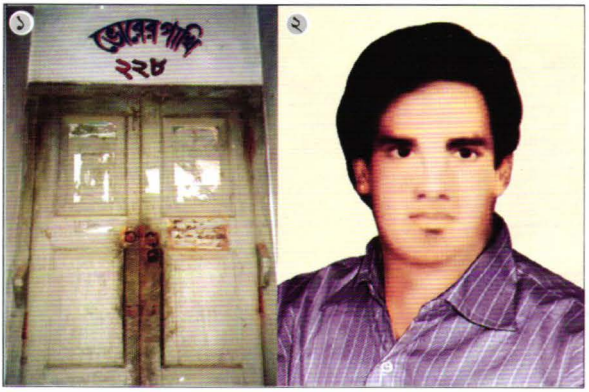

১. শহীদ তিতুমীর হলের এই কক্ষে অবস্থান করতেন শহীদ শেখ রহমত আলী ভাই

২. শহীদ শেখ রহমত আলী ভাই এর প্রোফাইল ছবি।

www.icsbook.info

শহীদ শেখ রহমত আলী ভাই এর গর্বিত মায়ের পাশে স্থানীয় শিবির নেতৃবৃন্দ।

বি.এল. কলেজ এর ছাত্রসংসদের সাহিত্য সম্পাদক ও শিবির নেতা শহীদ শেখ রহমত আলীর খুনীদের ফাঁসির দাবীতে ঢাকার রাজপথে তাৎক্ষনিক শিবিরের বিক্ষোভ মিছিল

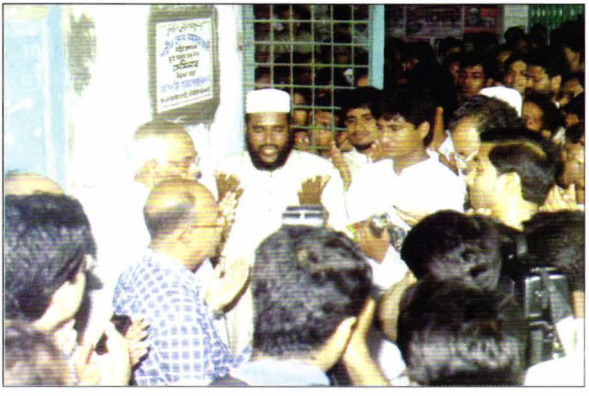

শহীদ শেখ রহমত আলী সেমিনার (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) উদ্বোধন শেষে মুনাজাত করছেন অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার (তৎকালীন এম.পি) পাশে উপবিষ্ট তৎকালীন কলেজ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিবির নেতৃবৃন্দ।

www.icsbook.info

কনসেপ্ট কোচিং এর সমাপনী অনুষ্ঠানের মাঝে একান্ত আলাপচারিতায় বি.এল. কলেজ ছাত্র-সংসদের এ.জি.এস শহীদ আবুল কাশেম পাঠান ও ভি.পি শেখ জাকিরুল ইসলাম জাকির

বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদের যোগ্য নেতা শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম ও আবুল কাশেম পাঠান কলেজের সংস্কার কাজের তদারকি করছেন।

বিমান স্মৃতি ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট এর উদ্বোধন ঘোষণা করছেন তৎকালীন মহানগরী সভাপতি জি.এম. ইলিয়াস হোসাইন, পাশে দেখা যাচ্ছে টুর্ণামেন্ট এর সংগঠক শহীদ আবুল কাশেম পাঠানকে (চেক গেঞ্জি পরিহিত)।

www.icsbook.info

শিক্ষা সচিবকে কলেজ ক্যাম্পাস ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন কলেজের অধ্যক্ষসহ ছাত্রসংসদ নেতৃবৃন্দ। (বাঁ থেকে ১ম) হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় শহীদ আবুল কাশেম পাঠান।

স্বেচ্ছায় রক্ত দিয়ে রক্তদান কর্মসূচীর উদ্বোধন করছেন শহীদ আবুল কাশেম পাঠান, পাশে উপস্থিত কলেজ অধ্যক্ষ কাজী রফিকুল হক ও মুন্সী আব্দুল হালিম

শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান স্মৃতি ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট এর সংগঠক এ.জি.এস. শহীদ আবুল কাশেম পাঠান খেলোয়াড়দের সাথে কুশল বিনিময় করছেন।

www.icsbook.info

স্মৃতি এ্যালবাম

শিক্ষা সফরে লঞ্চের অগ্রভাবে শহীদ আবুল কাশেম পাঠান।

১. আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শহীদ আবুল কাশেম পাঠান।
২. ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফাঁকে আনন্দঘন মুহূর্তে কলেজ মাঠে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় শহীদ আবুল কাশেম পাঠান।

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম ও আমান উল্লাহ আমানের খুনীদের বিচারের দাবিতে খালিশপুর পিপলস চত্বরে বিশাল ছাত্র গণজমায়েতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বি.এল. কলেজ সভাপতি শহীদ আবুল কাশেম পাঠান।

www.icsbook.info

বার্ষিক অন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে (বাঁ থেকে ১ম) শহীদ আবুল কাশেম পাঠান ও ৪র্থ শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম।

শহীদ আবুল কাশেম পাঠানের নিথর দেহ

এটাই শহীদ আবুল কাশেম পাঠান এর দুনিয়ার শেষ গোসল।

www.icsbook.info

স্মৃতি এ্যালবাম

শাহাদাতের খবর শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন শহীদ আবুল কাশেম পাঠান এর ছোট ভাইসহ স্বজনেরা।

শহীদ আবুল কাশেম পাঠান এর ২য় নামাজে জানাযায় ঈমামতি করছেন তৎকালীন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর শামছুর রহমান

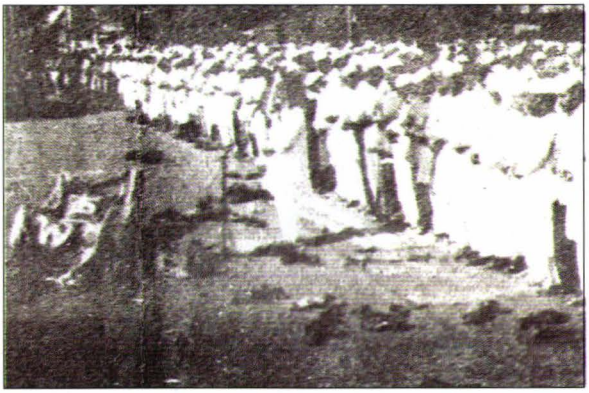

শহীদ আবুল কাশেম পাঠান এর কফিন নিয়ে খুলনার রাজপথে স্মরণকালের বৃহত্তম শোক র‍্যালি।

www.icsbook.info

স্মৃতি এ্যালবাম

এই সেই সরকারি সিটি কলেজের গেট, যেখানে শহীদ আবুল কাশেম পাঠানকে গুলি করে হত্যা করেছিল সন্ত্রাসীরা।

শহীদ আবুল কাশেম পাঠান এর লাশের জন্য মর্গের সামনে অপেক্ষারত শহীদি কাফেলার তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান।

শহীদ আবুল কাশেম পাঠান এর লাশের জন্য মর্গের সামনে অপেক্ষারত শহীদের শোকাহত সাথীরা।

www.icsbook.info

জানাযা পূর্ব সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন শহীদি কাফেলার তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান।

শহীদ আবুল কাশেম পাঠান এর খুনিদের বিচারের দাবিতে খুলনার রাজপথে কফিনবাহী বিক্ষোভ মিছিল।

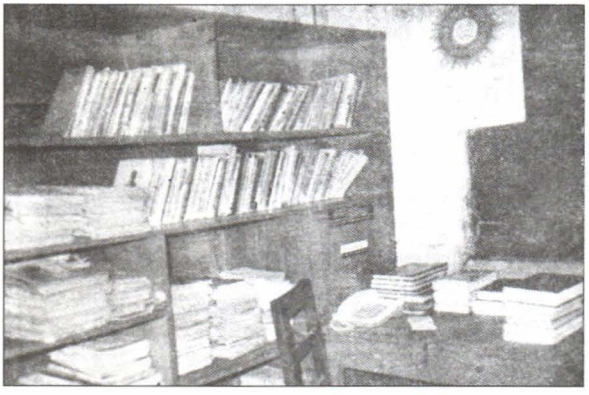

শহীদ আবুল কাশেম পাঠান এর নিজ পাঠকক্ষ।

www.icsbook.info

স্মৃতি এ্যালবাম

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম ও আমান উল্লাহ আমানের খুনীদের বিচারের দাবীতে নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল এর অগ্রভাগে (বাঁ থেকে ১ম) শহীদ আবুল কাশেম পাঠান।

১৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর র‍্যালীতে (ডান থেকে ৩য়) শহীদ আবুল কাশেম পাঠানকে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় দেখা যাচ্ছে।

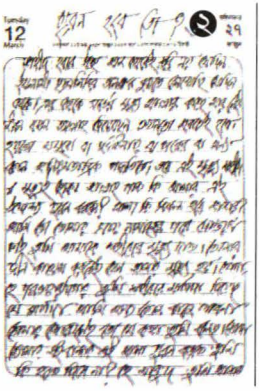

১. শহীদ আবুল কাশেম পাঠান এর প্রোফাইল ছবি।

২. শহীদ আবুল কাশেম পাঠান এর নিজ ডায়েরীতে লেখা নিজের মনের একান্ত অনুভূতি।

www.icsbook.info

এখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন শহীদ আবুল কাশেম পাঠান।

শহীদ আবুল কাশেম পাঠান এর গর্বিত মায়ের বাম পাশে খুলনা মহানগরীর সভাপতি সাঈদুর রহমানসহ শিবির নেতৃবৃন্দ

শহীদ আবুল কাশেম পাঠান সেমিনার (ব্যবস্থাপনা বিভাগ) উদ্বোধন শেষে দো'আ মোনাজাত করছেন অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।

www.icsbook.info

স্মৃতি এ্যালবাম

শহীদ আবুল কাশেম পাঠান ভাইয়ের কবর জিয়ারত করছেন শহীদি কাফেলার সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মতিউর রহমান আকন্দসহ শিবির নেতৃবৃন্দ।

সাংবাদিক অঙ্গনেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন শহীদ আবুল কাশেম পাঠান।

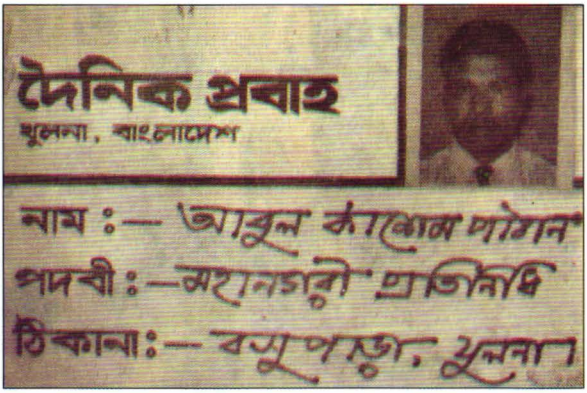

এই বাড়ীতে আর কোন দিন ফিরবেন না শহীদ আবুল কাশেম পাঠান।

www.icsbook.info

২০ সেপ্টেম্বর'৯৩ সালে বি.এল. কলেজে ছাত্রদলের হামলায় আহতদের কয়েকজন।

২০ সেপ্টেম্বর'৯৩ সালে খুলনা আলীয়া মাদ্রাসায় ছাত্রদলের হামলায় আহতদের কয়েকজন।

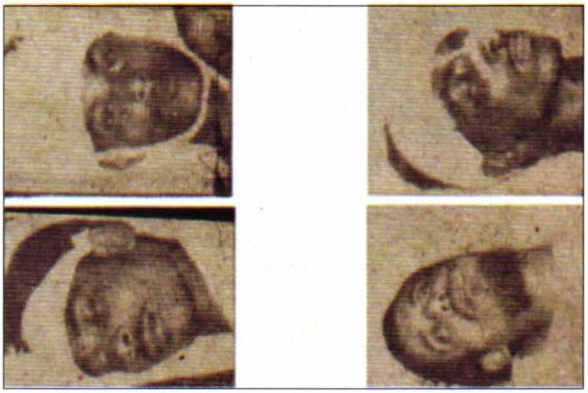

২০ সেপ্টেম্বর'৯৩ এর সন্ত্রাসী হামলায় আহত শিবির নেতা হাফিজের শয্যা পাশে শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

www.icsbook.info

২০ সেপ্টেম্বর'৯৩ সালে বি.এল. কলেজে সন্ত্রাসী হামলায় আহত শিবির নেতা মাকসুদুর রহমান মিলন।

২০ সেপ্টেম্বর'৯৩ সালে বি.এল. কলেজে সন্ত্রাসী হামলায় আহত শিবির নেতা আব্দুর রহিম।

২৩ অক্টোবর'৯৪ ইং সিটি কলেজ গেটে গুলিবিদ্ধ শিবির কর্মী জুবায়েরকে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে।

www.icsbook.info

১৫ জানুয়ারি'১০ সালে বি.এল. কলেজে ছাত্রলীগের হামলায় আহত শিবির নেতা তাওহীদুর রহমান।

১৫ জানুয়ারি'১০ সালে বি.এল. কলেজে ছাত্রলীগের হামলায় আহত শিবির নেতা এম এ বাশার।

১৫ জানুয়ারি'১০ সালে বি.এল. কলেজে ছাত্রলীগের হামলায় আহত শিবির নেতা আশরাফুল আলম।

www.icsbook.info

১৫ জানুয়ারি'১০ সালে বি.এল. কলেজে ছাত্রলীগের হামলায় আহত শিবির নেতা আরিফুল ইসলাম ভুঁইয়া।

১৫ জানুয়ারি'১০ সালে বি.এল. কলেজে ছাত্রলীগের হামলায় আহত শিবির নেতা আশিকুর রহমান হিমু।

১৫ জানুয়ারি'১০ সালে বি.এল. কলেজে ছাত্রলীগের হামলায় আহত শিবির নেতা শামিম হোসেন।

www.icsbook.info

১৫ জানুয়ারি'১০ সালে বি.এল. কলেজে ছাত্রলীগের হামলায় আহত শিবির নেতা ১. হাফিজুল ইসলাম ও ২. রনি

১৫ জানুয়ারি'১০ সালে বি.এল. কলেজে ছাত্রলীগের হামলায় আহত শিবির নেতা এমদাদ হোসেন।

১৫ জানুয়ারি'১০ সালে বি.এল. কলেজে ছাত্রলীগের হামলায় আহত শিবির নেতা হাদিউজ্জামান মুকুল।

www.icsbook.info

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম ও আমান উল্লাহ আমান এর খুনীদের বিচারের দাবীতে বায়তুল মোকাররম এর উত্তর গেটে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন শহীদি কাফেলার তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি হামিদ হোসাইন আজাদ।

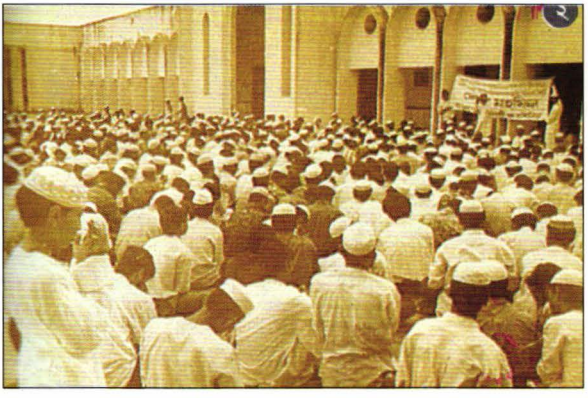

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম ও আমান উল্লাহ আমান স্মরণে ইসলামী ছাত্রশিবির এর উদ্যোগে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম এ দো'আ মাহফিল।

শহীদ শেখ আমিনুল ইসলাম বিমান স্মরণে ইসলামী ছাত্রশিবির এর উদ্যোগে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম এ দো'আ মাহফিল।

www.icsbook.info

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম, আমান উল্লাহ আমান হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে খুলনা প্রেসক্লাবে তাৎক্ষনিক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন মহানগরী সেক্রেটারি ওয়াসিয়ার রহমান মন্টু।

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম, আমান উল্লাহ আমান হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ঢাকার রাজপথে বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের বাঁধা।

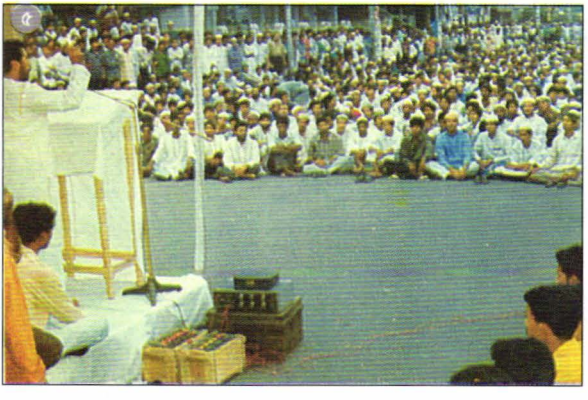

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম, আমান উল্লাহ আমান হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নগরীর ডাকবাংলো মোড়ে ছাত্র গণজমায়েতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান

www.icsbook.info

বি.এল. কলেজের নির্বাচিত জি.এস মুন্সী আব্দুল হালিম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ঢাকার রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল।

বি.এল. কলেজের নির্বাচিত জি.এস. মুন্সী আব্দুল হালিম ও আমান উল্লাহ আমান হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ইং খুলনার রাজপথে হরতাল চলছে।

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম ও শেখ রহমত আলী ভাইয়ের ৯ম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে শোক র‍্যালী পূর্ব সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন সাবেক বি.এল. কলেজ সভাপতি ওয়াহিদুজ্জামান।

www.icsbook.info

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম, শেখ রহমত আলী ও আমান উল্লাহ আমান ভাইয়ের ১০ম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বি.এল. কলেজ ক্যাম্পাসে শোক র‍্যালী অনুষ্ঠিত।

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম, আবুল কাশেম পাঠান, শেখ রহমত আলী ও আমান উল্লাহ আমান ভাইয়ের ১২তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বি.এল. কলেজ ক্যাম্পাসে শোক র‍্যালীতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তৎকালীন সেক্রেটারি

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম, আবুল কাশেম পাঠান, শেখ রহমত আলী ও আমান উল্লাহ আমান ভাইয়ের ১২তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বি.এল. কলেজ ক্যাম্পাসে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল শফিকুল ইসলাম মাসুদ।

www.icsbook.info

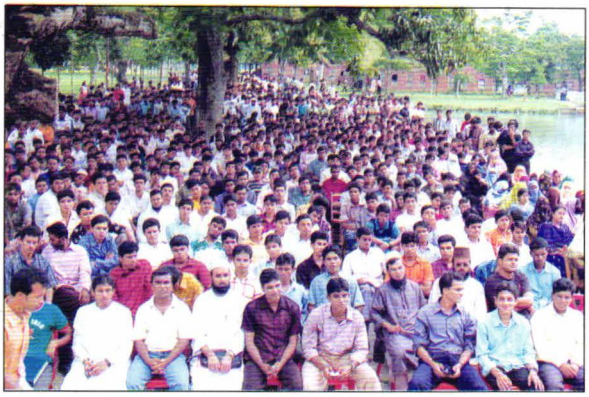

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম, আবুল কাশেম পাঠান, শেখ রহমত আলী ও আমান উল্লাহ আমান ভাইয়ের ১১তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বি.এল. কলেজ ক্যাম্পাস এর শহীদ মিনার চত্বরে আলোচনা সভায় উপস্থিতির একাংশ

শহীদ আবুল কাশেম পাঠান এর ১১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন খুলনা মহানগরী আমির ও সংসদ সদস্য অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম, শেখ রহমত আলী ও আমান উল্লাহ আমান ভাইয়ের ১০ম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বি.এল. কলেজ শহীদ মিনারে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন

www.icsbook.info

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম, আবুল কাশেম পাঠান, শেখ রহমত আলী ও আমান উল্লাহ আমান ভাইয়ের ১৩তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বি.এল. কলেজ শহীদ মিনারে আলোচনা সভায় মঞ্চে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

শহীদ আবুল কাশেম পাঠান এর ১৬তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন শহীদি কাফেলার তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম।

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম, শেখ রহমত আলী ও আমান উল্লাহ আমান ভাইয়ের ১৭তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন খুলনা মহানগরী সভাপতি আতাউর রহমান বাচ্চু।

www.icsbook.info

শহীদ শেখ আমিনুল ইসলাম বিমান এর ১৯তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দো'আ মাহফিলে মোনাজাত পরিচালনা করছেন তৎকালীন মহানগরী জামায়াতের সেক্রেটারী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।

শহীদ আবুল কাশেম পাঠান এর ১৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন খুলনা মহানগরী সভাপতি সাইদুর রহমান।

শহীদ আমান উল্লাহ আমান এর ১৮তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক আল-মুত্তাকি বিল্লাহ।

www.icsbook.info

শহীদ আবুল কাশেম পাঠান এর ১৭তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য অধ্যাপক আবদুল মতিন

শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমানের ২০ তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন খুলনা মহানগরী সভাপতি সাইদুর রহমান সাইদ

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম, শেখ রহমত আলী ও আমান উল্লাহ আমান এর ১৯তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে সরকারি বি.এল. কলেজের উদ্যোগে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক আতাউর রহমান বাচ্চু।

www.icsbook.info